

'সুধর্মা' ভবনের পাঠকক্ষে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ১৯৪০

পরিমল গোস্বামীর সৌজন্যে

॥ জীবন-কথা ॥

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা ৯ ॥ কলিকাতা ২৯

JĪBAN-KATHĀ

by Suniti Kumar Chatterji

প্রথম প্রকাশ : ২৬ নভেম্বর ১৯৭৯
নবতিতম জন্মদিন

সংকলন ও সম্পাদনা : অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

প্রকাশক
শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জি জ্ঞা সা : প্রকাশনবিভাগ
১-এ কলেজ রো
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা ৪

‘জীবন-কথা’ কিছুটা লেখা হবার পরে, সুনীতিকুমার একদিন ব’লেছিলেন : বইখানা শেষ ক’রতে পারলে বাদলকে দেবো ভেবেছি ; ওকে ব’লবেন না কিন্তু আগে থেকে।

অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

সূচি

চিত্র-পরিচিতি

প্রকাশকের নিবেদন

১৯৭০ সালে আমরা Suniti Kumar Chatteiji : The Scholar and the Man বইটি প্রকাশ করি। সেই সময় থেকেই ভাষাচার্য স্থনীতিকুমারকে অনুরোধ করে আসছি ওঁর জীবনস্মৃতিমূলক একখানি বই লিখে দেওয়ার জন্য। ১৯৭২ সালে ওঁর একখানি প্রবন্ধ-সংকলন 'মনীষী স্মরণে' আমরা প্রকাশ করি। গ্রন্থখানি বরেণ্য মনীষীদের পরিচয়মূলক বিচিত্র স্বাদের নিবন্ধাবলী। আমার প্রার্থিত বইয়ের কথা যতবারই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, ততবারই বলেছেন—কি যে বলেন, আমাদের জীবনের কি মূল্য আছে বলুন? সারা জীবন বড় জোর ভাষার ওপর কিছুটা মিস্ত্রিগিরি করেছি—না শিল্পী, না সাহিত্যিক, না একজন মানুষের মত মানুষ। এ কথা শুনে স্বভাবতই প্রতিবাদ করেছি, বলেছি—সকলেই জানেন যে আপনি শুধু ভাষাতাত্ত্বিক বা ব্যাকরণবিদ্ হিসাবেই শ্রেষ্ঠ নন, মানুষ হিসাবেও, সত্যিকারের রসজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবেও বড়। এর প্রতিবাদে তিনি বলেছেন—রাখুন, কে কি বলল তা দিয়ে আমি কি করব? আমি ত জানি আমার দৌড় কতদূর। কিন্তু আমার নাছোড়বান্দা ভাব দেখে শেষ পর্যন্ত মৃদু হাস্য করে বলেছেন—দেখা যাবে। আবার বারান্তরে এ কথা বলতে হয়ত বলেছেন, আচ্ছা আচ্ছা, হবে। কখনও বা গম্ভীর হয়ে গেছেন।

আমি সামান্য ব্যক্তি, জ্ঞানসাধক স্থনীতিকুমারের সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা করার মত জ্ঞানসম্পদ আমার নেই। তাঁর কাছে অনেক দিন, অনেক সময় কত কথাই শুনেছি। সেসব আলোচনার সামান্য অংশও যদি ধরে রাখবার মত সাধ্য আমার থাকত তাহলে নিজেকে মহাভাগ্যবান মনে করতাম।

স্থনীতিকুমারের আত্মজীবনী প্রকাশ করার বাসনা শেষ পর্যন্ত আমি তাঁর গবেষণা-সহায়ক শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলালের কাছে প্রকাশ করেছি। তিনি বলেছেন—আমরা তো অনেক দিন ধরেই বলছি, আপনারাও বলুন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অনিলবাবুই আমাকে সংবাদ দিলেন যে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হতে চলেছে—স্থনীতিকুমার আত্মকথা লেখায় হাত দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এ সংবাদে আমি অপার আনন্দ লাভ করেছিলাম।

এর পর ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে আমাদের 'বিচিত্র-বিদ্যা-গ্রন্থমালা'র

দ্বিতীয় বই 'ঈশ্বর-সন্ধানে' তাঁর হাতে তুলে দিতে যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন সঙ্গে সঙ্গে বইখানির পাতা উল্‌টোতে শুরু করলেন, খানিক পরে খুব খুশি হয়ে বললেন—আপনাকে আরও একখানা বই দেব, শুরুও কতকটা করেছি—'রবীন্দ্র-জীবনদেবতা'। এ বইয়ের পরিকল্পনাও আমায় শোনালেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, শেষ পর্যন্ত বইখানি অলিখিতই থাকল। তখন আবার তাঁর আত্মজীবনীর কথা তাঁকে বলেছি, ম্লান হেসে বলেছিলেন—আরম্ভ তো করেছি; কিন্তু লিখতে পারছি কোথায়, চোখটা না কাটিয়ে কিছু করার উপায় নেই। তাঁর কথায় সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল বুঝি বা একটু অনিশ্চিত অসহায়তার স্বর।

শেষ পর্যন্ত 'জীবন-কথা' আমরা প্রকাশ করছি—ভারমুক্ত সুনীতিকুমার এ প্রকাশনা দেখলেন না, এ দুঃখ রাখার জায়গা নেই।

এই গ্রন্থ প্রকাশনায় আমরা শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল, শ্রীগোপাল হালদার, সুনীতিকুমারের পুত্রবধূ শ্রীমতী ছায়া চট্টোপাধ্যায়, ও কন্যা নীলা মুখোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীমহাদেবপ্রসাদ সাহা, শ্রীঅপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শ্রীবিমান সিংহ, শ্রীশুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অরবিন্দ ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ, ন্যাশনাল লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ, কলিকাতার আকাশবাণী-র কর্তৃপক্ষ, স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এন্‌গ্রেভিং-এর শ্রীহীরালাল সেনগুপ্ত এবং শ্রীগোপাল প্রেসের শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার প্রমুখ গুণমুগ্ধ গোষ্ঠীর নিকট যে অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়েছি, তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে পারছি না। আমাদের সতর্কতা সত্ত্বেও কয়েকটি মুদ্রণ-প্রমাদ রয়ে গেছে ; সেগুলি নিম্নরূপ—

পৃঃ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮১	২০	১৩	১২
৮৭	২৫	never any	never had any
৮৮	৩	the	its
১০৪	১১	২।২।৭১	২।১।৭১
১১৫	১	হোঁচটা	হোঁচট
২১২	১৬	bufflo's	buffalo's

ইতি ২৪ নভেম্বর ১৯৭৯ ; বিনীত—প্রকাশক।

জীবনায়ন — স্মৃ-কু-চ   পদসঞ্চার   পদপাত   স্মৃতি-দৃশ্য   নবীন-সংসঞ্চয়ন   জীবন-সমীক্ষা   জীবন-লোচনা   জীবন-রোচনা   আলো-লোচন   রূপসা   জীবনায়ন — স্মৃ-কু-চ

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

আজ ইংরেজী ১লা জানুয়ারি ১৯৭১, বাংলা ১৬ই পৌষ ১৩৭৭, শকাব্দ ১১ পৌষ ১৮৯২, সংবৎ ৫ই পৌষ সুদি ২০২৭ ॥ গত নভেম্বর মাসে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৩ নভেম্বর রাসপূর্ণিমা বা কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন, ৮০ বছর পূর্ণ হল, ৮১ তে পা দিয়েছি — ঐ তিথি আমার জন্মতিথি, (ভাগবত মতে)

(৮১ বছরে) গুরু শ্রীমানবদেবের জন্মতিথি ঐ দিন; ইংরেজী মতে জন্মদিন হয়ে গেল গত ২৬শে নভেম্বর ১৯৭০। কিন্তু কোনো দিন গুনিনি আমরা। আমার এতো সুদীর্ঘ জীবন, জীবনে spectacular বলে ঘটনা খুব বেশি কিছু ঘটেনি, যা সাধারণ মানুষের চোখে চমক লাগিয়ে দিতে পারে। সাধারণ বাঙালীর ঘরে কেরানী থেকে ছেলে, যা বা বিনা-মাইনের ইস্কুলে পড়ে মানুষ, গুরুবলে প্রায় বরাবরই পরীক্ষায় ভালো করে উতরে যাই, তারপরে পরে অধ্যাপনার কাজই সহজ করে নিতে হয়। তবে কলকাতার আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ সুবিধা জুটে যায়, বিদেশে যাই, অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হয়, নানা অভিজ্ঞতা জীবনে হয়; সব দেশের সব যুগের সব ভাষার মানবের সম্বন্ধে একটা সহজ কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা, মানবের প্রতি ভালোবাসা মনে সদাই অনুভব করি, আর তাঁদের একটা বিশ্বমানবীয় রূপও পাই — বাইরে থেকে দেখলে সংক্ষেপে — এই-ই হল আমার — এই দীর্ঘ জীবনের মোটামুটি কথা।

দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০৪

॥ স্মৃ/দৃ/৫ ॥ জীবন-কথা ॥ ২।১।১৯৭৬ ॥

(১)

ঈশ্বরের অনেক দয়া [struck through] পেয়েছি, এখন অনেক বয়স ৮০ হয়ে গেছে। জীবনের [illegible] [struck through] ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য [illegible], সাধুসঙ্গ অনেক দেশ ঘুরে দেখেছি, মানুষের অন্তরের পরিচয় — পেয়েছি, জীবনে ঠিক পূর্ণতা হল — রবীন্দ্রনাথ [illegible] [illegible] যে বলেছিলেন — The last lap of the journey is best made alone. জীবনের "my" আর "মুই", ভোলা গেল না, [illegible] সেই কথা [illegible] [illegible] করবার চেষ্টা করি। তবে ইংরাজীর একটা কথা মনে আছে — অন্তরে: জীবন — জীবনের অন্তরালে কি আছে? কত [illegible] আছে — আমার মনের (কোটি কোটি) [illegible] [illegible] — জীবন [illegible] [illegible] দুঃখ, কিন্তু এই জীবন কি? [illegible] জীবনে যা কিছু দেখে শিখেছি, ভেবে দেখেছি, — [struck through] রবীন্দ্রনাথের শেষ প্রশ্ন আছে — "কিন্তু কেন?" — এই প্রশ্নের উত্তর (এল) না।

২।১।১৯৭৬

পঁচাত্তর বছর বয়স পেরিয়েছি, পঞ্চাশ বছর আমার ঘর ক'রে গৃহিণী দেহরক্ষা ক'রলেন।* ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ শিক্ষাকাল গার্হস্থ্য আর বাণপ্রস্থ পেরিয়ে সন্ন্যাস আশ্রমে পৌছুলুম—ভাবলুম জীবনে উচিত ব্যবস্থা-ই হ'ল—অধ্যাপক সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ যে ব'লেছিলেন—The last lap of the journey is best made alone. জীবনের "সু" আর "কু", ভালো আর মন্দ, উপায়ান্তর নেই দেখে নিস্পৃহভাবে দুটোকেই গ্রহণ করবার চেষ্টা করি। তবে ইদানীং একটা কথা মনের মধ্যে অহরহঃ জাগে—জীবনের অন্তরালে কী আছে? কেন জগতে আমার এবং আমার মতন কোটি কোটি মানুষের আগমন হ'ল, হ'চ্ছে, হবে—জীবন তো আমি কাটিয়ে দিলুম প্রায়, কিন্তু এর উদ্দেশ্য কী? সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে কত কিছু দেখে গেলুম, ক'রে গেলুম,—রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই প্রশ্ন আসে—"কিন্তু কেন?"—এই প্রশ্নের উত্তর তো এল না।[১]

জ্যোতিষী বন্ধুরা আমার ঠিকুজি দেখ্‌তেন, হাত দেখ্‌তেন। নিজেও একসময়ে আগ্রহ ক'রে দেখাতুম। অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি জ্যোতিষে বিশ্বাস করো?" উত্তরে বলি, "কতক কতক, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।" জ্যোতিষীরা আমার জীবনের যে ভবিষ্যদ্বাণী মাঝে-মাঝে ক'রেছেন, তার আদ্ধেক মিলেছে আদ্ধেক মেলে নি। যেখানে মিলেছে, সেখানে স্বীকার করি। কেন মিল হয়, তার কারণ জ্যোতিষীরা যা বলেন, তা মেনে নিতে পারি না, সে-সব কারণ পূরাপূরি তাঁদের যুক্তি অনুসারে স্বীকার ক'রতে খট্‌কা লাগে, বাধা আসে—মনে হয়, আরও কিছু ভিত্‌রী রহস্য র'য়ে গেল। তবুও, জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীর কিছুটা মেলে দেখে, আমি ইদানীং অর্থাৎ বছর দশ বারো পূর্ব পর্য্যন্ত দু'চার জন নামী জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা ক'রেছি—"দেখুন তো আপনাদের শাস্ত্র কী বলে, আমার ঠিকুজি বা হাত দেখে—একটা শাশ্বত সত্তা,

---

* সুনীতিকুমারের সহধর্মিণী কমলা দেবী দেহরক্ষা করেন ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর। —অনিলকুমার কাঞ্জিলাল।

১ শেষে 'টীকা' দ্রষ্টব্য।—অ।

সার সত্য, জীবনের পিছনে যদি কিছু থাকে, সে সম্বন্ধে কোনও অনুভূতি বা উপলব্ধি আমার হবে কি না, আর যদি হয় তো কবে?" তাঁদের মধ্যে দুই একজনের কাছে আংশিক উত্তর পেয়েছি—"৭৫ বছর বয়সের পরে ধীরে ধীরে আপনি এ বিষয়ে এ জীবনের মতন আপনার প্রশ্নের সমাধান পাবেন।"

এখন এই ৮০ বছরের পরে যে সমাধান পেয়েছি, সেটা হ'চ্ছে যে—আমরা কিছুই জানি না, আর গভীরতম অন্তর থেকে এটাও ধ্বনিত হ'চ্ছে, এ জীবনে কিছু জানা যায় না। চিন্তার ধারা এখন কোথায় এসে পৌঁছুল বা পৌঁছুচ্ছে? এই অজ্ঞ বৃদ্ধের জল্পনা-কল্পনার কোনও মূল্য নেই, কিন্তু তবুও প্রশ্নের যে উত্তর পাচ্ছি, অনেক চিন্তা ক'রে জীবনের অভিজ্ঞতার কথা ভেবে, আর কোনও উত্তর না পাওয়ায় তাতেই সন্তুষ্ট থাক্‌তে হ'চ্ছে। এই যে বিশ্বপ্রপঞ্চ, যার মধ্যে আমরা র'য়েছি, সেটা কী বিরাট্ কী মহান্, সে বিষয় ভাব্‌তে গেলে মাথা ঘুরে যায়। Billions of light years লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ ধ'রে চ'ল্‌তে পারলেও আমাদের এই Cosmos এই শৃংখলিত বিশ্বের থই পাওয়া যায় না, তার অন্তে পৌঁছুনো যায় না; আমরা সব কিছু ধরি-ধরি ক'রেও যা ধ'রতে ছুঁতে পারছি না। অথচ একটা নিয়ম সেখানে যেন কাজ ক'রে যাচ্ছে—নিয়মের ব্যত্যয় আমাদের চোখে অনেক রকমের আছে তাও বোঝা এখনও সম্ভবপর নয়, সেই একটা নিয়ম মান্‌তে হয়; কিন্তু নিয়মের নিয়ামক সম্বন্ধে কিছু উপলব্ধি তো হ'চ্ছে না। সে উপলব্ধি তাঁদের হ'য়েছে ব'লে যাঁরা মনে করেন, ঘোষণা করেন, তাঁরা আমাদের নমস্য; তাঁদের কথায় অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমাদের তো কই সে উপলব্ধি বা অনুভূতি হ'ল না। যাঁরা সহজ সরল বিশ্বাসের সঙ্গে, নানা রকম পূজো হোম মুদ্রা জপতপের মারপ্যাঁচের মধ্যে না গিয়ে, কোনও দেব বা দেবীর সুন্দর মহনীয় কল্পনার মাধ্যমে ঈশ্বরের উপলব্ধি ক'রতে চান, অন্যের সঙ্গে যাঁদের বিরোধ নেই, তাঁদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু কিছু জানা গেল না বোঝা গেল না আমাদের এই মানুষী বুদ্ধি নিয়ে—যদিও এ বিষয়ে গত তিন চার হাজার বছর ধ'রে মানুষের জান্‌বার চেষ্টার অভাব হয় নি, সে চেষ্টার অন্তও নেই। সুসভ্য হবার পরে যখন থেকেই মানুষের সমাজের জ্ঞানী গুণী বৃদ্ধেরা এ বিষয়ে চিন্তা ক'রতে আরম্ভ ক'রেছেন, তখন থেকে আমরা পাচ্ছি প্রাচীন ভাবুক দার্শনিক সত্যসন্ধানী ঋষিদের—যাঁদের বিচার আর উপলব্ধি এখনও এই অজ্ঞাত সত্তার সম্বন্ধে আধুনিক যুগেরও মানুষের মনেও

কাজ ক'রছে—বাবিলনের স্থমের জাতির ধর্মগুরু, মিশরের রাজা ও দার্শনিক আখন-আতন, আদি-আর্য্য ঋষি, যিহুদীদের আদি-পুরুষ মোশেহ্, অত্রি অঙ্গিরা মরীচি কশ্যপ ক্রতু ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র অগস্ত্য প্রভৃতি বৈদিক আর সত্যকাম উদ্দালক শ্বেতকেতু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি উপনিষদের ঋষি, যিহুদী পরমেশ্বর যাহ্‌বেহ্-ভক্ত 'ভাববাদী' বা তত্ত্বজ্ঞ যিহোশূআ বা ইসায়া, ইরানের ঋষি জরথুশ্‌ত্র, চীনের ঋষি লাউ-ৎসে, ভারতের বুদ্ধ আর মহাবীর, প্রাচীন গ্রীসের সোক্রাতেস, প্লাতোন্, ও অন্য দার্শনিকগণ, যীশু খ্রীস্ট—এঁরা সকলে দু হাজার বছর ধ'রে উপদেশ দিয়ে, নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে, যেন চিরকালের তরে, সভ্য মানুষের মনের কাঠামো গ'ড়ে গিয়েছেন। এঁদের পরে সম্পূর্ণ রূপে নোতুন কথা আর কেউ বলেন নি—যাঁরা এঁদের পরে এসেছেন তাঁরা এঁদের কথাই নানা ভাবে নোতুন ঢঙে কতকগুলি বিষয়ের উপরে জোর দিয়ে বল্‌বার চেষ্টা ক'রেছেন। বেশির ভাগ সাধারণ মানুষে এতেই খুশি—এতেই তৃপ্ত।

কিন্তু এখনও এমন মানুষও প্রচুর দেখা যাচ্ছে, পুরাতন ঋষি-বাক্যে, শাস্ত্র-বাক্যে যাঁদের মন আর ভরছে না। সংশয় সন্দেহ আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের আলোক পাতের সঙ্গে-সঙ্গে চিন্তাশীল মানুষকে বিচলিত ক'রছে। নোতুন-নোতুন খট্‌কা দেখা দিচ্ছে।

পিছনের দিকে তাকিয়ে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথার একটু স্মৃতি-চারণ করা যায়। জন্মগত অধিকারের দাবিতে, ধর্ম-বিষয়ে ভুঁই-ফোঁড় হ'য়ে, নিজেকে আর নিজের ধর্মগোষ্ঠীর সমাজের প্রচারক বা গুরুদের সব-জান্‌তা ঠাউরে, একটু আত্মপ্রসাদ, কোথাও বা একটা জাতিধর্মগত অহংকার নিয়ে, ধর্ম ঈশ্বর মানব-জীবনে জীবনোত্তর অস্তিত্ব প্রভৃতি ধ'রে পাকা-পোক্ত একটা বিশ্বাস আঁকড়ে থাক্‌তে পারলেই যেন সকলে সুখী। পাঁচ রকম অস্বস্তিকর ভাবনা থেকে মুক্ত থাকার একটা আরাম এতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ জগতের সমস্ত কিছুর মতো স্থিতিশীল নয়, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। তার দেহের মধ্যে যেমন মনের মধ্যেও তেমনি ক্রমাগত পরিবর্তন হ'চ্ছে। নিজেকে যে জানতে চায় সে এই দৈহিক আর মানসিক পরিবর্তন বিচার ক'রে দেখে, এতে আত্ম-সমীক্ষার একটা আনন্দ পায়। বিশেষ ক'রে মানসিক পরিবর্তনের ব্যাপারে। আবার এই আনন্দের মধ্যে একটু ভাবনায় বা সন্দেহেও প'ড়ে যায়। সেই

চিন্তা, ভাবনা বা সন্দেহকে—সুবিচারের দৃষ্টিতে দেখে, ইংরিজিতে divine discontent-ও বলা হ'য়েছে—এক "দিব্য সংশয়-বোধ"। আমার নিজেকে দেখে ধারণা দাঁড়িয়েছে, আমরা কেউ-ই অজ্ঞাত জগৎ সম্বন্ধে, বাল্যে শিক্ষা বা অনুকরণে প্রাপ্ত প্রচলিত বোধ বিচার বা বিশ্বাস নিয়ে চিরকাল থিতু হ'য়ে ব'সে নেই, ব'সে থাকতে পারি না। absolute, unchangeable, irrevocable Truth, Dogma, Doctrine, বা "ঈশ্বরের বাণী", "অপৌরুষেয়" বেদবাক্য বা চরম উপদেশ ব'লে একটা কিছু ধ'রে থাকলে, ধর্ম বিষয়ে "ভদ্রলোকের এক কথা" এই ব'লে ব'সে থাকলে, শ্রেষ্ঠতম মানবিক গুণ বুদ্ধিবৃত্তি বা বিচারশক্তির অপব্যবহার করাই হয়। পা না ফেল্‌লে চলা হয় না, ধাপ বা সিঁড়ি বেয়ে না উঠ্‌লে উঁচুতে ওঠা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মতন তত্ত্ববিদ্ ঋষি, বিশ্বনিহিত রভসানন্দের অদ্বিতীয় অধিকারী মনীষী নিজ সুদীর্ঘ জীবনে সারসত্য সম্বন্ধে এক মত হ'তে মতান্তরে পৌঁছেছিলেন; একই সময়ে হয়তো পরস্পরের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য নেই এমন একাধিক বোধ বা বিচারও তাঁর ছিল, কিন্তু তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—তাঁর লেখার মধ্যে, কৈশোরে যখন উপনয়ন-কালে তাঁর সাবিত্রীদীক্ষা উপনিষদের বাতাবরণের মধ্যে হ'ল, তখন থেকে 'সোনার তরী', 'জীবন-দেবতা', 'গীতাঞ্জলি', 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর মতবাদের মধ্য দিয়ে, সর্বশেষে তিরোধানের সাতদিন মাত্র পূর্বে তাঁর জীবনের যে শেষ কবিতাটি তিনি রচনা ক'রে মুখে ব'লে যান সেই চরম অভিজ্ঞতার প্রকাশ "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি/বিচিত্র ছলনাজালে,/ হে ছলনাময়ী" কবিতাটি পর্য্যন্ত, কত বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আর অনুভূতি দেখা দিয়েছে! আমার কাছে এই কবিতাটির মূল্য অপরিসীম, চরম ব'লতেও পারি। তাঁর শেষ কথা যেন এই—সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে যে অজ্ঞাত রহস্য নিহিত, সেই রহস্য, অজ্ঞাত ব্যাপার সম্বন্ধে কেবল যেন আমাদের ছলনাই ক'রছে—নানা প্রকারের ধর্ম-বিশ্বাস অন্ধ-বিশ্বাসের ফাঁদ পাতা র'য়েছে সরল মানুষকে যেন ভোলাবার জন্যই—কিন্তু মানুষের মহত্ত্ব সেখানেই যেখানে সে এই-সব ধর্ম আর অন্ধ-বিশ্বাসের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছে—নিজের সহজ আন্তর জ্যোতিতে যার চিন্তা-বিচার উদ্ভাসিত—"অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে/ সে পায় তোমার হাতে/ শান্তির অক্ষয় অধিকার।"

শিশুকালে, ৭।৮ বছর বয়সের কথা যা মনে আছে, আব্‌ছা-আবছাভাবে

অথবা স্পষ্টভাবে, তা থেকে ব'লতে পারি যে তখন সাধারণ হিন্দু ঘরের ছেলের মতন ব্রহ্মা বিষ্ণু লক্ষ্মী শিব দুর্গা কালী প্রভৃতি দেব-কল্পনায় বিশ্বাস ক'রতুম, তাঁরা সকলেই আমাদের কল্পিত শাস্ত্রে বর্ণিত স্বশরীরে বিদ্যমান র'য়েছেন, আমাদের ভালোমন্দ সব কিছু তাঁরা দেখছেন, সব ব্যাপারেই তাঁদের সক্রিয় হাত আছে।—কোনও বিপদে আপদে প'ড়লে সহজেই মনে মুখে যে বিপদ্‌-বারণের জন্য প্রার্থনা আসত, তা ছিল এই ধরনের—"ঠাকুর রক্ষা করো; হে মা কালী, হে মা দুর্গা, হে নারায়ণ, রক্ষা করো, দয়া করো।" ছেলেবেলার মতো শরীরী দেবতার আস্থা এখন আর নেই, কিন্তু এখনও, মানুষী চিন্তার অতীত নই ব'লে, ছেলেবেলাকার সেই পুরোনো প্রার্থনাই মনের ভিতর থেকে বা'র হয়—কার কাছে যায় সে প্রার্থনা তা জানি না। কিন্তু এই মানবিক দৌর্বল্যের জন্য লজ্জার কিছু দেখি না। তখন মনে হ'ত, পূজোর সময়ে ভারতের উত্তরে হিমালয়ের কৈলাস পর্বতে তাঁর গৃহ ছেড়ে, মা দুর্গা তাঁর দুই পুত্র কার্তিক গণেশ দুই কন্যা লক্ষ্মী সরস্বতী আর দুই সখী জয়া বিজয়া এদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে দৈবী শক্তিতে হাজার হাজার গৃহস্থের বাড়িতে, শ্বশুরবাড়ি থেকে আদরের মেয়ে যেমন বাপের বাড়িতে আসে, তেমনি পূজোর তিন দিনের জন্য আসেন। আর বিজয়া দশমীর দিন যখন মা দুর্গার বিসর্জনে যাবার সময়ে বাড়ির মেয়েরা আর বাড়ির গিন্নি ঠাকুরকে বরণ ক'রে বিদায় দিতেন, তখন যেন সত্যি সত্যিই মা দুর্গা বাপের বাড়ি ছেড়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বছরকার জন্য শ্বশুরবাড়ি চ'লে যাচ্ছেন পূজোবাড়ি আঁধার ক'রে, এই ভেবে বাড়ির গিন্নি থেকে মেয়েরা সকলেই, আর আমরা ছেলেরাও মনে ক'রতুম, মা বুঝি সত্যিই চ'লে যাচ্ছেন—সকলেরই চোখে জল দেখা দিত, আমরাও কেউ কেউ হাপুস-নয়নে কাঁদতুম, বয়স্ক কর্তাব্যক্তিদেরও চোখ ভিজে উঠ্‌ত। এই সরল বিশ্বাস জীবনে একটা অনির্বচনীয়তার আনন্দ এনে দিত।

পরে যখন ধীরে ধীরে চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে প'ড়লুম, তখন এই শরীরী দেবতার কল্পনা যে নিতান্ত ছেলেমানুষি ব্যাপার, এরকম কল্পনা প্রাচীন আধুনিক একেশ্বরবাদী বহুদেববাদী সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই ছিল, আছে আর থাকবেও, এই রকম একটা বোধ এসে গেল। আমাদের বিষ্ণু শ্রী শিব উমা দুর্গা কালী ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণ অগ্নি প্রভৃতি দেবতা যে নিছক কল্পনা, এর পিছনে কোনও বাস্তবতা নেই,—কিন্তু কল্পনা হ'লেও বড়ো সুন্দর বড়ো মধুর ছিল, এই

ধারণা এসে গেল। তেমনি প্রাচীন গ্রীকদের দেবকল্পনা—জেউস্, হেরা, দেমেতের্, আপল্লোন্, আর্তেমিস্, আরেস্, আফ্রোদিতে, আথেনা প্রভৃতির কল্পনাও মনকে অভিভূত ক'রত, কল্পনা হ'লেও তা ছিল অদ্ভুতভাবে সুন্দর, চিত্তকে মথিত ক'রে দিত। অন্যান্য প্রাচীন আর অর্বাচীন জাতির দেবকল্পনা নিয়েও তেমনি মনের মধ্যে ভাববিলাস চ'লত। এই-সব দেবদেবীর কল্পনা, তাদের পুরাণ-কাহিনীর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য বা ভীষণতা, ভাবপ্রবণ মানবমনের উপরে এ-সবের প্রভাব আলোচনা ক'রে অদ্ভুত আনন্দ পেতুম। এ যেন বিশ্বমানবের চিত্ত-সাগর মন্থন ক'রে এক শাশ্বত দেবজগতের উদ্ভব।—কোনও জাত বাদ প'ড়ত না—তা সে গ্রীকদের মতো আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখা যেমন কেল্‌ট্, ইটালিক, জর্‌মানিক, বাল্‌তিক, স্লাব, আর্মানী, হিট্টী-ই হোক, চীনা জাপানী ভোট মোঙ্গল বর্মী হোক, স্বদেশের আদিবাসী কোল ভীল কিরাতই হোক, প্রাগ্-আর্য্য দ্রাবিড়-ই হোক, আফ্রিকার নানা আদিম জাতি-ই হোক, আমেরিকার মায়া আস্তেক প্রভৃতি আমেরিন্দিয়ান জাতি-ই হোক। যেমন যেমন কলেজের জীবনে একটু-আধটু পড়াশুনা ক'রতে ক'রতে এদের সম্বন্ধে জ্ঞান আর কৌতূহল বাড়তে লাগল, তেমনি তেমনি এদের ঘনিষ্ঠ ক'রে আপনার ক'রে দেখবার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার প্রসারও হ'তে লাগল। কিন্তু এ হ'ল মানব-জীবনের বিচিত্রতার সাধনা আর তার নানা অপরূপ রূপের মধ্যে মশ্‌গুল হ'য়ে থাকা—আধ্যাত্মিক জগৎ, শাশ্বত সত্তার ঝলক মাঝে মাঝে এক-আধবার উঁকি দিয়ে গেলেও, মানুষ আর তার দেবকল্পনার পিছনে যদি কিছু সার সত্য, শাশ্বত সত্তা থাকে, তার জন্য একটা অস্পষ্টভাবে আকূতি মনের মধ্যে এলেও, তার স্পষ্ট অনুভূতি তো এখনও—প্রথম যৌবন পর্য্যন্ত এল না।

কিন্তু এর আগেই দুজন বিরাট্ মহাপুরুষের রচনাসম্ভারের সামনে এসে প'ড়লুম। সে দুজনের লেখার সঙ্গে সংস্পর্শ উত্তরকালে আমার আভ্যন্তর জীবন, চিন্তা, রভসানন্দ প্রভৃতির বিকাশে স্পর্শমণির কাজ ক'রেছে—সেই দুজন হ'চ্ছেন বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথ।[২] এঁদের কাছ থেকে আমার এই সুদীর্ঘ হ'লেও নগণ্য জীবনে কী পেয়েছি তা ব'লতে গেলে এক মহাভারত লিখতে হয়। তবে এক কথায়, জীবনে শ্রেয় আর প্রেয় যা কিছু লাভ ক'রেছি, সবই এঁদের কাছ থেকে। আমার আর আমার মতন হাজার হাজার অন্ধের চোখ এঁরাই ফুটিয়ে

দিয়েছেন। এ তাঁদের অযাচিত দান। জীবনের সারবস্তুর সম্বন্ধে আগ্রহ আর আকাঙ্ক্ষা এঁদের দয়াতেই পেয়েছি, আর এটা না পেলে বাঁচ্‌বার কোনও অর্থই থাক্‌ত না।

(10. 1. 76 *sine linea*).*

১১।১।৭৬

যে সময়ে মূর্ত, সাকার দেবদেবীদের সম্বন্ধে শিশুকালের আস্থা বিশ্বাস আনন্দে ঘা লেগেছে, মনে একটু অস্বস্তিও দেখা দিচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে, তখন আমি ইস্কুলে ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ঠিক চার বছর আগে, বয়স তখন বারো হবে, স্বামী বিবেকানন্দের বই বক্তৃতা আর লেখার সঙ্গে পরিচয় ঘট্‌ল, মোতী শীলের ইস্কুলেই। (কী ক'রে এই সৌভাগ্যের অধিকারী হ'লুম, সে কথা পরে বিস্তারিতভাবে লেখবার বাসনা রইল)।[৩] বিবেকানন্দের From Colombo to Almora, তাঁর ইংরিজিতে শিকাগোর বক্তৃতা, তাঁর বাঙলা 'পরিব্রাজক', তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', তাঁর 'বর্তমান ভারত', আর তাঁর অন্য সহজবোধ্য লেখা প'ড়তে লাগ্‌লুম। যেন এক সত্যদ্রষ্টা ঋষির উপদেশ আমার কাছে এসে পৌছুল। ধীরে-ধীরে সগুণ আর নির্গুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা বিচার মনের মধ্যে স্থান ক'রে নিলে। বেদান্ত অনুসারে প্রচলিত হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা পেয়ে তৃপ্ত হ'লুম, হিন্দুধর্মের 'বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা' এসে মনকে দখল ক'রলে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে, এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার কিছু আগেই বোধ হয়, পাঞ্জাব কি গুজরাট থেকে ক'লকাতায় প্রচারার্থ আগত দীর্ঘকায় এক আর্য্য-সমাজী সন্ন্যাসী ক'লকাতার ছাত্রদের অনেকের মনে প্রভাব বিস্তার ক'রলেন। (সেই সময়ে North-West Frontier Province-এর ডেরা গাজী খাঁ কি ডেরা ইস্‌মাইল খাঁ থেকে টহলরাম গঙ্গারাম নামে এক পাঞ্জাবী হিন্দু রাজনীতিক বক্তা আর ব্রিটিশ শাসনের বিপক্ষে আর ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে শক্তিশালী প্রচারক ক'লকাতায় এলেন। ইংরিজিতে বক্তৃতা দিয়ে, বাঙালী

* লাতীন ভাষার এই কথা দুটির আক্ষরিক অর্থ without a line, অর্থাৎ তারিখটি মাত্র লেখা ছাড়া, এই দিন একটি লাইনও লেখা হয় নি। বহুদিন এমনই হ'য়েছে। আপিসে এসে ব'লেছেন, 'কলম ধ'রেছি, এক ভদ্রলোক এসে হাজির, একেবারে নাছোড়বান্দা, তিনি যেতে/থাকতেই আর একজন—সকালটা নষ্ট হ'ল।' —অ।

ছেলেদের নিয়ে দল বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল ক'রে ঘুরিয়ে বেড়িয়ে, স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত ক'রে গেলেন—আমরাও দলে ভিড়ে তাঁর পিছনে পিছনে ইংরিজিতে 'জাতীয় সংগীত' God save our Ancient Hind / Ancient Hind once Glorious Hind/From Kashmir to Cape Comorin ইত্যাদি গাইতে গাইতে টহল দিতে লাগ্‌লুম)। শঙ্করানন্দ স্বামী বাঙালী হিন্দু ছেলেদের জন্য উপনিষদের ক্লাস শুরু ক'রে দিলেন—সহজ-বোধ্য ইংরিজিতে অনুবাদ ক'রে তিনি আমাদের ঈশ, কেন, প্রশ্ন আর দু-একটা ছোটো ছোটো উপনিষৎ পড়িয়ে দিলেন—আর উৎসাহ ক'রে ঘরে ব'সেই, স্বামীজীর প্রভাবের ফলে, আমি কঠোপনিষদ্‌ও প'ড়ে ফেল্‌লুম। আর্য্যসমাজী ব্যাখ্যা শুনে মাথায় একগোছা টিকিও রাখ্‌লুম। এইভাবে আমি ১৬।১৭ বছর বয়সেই স্বামী বিবেকানন্দের মতানুযায়ী বেদান্ত-বিশ্বাসী ; আর টহলরাম গঙ্গা-রাম আর শঙ্করানন্দ স্বামীর অনুসরণে, ভারতের স্বাধীনতাবাদী হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী (সঙ্গে-সঙ্গে অন্য ধর্ম সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন নয়—খ্রীষ্টান আর মুসলমান ধর্মে কিছু ভালো জিনিস, যুক্তিসহ বিচারের সন্ধান পাওয়া গেলে সে সম্বন্ধেও আগ্রহী), উপনিষদের শিক্ষার আধারে যার মন গ'ড়ে উঠ্‌ছে এমন বুদ্ধি-বিচার-নিষ্ঠ গায়ত্রী-মন্ত্র-পাঠী কিশোরে বা তরুণে পরিণত হ'লুম (বিশেষ ক'রে পৈতে হ'য়ে যাবার কিছু পর থেকেই—শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের সন্ধ্যা-শিক্ষার বই ভালো ক'রে পড়বার পরে)।

১৩।১।৭৬

১৯০৩ সালে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। ঐ বৎসরও আমার সাংস্কৃতিক জীবনে আর একটি বড়ো জিনিসের সঙ্গে আমার সংযোগ ঘটে, সেটি হ'চ্ছে, ক'লকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট ইস্কুলের ছবির গ্যালারিতে। একদিন বিকালে, একসঙ্গে মধ্যযুগের ভারতের মোগল রাজস্থানী কাংড়ী চিত্র-কলার প্রথম দর্শন, আর অবনীন্দ্রনাথের কয়খানি ছবির সঙ্গে প্রথম পরিচয়—'বুদ্ধ ও সুজাতা', 'সিদ্ধ-দ্বন্দ্ব', 'গ্রীষ্ম', 'বসন্ত', 'অভিসারিকা', 'দীরালী', 'জ্যোৎস্নারাতে খোলা ছাতে গানবাজনার জলসা'—আর তা ছাড়া fresco বা ভিত্তিচিত্র 'কচ ও দেবযানী' আর 'রাধাকৃষ্ণ'। এই-সব ছবি চোখের ভিতর দিয়ে আমার আভ্যন্তর শিল্পচেতনাকে, আর সঙ্গে-সঙ্গে আত্ম-

দিদৃক্ষাকে নোতুনভাবে জাগিয়ে তুল্‌লে, আত্মসমীক্ষার পথে যেন অনেকটা এগিয়ে দিলে। বিবেকানন্দের রচনা প'ড়ছি, আর সপ্তাহে একদিন ক'রে সময় ক'রে নিয়ে আর্ট ইস্কুলে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ঐ কয়খানি ছবি, বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তখনকার Halliday Street (এখন নাম হ'য়েছে চিত্তরঞ্জন আভেনিউ, মধ্যে এর নামকরণ হয় Central Avenue)-এ অবস্থিত মোতী শীলের ইস্কুল পালিয়ে বুধবার দিন বিকালে, চৌরঙ্গী রোডে মিউজিয়ামের পাশে আর্ট ইস্কুলে হেঁটে গিয়ে দেখ্‌তে যেতুম। আর্ট ইস্কুলের প্রিন্সিপাল হ্যাভেল সাহেবের সংগৃহীত মধ্যযুগের ভারতকলার ছোটো ছোটো পটগুলিও ছিল অন্যতম আকর্ষণ।*

মনের মধ্যে অবস্থিত অব্যক্ত শিল্প-প্রীতি এই-সবে রূপ পাচ্ছে, এমন সময়ে ১৯০৪ সালে, তখন ইস্কুলের থার্ড ক্লাসে পড়ি, চোদ্দ বৎসর বয়স, তখন মানসিক জীবনের উন্মেষে প্রথম এক নবীন অব্যক্ত অনুভূতি এল, সাহিত্যিক বিচার-বোধকে যেন এই প্রথম জাগিয়ে দিলে, অবচেতনায় নোতুন সাড়া পেলুম—সেটি হ'ল রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে প্রথম সংস্পর্শ লাভ।

চোদ্দ বছরের ছেলের মনের মধ্যে যে মানসী দেবী সুপ্ত ছিল, এইবার যেন সোনার কাঠির ছোঁয়াচ পেয়ে তার জাগো-জাগো ভাব এল, পুলক-বিস্ময়-মেশা কৌতূহল যেন তার জগৎ বা বহিঃপ্রকৃতি আর মন বা অন্তঃপ্রকৃতিকে নোতুন রঙে রঙিয়ে দিলে। থার্ড ক্লাসে পড়ি, তখন বয়সে একেবারে শিশু না হ'লেও, ক্লাসের সব ছেলেদের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে ছোটো ছিলুম, অন্ততঃ চেহারায় গৌরবর্ণ ফুটফুটে দেখতে ছিলুম—পরীক্ষায় ফল ভালো ক'রতুম ব'লে সব মাষ্টারদের প্রিয়পাত্র ছিলুম—ক্লাসে আমার যেন দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল, আধিপত্য ছিল। এমন সময়ে ঐ ক্লাসে একটি নোতুন ছেলে এসে ভর্তি হ'ল। তাতে মনে হয়, এইবারে আমার বুঝি প্রতিপত্তির এক অংশীদার এল। সে হ'ল রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্র, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত বা গোরা, বয়সে আমার চেয়ে বোধ হয় এক বছর ছোটো, কিন্তু দেখতে আমার

* ক'লকাতা গভর্নমেণ্ট আর্ট ইস্কুলের গ্যালারিতে অবনীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের প্রসঙ্গটি সুনীতিকুমার তাঁর 'যুগন্ধর শিল্পগুরু শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ' (বঙ্গাব্দ ১৩৫৫, ১৩ চৈত্র) প্রবন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা ক'রেছেন (দ্রষ্টব্য 'মনীষী স্মরণে', জিজ্ঞাসা. কলিকাতা-৯। কলিকাতা-২৯, মার্চ ১৯৭২, পৃঃ ১৪০-৪৮)।—অ।

চেয়ে আরও ছেলেমানুষ বা কমনীয় ছিল, ক'লকাতার মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের পুরাতন বংশের ছেলে—'সংবাদ-প্রভাকর'-এর স্থাপয়িতা কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের [ভাই রামচন্দ্র গুপ্তের] প্রপৌত্র, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ছিলেন তার পিতা। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার সুবিধা হবে ব'লে, শান্তিনিকেতনের ইস্কুল ছেড়ে ক'লকাতার মোতী শীলের ইস্কুলে এসে আমাদের সহপাঠী হ'ল। একে দেখে, একটু কৌতূহল হ'ল, প্রচ্ছন্ন আনন্দও হ'ল, আবার ক্লাসে আর ইস্কুলে আমায় পসার মাটি ক'রবে আশঙ্কা ক'রে একটু অস্বস্তি আর রাগও হ'ল। তবে আমি যেচে গোরার সঙ্গে ভাব ক'রলুম। ব'নেদী হ'লেও ধনী ঘরের ছেলে নয়। ইস্কুল ভাঙলে পরে বিকালে হ্যালিডে স্ট্রীট থেকে গোরা মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে (গ্রে স্ট্রীটের কাছে) আর আমি সুকিয়াস্ স্ট্রীটে আমাদের বাড়ি ফিরবার সময়ে প্রায় প্রতিদিন একসঙ্গেই ফিরতুম—এইভাবে ক্লাসের ঘনিষ্ঠতা আমাদের মধ্যে আরও বাড়ে। ইস্কুলে প্রথম প্রথম শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের আর রাবীন্দ্রিক মানসিক আর সৌজন্যময় আচরণের মর্য্যাদা নিয়ে যখন ক্লাসে আসত, তখন আমাদের মনে একটু অবজ্ঞা-পূর্ণ কৌতূহলের অন্ত ছিল না। গোরার একখানি খাতায় একদিন দেখলুম—রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি ছোটো কবিতা, গোরার নিজের হাতে লেখা—যেমন "পঞ্চনদীর তীরে/বেণী পাকাইয়া শিরে/দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে/জাগিয়া উঠেছে শিখ—/ নির্মম নির্ভীক।" আর 'প্রার্থনাতীত দান'—"পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল/বন্দী শিখের দল—" ইত্যাদি। 'কথা ও কাহিনী'র কবিতা। আমার কাছে একেবারে নূতন বস্তু—আগ্রহের সঙ্গে তখনই প'ড়ে ফেল্‌লুম। বিষয়-বস্তুর রস অনির্বচনীয়, ভাব নোতুন, ভাষার ঝংকার নোতুন। আমি তো নোতুন অপ্রত্যাশিত এক জগতের যেন খবর পেলুম।[৪] এদিকে ক্লাসের প্রায় সকলে, সহপাঠীদের কেউ কেউ আর মাষ্টারদের মধ্যে বিশেষ ক'রে অঙ্কের মাষ্টার (নানা গুণে তিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন) সেই গিরিজাবাবু—সবাই জানতে পারলে যে নোতুন ছেলে গোরা রবীন্দ্রের কবিতার খুব চর্চা করে, রবীন্দ্রভক্ত, "রাবীন্দ্রিক"।

১৪।১।৭৬

ছাত্রদের মধ্যে গিরিজাবাবুর নামডাক ছিল। তিনি অঙ্কের মাষ্টার হ'লেও সাহিত্য-চর্চা ক'রতেন, কবিতা রচনাও ক'রতেন। আমাদের মধ্যে যখন কোনও কবিতার দরকার হ'ত—যেমন কোনও মাষ্টারমশাই ইস্কুল থেকে বিদায় নিচ্ছেন, সভা ক'রে ছাত্রেরা তাঁর নামে শ্রদ্ধা-উপহার দিয়ে দুঃখ প্রকাশ ক'রবে, তখন আমরা গিরিজাবাবুর শরণাপন্ন হ'তুম। তিনি অবলীলাক্রমে আমাদের কবিতা লিখে দিয়ে খুশি ক'রে দিতেন—"ভকতি-কুসুম করিয়া চয়ন গাঁথিয়াছি এই ফুলহার। লহ লহ দেব! লহ গো মোদের শ্রদ্ধার এই উপহার ॥", ইত্যাদি। এখন, তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা বোধ হয় বুঝতেন না, তাঁর ভালো লাগ্‌ত না, তাই তিনি সময় পেলেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা ক'রতেন। ক্লাসে সদ্য শান্তিনিকেতন থেকে আগত রবীন্দ্রভক্ত নোতুন ছাত্রটিকে পেয়ে, তিনি উৎসাহের সঙ্গে রবীন্দ্র-রচনার বিদ্রূপ আরম্ভ ক'রলেন—"কি হে, তোমাদের রবীন্দ্রনাথ মস্ত কবি, না? তিনি কেমন কবিতা লেখেন, জানো?—'আমি আছি ব'সে, তারা প'ড়ল খ'সে!" ব'লে তিনি নিজেই খুব হাসতেন, আমরাও কেন হাসছি ঠিকমতো না বুঝে তাঁর হাসিতে যোগ দিতুম। বেচারি গোরা একটু ভেকা ব'নে যেত। পরে একসঙ্গে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরবার দীর্ঘ পথে সে ভদ্রভাবে আমার কাছে অনুযোগ ক'রত—"তোমরা তো কেউ আমাদের গুরুদেবের কবিতা পড়ো নি, পড়ো না—তোমাকে ব'লছি প'ড়ে দেখ, নিশ্চয়ই ভালো লাগ্‌বে—একবার প'ড়লে আর ছাড়তে পারবে না।" কবিতা পড়ার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু গোরার কথা মনে হ'ল যেন তার চ্যালেঞ্জ। বললুম, "বেশ, প'ড়বো, তবে তুমি আমায় রবিবাবুর বই দিয়ো, আর ভালো কবিতা বেছে দিয়ো।"

১৬।১।৭৬

ইস্কুলে আলাদা ব'সে যে গোরার তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্র-কবিতার চর্চা ক'রবো তার স্থান আর সময় ছিল না। টিফিনের আধঘণ্টা অন্য ছেলেদের সঙ্গে হৈ-হল্লা ক'রেই কাট্‌ত—সাহস হ'ত না তাদের বাদ দিয়ে কাব্য-চর্চা ক'রবো, নিরিবিলির ছিল একান্ত অভাব। তাই আমরা ঠিক ক'রলুম, ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে, মুখ-হাত ধুয়ে জলটল খেয়ে দুজনে জমা হবো হেদুয়া পুখুরের

ধারে। তখন তো ক'লকাতা অত ঘিঞ্জি জায়গা ছিল না। মানিকতলা স্ট্রীটের ধারে, সিমলা বাজারের কাছে এই হেদুয়া পুখুর—পরে ইংরিজি নাম হয় 'কর্নওয়ালিস্ স্কোয়ার'। এর পূব দিকে 'জেনেরাল আসেম্ব্লিজ্ ইন্‌স্টিট্যুশন'-এর ইস্কুল আর কলেজ, আর কোনও এক বিলিতি খ্রীষ্টান সমিতির প্রতিষ্ঠিত এক মেয়ে-ইস্কুল আর মেয়ে-মিশনারিদের আবাস-গৃহ, আর পশ্চিম দিকে ছিল গভর্নমেণ্টের পরিচালিত মেয়েদের ইস্কুল আর কলেজ 'বেথুন কলেজ', একটি খ্রীষ্টান গির্জা, আর খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের একটি হল-ঘর। উত্তর-পশ্চিম কোণে এক ঠিকে-গাড়ির আড্ডা, আর খোলার চালের মাট-কোঠায় মুসলমান বাবুর্চী-খানা। সমগ্র পল্লীর পরিবেশ সেকেলে, কোনও রকম ভীড় বা গোলমাল নেই। ডিমের আকারে হেদুয়া পুখুরের ঘাসে-ভরা গ'ড়েন পাড় চারদিকের পায়ে-চলা রাস্তা থেকে জল পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে—সেই গ'ড়েন পাড়ে ঘাসের উপরে ব'সে বা গা এলিয়ে দিয়ে আধ-শোয়া হ'য়ে গ্রীষ্মকালের বিকালে আর সন্ধ্যেয় আড্ডা দেবার অমন জায়গা আজকালকার দিনে দুর্লভ। তখন হেদুয়া পুখুরের ধারে রেলিং ছিল না। মোহিত সেনের সম্পাদিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী নিয়ে গোরা আস্‌তো, আর আমরা তখন হেদুয়ার পাড়ে শুয়ে ব'সে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তুম। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা—নোতুন স্বর্গলোকের দ্বার যেন আমার কাছে খুলে গেল, বা আধ-খোলা হ'ল। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের কবিতা—'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কথা ও কাহিনী', 'ক্ষণিকা', 'শিশু' প্রভৃতির কবিতা অপূর্ব রসে, চোদ্দ বছরের ছেলে আমি, যার চিত্তের বিকাশ তখনও কিছুই হয় নি, তার মন ভরিয়ে দিলে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'-র কল্পনা, নানা ভাবে 'জীবন-দেবতা' কিরূপে তাঁর হৃদয় মনকে, সুপ্ত জাগ্রত চেতনাকে মথিত ক'রেছিল তার আভাস, এ-সব যেন আমারও আধিমানসিক আর আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যেও এক অব্যক্ত শক্তির সঙ্গে এসে অনুপ্রবেশ ক'রলে। "গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা", "নিরুদ্দেশ যাত্রা", "মানসসুন্দরী" (এই কবিতার রস তখন বুঝতে পারি নি, 'জীবন-দেবতা' কী ক'রে শিশুকালের ক্রীড়াসঙ্গিনী থেকে তাঁর যৌবনের প্রেয়সী এবং বিবাহিতা সহধর্মিণীর রূপে ধরা দিয়েও দেখা-সাক্ষাৎ ধরা-ছোঁয়ার জগতের উর্ধ্বে র'য়ে গেলেন, অস্পষ্টভাবে প্রণিধানের চেষ্টা ক'রতুম), 'জীবন-দেবতা' পর্য্যায়ের অন্য কবিতা, 'চিত্রা'র "উর্বশী" আর বিশেষ ক'রে "সিন্ধুপারে" কবিতার রোমাণ্টিক-মিষ্টিক, এর রমন্যাস-রভসানন্দ

হৃদয়কে মনকে আচ্ছন্ন ক'রলে। পরে এই-সব কবিতার প্রতিধ্বনি, কলেজে উঠে ইংরিজি সাহিত্যে কীটস্ শেলি কোল্‌রিজের রচনায় পেয়ে রসানন্দ আরও বিস্তারিত আরও ঘনীভূত হ'ল।[৫]

আমার আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশে রবীন্দ্রকাব্যজ্যোতি এসে নোতুন প্রাণ এনে দিলে, তাঁর কল্পিত 'জীবন-দেবতা' এক অপরিসীম মূল্য নিয়ে আব্‌ছা-আব্‌ছা ভাবে আমার মনের মধ্যকার হিন্দু দেব-কল্পনা, শিব-উমা, বিষ্ণু, শ্রী, দুর্গা, কালী প্রভৃতি, যার উপরে বিবেকানন্দের উপদিষ্ট বেদান্ত-চিন্তা এক ধরনের অতি মহনীয় আলোক পাত ক'রেছিল, সেই সমস্তকে এমন একটা নোতুন রূপ দিলে যা অনির্বচনীয়, যার পূরো বিশ্লেষ বা ব্যাখ্যা আমার অপরিপক্ব কিশোর-মনের পক্ষে অসম্ভব ছিল।—এখনও এই বৃদ্ধ বয়সে এই অনির্বচনীয়তার গণ্ডী বা জাল কাটিয়ে উঠ্‌তে পারলুম না। এক ধরনের মানসিক-যুক্তি-নিষ্ঠ, অজ্ঞেয়বাদিতা মনে আসে—কিছুই তো জান্‌তে পারলুম না, তবুও এই অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়ের টান একটা অনুভব করি—নিজেকেও জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু নিজের কাছেও উত্তর আসে—"আমি কী জানি? কিছুই তো না।"—তবুও রবীন্দ্রনাথের মতোই, আমি 'কী জানি!'* বলার সঙ্গে-সঙ্গে এক অব্যক্ত ক্রন্দন আসে, সমগ্র অস্তিত্বকে আলো-করা দুরাপনা বায়ুর মতো অজ্ঞেয় উর্বশীর জন্য, মনের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা আর প্রার্থনা জাগে। এই জীবনে তাকে বুঝি বা না বুঝি, জানি বা না জানি, কেবল অকারণ রসানন্দেও "প্রাণ উঠে যেন পুলকি।"†

বেদের আর উপনিষদের কতকগুলি মহাবাক্য, নিজের আভ্যন্তর জিজ্ঞাসার অস্বস্তি আর সেই অস্বস্তির এক প্রকারের সমাধান, আর তাঁর রচনার মধ্যে বিভিন্ন ভাবে (এবং কখনও-কখনও পরস্পর-বিরোধী ভাব বা চিন্তা বা অনুভূতি-পরম্পরার মাধ্যমেও) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি আর অনুভূতি, তাঁর সৌন্দর্য্য-বোধ, "কিন্তু কেন?" এই প্রশ্ন অহরহঃ তাঁর মনকে কাতর করা সত্ত্বেও একটা আশা-মূলক অজ্ঞেয়বাদে বোধ হয় তিনি শেষকালে পৌছান। নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ নানা দেবকল্পনা, কর্ম ও পুনর্জন্মবাদ, অপৌরুষেয় অভ্রান্ত শাস্ত্র, পাপপুণ্যের

* দ্রষ্টব্য "আমি শুধু বলি, 'কী জানি! কী জানি!'", উৎসর্গ, ৬-সংখ্যক কবিতা, ১ম স্তবক।—অ।

† দ্রষ্টব্য "চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন/পুলকি।", ঐ, শেষ স্তবক।—অ।

বিচার ক'রে শাস্তি বা পুরস্কার নিয়ে ব'সে আছেন এক ঈশ্বর—এসবের উর্ধ্বে অবস্থিত "তৎ সৎ"—যার সম্বন্ধে 'সৎ', 'চিৎ' আর 'আনন্দ' ছাড়া আর কিছু আমাদের মানুষী জ্ঞানদৃষ্টিতে বলা যায় না—মনে হয় সেই রকম একটা বোধ বা বিচারই তাঁর শেষ অভিজ্ঞতা। তাঁর জীবনের শেষ কথাটি, মৃত্যুর সাত দিন আগে যে কবিতাটি তাঁর মুখের বাণী শুনে অনুলিখিত হয়, সেখানেই কি নিহিত আছে ? এই সৃষ্টি একটা ছলনা—নানা ধর্মের অনুষ্ঠানের যত মিথ্যা বিশ্বাস জগৎ জুড়ে নানা ফাঁদ পেতে রেখেছে—যার মানসিক মহত্ত্ব অনায়াসে এই-সব ছলনা আর ফাঁদ কাটিয়ে উঠতে পারে—কী ক'রে তা হয় তা কেউ জানে না—শাশ্বত সত্য যদি কিছু থাকে তার হাতে "শান্তির অক্ষয় অধিকার" সে-ই পায়। এইরূপ বিচারে অন্ততঃ আমি এখন এসে পৌঁছেচি—যুক্তি-তর্ক দিয়ে একে খাড়া ক'রতে পারবো না, কিন্তু এইটিই আমার শেষ অনুভূতি। অন্যত্র যে কথা একবার ব'লেছিলুম, তারই পুনরাবৃত্তি ক'রে এই সুদীর্ঘ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আপাততঃ এখানেই শেষ করি—"যাহা হইবার তাহা হইবেই। মানুষ তাহার নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা নহে। আমরা কিছুই জানি না ; মনে হয়, এ জীবনে কিছু জানাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। এই বিশ্বাস এখন মনে একটা অভূতপূর্ব অনাস্বাদিত শান্তি আনিয়া দিতেছে। যাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা সব-কিছু জানিয়াছেন, সত্য বস্তু পাইয়াছেন, তাঁহাদের অবিশ্বাস করি না, তাঁহাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি। কিন্তু আমি জানি নাই। আমার কাছে শাশ্বত সত্তা আবিষ্কৃত হন নাই। সকলেরই এক গতি, তাহাতে ক্ষোভ নাই। আমি নাস্তিক নই। এক সার সত্য—'তৎ সৎ', যাহা আছে—তাহাই সকল অস্তিত্বকে ধরিয়া আছে, তাহার মধ্যে আমিও আছি। 'তত্র কো মোহঃ, কঃ শোকঃ —একত্বম্ অনুপশ্যতঃ।' সেই বিরাট্ শান্তি সমক্ষে থাকিলেও, আমি মানুষ, মানুষের অজানা ভবিষ্যৎ কী, এ বিষয়ে চিন্তা আমাকেও পীড়া দেয়। কিন্তু অন্য গতি নাই !" *

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮৩-তম বর্ষগ্রন্থি উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা-দিবসে (৮ শ্রাবণ, ১৩৮২ । ২৫ জুলাই, ১৯৭৫) সভাপতি সুনীতিকুমার যে-ভাষণ দেন, তা থেকে এই কথাগুলি তুলেছেন। কিন্তু 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-র ১৩৮২ সালের প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যায় মুদ্রিত ভাষণটিতে "সকলেরই এক গতি" স্থলে আছে "সকলেরই এই গতি", আর "অজানা ভবিষ্যৎ কী, এ বিষয়ে চিন্তা" স্থলে আছে কেবল "অজানা ভবিষ্যৎ" ; তা ছাড়া, "আমাকেও পীড়া দেয়।". এর পরে, "কিন্তু অন্য গতি নাই !", এই বাক্যটি নেই।—অ।

১৭।১।৭৬

তবে একটা কথা। কী, কেন, কে—এ-সবের সমাধান হ'ল না। তবু এই বুড়ো বয়সে, জীবনের শেষ অবস্থায়, ভোর রাত্রে যখন আর ঘুম হয় না—এটা বুড়ো বয়সের ধর্ম—একটা কথা আছে—"পহিল পহর সব কোঈ জাগৈ। দূজ পহর জাগৈ ভোগী। তীজ পহর রোগী জাগৈ। চউথ পহর জাগৈ যোগী ॥"—সত্যিই বুড়ো বয়সে আর কিছু না হোক, মানুষকে যোগী বা ভাবনা-চিন্তা-যুক্ত ক'রে দেয়—সেই অতি ভোরে জেগে উঠে, ব'সে ব'সে এই জীবনের সমীক্ষা না ক'রে সিংহাবলোকন না ক'রে পারি না। তখন তো পূর্বাপর অনুধ্যান ক'রে মনে হয়, জীবনে তো সু আর কু, অর্থাৎ ভালো আর মন্দ, Good and Evil, হিন্দীতে যাকে বলে 'ভলা-বুরা', তমিলে 'নলম্ তীবুম্', সুখ আর দুঃখ, দুই-ই র'য়েছে।—কিন্তু আমার এই দীর্ঘ জীবনে আমি কেন এত বেশি ক'রে সু বা যা ভালো, যা কাম্য, যাকে সকলেই প্রার্থনীয় ব'লবে, তাই পেয়ে গেলুম—সু বা ভালোর তুলনায় কু বা মন্দ যা মানুষে চায় না তার ভাগ জীবনে এত কম কেন এল, এর কারণ কী? সকলের কাছ থেকে তো আমি ভালোই পেয়ে গেলুম, মন্দ তো কারো কাছ থেকে মনে রাখ্‌বার মতন তেমন কিছু পাই নি। জীবন পরম আরামে আনন্দে, কৃতকারিতার সঙ্গে, মোটের উপর প্রচুর সুনামের সঙ্গে [কাটিয়ে দিলুম], সকলের কাছ থেকে স্নেহ ভালোবাসা ভক্তি যা কিছু মানুষের কাম্য সবই তো পেলুম। 'অজ্ঞানং পাতকং মহৎ'—যারা অন্যায় ক'রেছে, নাবুঝ হ'য়েই ক'রেছে—তারা যখন বুঝ্‌তে পেরেছে, তখন সব ভালোভাবেই মিটে গিয়েছে। কিন্তু আমি এই এত ভালো পেয়ে গেলুম কেন? জীবনে তো এমন কিছু করি নি যার জন্য এই ভালো পেয়েছি। পুনর্জন্ম কর্মফল প্রভৃতির ব্যাখ্যায় মন তো ভরে না। কিন্তু যখন দেখি যে নানা সদ্‌গুণে, সৎ জীবন যাপনে, লোকের হিতৈষণায় যারা আমার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়, সেই রকম কত মানুষ কত দুঃখে কষ্টে ব্যর্থতার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে—যেমন আঁস্তাকুড় খুঁটে খাচ্ছে, যেখানে আমি আরামে আছি, জীবনের বেশির ভাগ সময় তো ভাতের উপরে খালি একটু নুন নয়, পঞ্চ ব্যঞ্জনও তো জুটেছে—কেন আমার এই সুখ, এই আনন্দ? How did I deserve it? কে আছে যার বিধানে এটা হ'ল? God—a popular premise—বুঝতে তো পারলুম না কার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো, যদিও সে কৃতজ্ঞতার কোনও

মূল্য নেই ?—এখানেই একটা অব্যক্ত আকুতি আসে—"আবিঃ আবীর্ম এধি।" তখন অজ্ঞাতের প্রতি এই কৃতজ্ঞতা মনকে ভ'রে দেয়, নিজেকে সামলাতে পারি না—বাধা না মেনে রুদ্ধ চোখের জল নেমে আসে। এ রকম অজ্ঞাত অব্যক্তের উদ্দেশে এই অন্ধভাবে হাত্ড়ানো, নিরুপায় ক্রন্দন—এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়—এ রকম অবস্থা তো আরও অনেকের, যাদের দৃঢ় আস্থা আর বিশ্বাস নেই তাদেরও তো আছে। কান্না আসে, অনুযোগ আসে আর এক ধরনের শান্তিও আসে—এই নিয়েই, আর দেহ-রক্ষার পরে যা ভবিতব্য তাই আমাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে এই বিচার নিয়েই, আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ব'লে একটা আব্ছা-আব্ছা কৌতূহল-মিশ্র আশা নিয়েই বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দিচ্ছি—এই অবস্থার জন্য দুঃখ বা ক্ষোভ বা অনপনেয় অস্বস্তি আর এখন নেই। "তৎ সৎ"—যা আছে, তারই জয়! "কো অদ্ধা বেদ?"—কে-ই বা নিশ্চিতভাবে এই অজ্ঞাতকে জানে? *

* পাণ্ডুলিপির এখানটাতে এসে থেমেছি, সুনীতিকুমার আমাকে ব'ললেন, "রবীন্দ্রনাথের 'শেষ সপ্তক' প'ড়েছেন তো—'যারা ব'ললে "জানি", তারা জানল না।' " ('শেষ সপ্তক'-এর নয়-সংখ্যক কবিতার শেষ পংক্তি)।—অ।

১৯।১।৭৬

"সু" আর "কু", "ভালো, মন্দ" নিয়ে আমার এই জীবন-কথা কিভাবে প্রকাশ ক'রবো সে বিষয়ে কোনও স্থির সংকল্প নিয়ে লেখা আরম্ভ করি নি। এখন উপস্থিত কালে যে কথাটা বারবার মনে হয়, সব কিছু ছাপিয়ে সেই কথাই যেন আমায় বিব্রত ক'রে তুলেছে—তাকে কেন জানি না ঠেকাতে পারলুম না, জীবনে যে সমস্যার সমাধান হ'ল না সেই সম্বন্ধে আবোল-তাবোল লিখে মনকে একটু হাল্‌কা করবার চেষ্টা ক'রলুম—ভেবে-চিন্তে গুছিয়ে লেখা হ'য়ে উঠল না। এইবার জীবনে যা দেখেছি, যা শুনেছি, মানুষের বুদ্ধিতে যা ধরা যায়, যা মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে আসে, তাই ধরি।

আমার জন্ম হয় বাঙলা ১২৯৭ সালে ১১ই অগ্রহায়ণ, ইংরিজি ১৮৯০ সালে ২৬শে নভেম্বর। ভাগীরথী বা গঙ্গার পশ্চিম তীরে ক'লকাতার উপনগর হাওড়ার অধীনস্থ শিবপুর পল্লীতে মামার বাড়িতে আমি ভূমিষ্ঠ হই। শিবপুর এখন আমার এই ছিয়াশি বছর বয়সে সর্বগ্রাসী ক্রমবর্ধমান এখনকার কালে অতি নোংরা হাওড়া শহরের কবলে প'ড়েছে, কিন্তু আমার জন্মের সময়ে আর ছেলেবেলায় বহু বৎসর ধ'রে, যৌবনকাল পর্য্যন্ত শিবপুর ছিল ক'লকাতার পাশে অবস্থিত চমৎকার একটি পল্লী-অঞ্চল। গঙ্গার ধারে বড়ো বড়ো চট-কল ময়দার কল দু-একটা খাড়া হ'য়ে গেলেও আর গঙ্গার ধারে মাল-বহা রেলের গাড়ির লাইন থাকলেও, নদীর ধারটুকু তখন নষ্ট হয় নি—স্নানের ঘাটে, নদীর ধারে নৌকো আর পানসির ঘটায়, বড়ো বড়ো কাঠের গুঁড়ি দুই একটা কাঠের গুদামে বর্মা থেকে জাহাজে ক'রে এনে জমা করায় আর গোরুর গাড়ি ক'রে সেই-সব কাঠ বাইরে চালান দেওয়ার জন্য একটু জমজমাট ছিল। গঙ্গার ধারে শিবপুরের শ্মশানঘাটও ছিল, ঘাট ব'লতে কিছুই নয়, এমনি দু চার ঘর মুরদা-ফরাস, আর দু' পাঁচজন বাঙালী তান্ত্রিক সাধু, একটা গোলপাতার ঘরে এক শিবলিঙ্গ, ঘাটের ধারে রঙ-চটা দু চারটে বৃষ-কাঠ খাড়া ক'রে পোতা—ব্যস্‌। চটকলের গঙ্গার ধারের সড়কে চটকল আর ময়দার কলের বাড়ি আর রেলের লাইন যেন শিবপুর গ্রামের সঙ্গে খাপ খায় না, এমন বেঢপ সীমারেখা ছিল,

পাশেই গঙ্গা থাকাতেই যেন আধুনিক 'সভ্যতা' আর 'প্রগতি'র এই আক্রমণ সইতে পারা যেত। কিন্তু গ্রামের একটু ভিতরে গেলে, সেই প্রাচীন বাঙালী ভদ্রপল্লীর রূপটি আমার ছেলেবেলায় কৈশোর পর্য্যন্ত নষ্ট হ'তে পারে নি। আর তারই মধ্যে আমার বাল্যজীবনের আনন্দময় স্মৃতি অনেকটা জড়িয়ে আছে।

মামার বাড়ি শিবপুর গ্রাম হ'লেও, আমাদের বাড়ি হ'চ্ছে ক'লকাতায়। ক'লকাতা তখনও মোটের উপরে একটি খাঁটি বাঙালী শহরই ছিল। এখনকার মতো বহিরাগত ভারতীয় নানা জাতির মানুষের ভীড়ে আর তাদের চাপে ক'লকাতা (অন্য সব পুরানো শহরের মতো) তার সরল শান্তিময় স্বস্তিকর পরিবেশ হারায় নি। মাঝে ক'লকাতার লোকসংখ্যায় শতকরা প্রায় ষাট হ'য়ে গিয়েছিল অবাঙালী—বিহারী হিন্দুস্থানী উড়িয়া রাজস্থানী পাঞ্জাবী গুজরাটী। ভারত-বিভাগের পরে পূর্ব-বাঙলা থেকে বিতাড়িত বাঙালী হিন্দুর দল সর্বস্বান্ত হ'য়ে পশ্চিম-বাঙলায় বিশেষ ক'রে ক'লকাতা অঞ্চলে শরণার্থী হ'য়ে আশ্রয় ক'রে নেয়, তাইতেই এই অস্বাভাবিক ভাবে বাঙালীর বাস একটু বেড়ে গিয়েছে, বিগত ২৫ বছরের মধ্যে।

আমার ঠাকুরদাদা (পিতামহ) ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের নিবাসের পত্তন করেন ক'লকাতায়।

২০।১।৭৬

বাঙালী রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিক (দাক্ষিণাত্য আর পাশ্চাত্য) প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের আর কায়স্থ আর অন্যান্য মাননীয় বা পদস্থ বর্ণের মধ্যে কুলজী অর্থাৎ 'কুল-পঞ্জী' বা বংশের ইতিহাস রাখাটাই বাঙালীর সংস্কৃতির একটা অঙ্গ ছিল, সে হিসাবে আমাদের বংশেরও কুলজী ঠাকুরদা সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন, চাটুজ্যে বংশের প্রতিষ্ঠাতা বা আদিপুরুষ দক্ষ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ আমার থেকে আটাশ পুরুষ আগে পর্য্যন্ত পূর্বপুরুষদের নাম সেই কুলজীতে পাওয়া যায়। এই যে বংশপীঠিকার বা পীড়ির সব নাম আর ক্রম পাওয়া যায়, তা কতটা সত্য বা নির্ভুল, তা জানবার উপায় নেই। তবে আমাদের বংশের বিভিন্ন ঘরের সব তালিকা মিলিয়ে একটা কিছু কাজ-চালানো, মোটামুটিভাবে মেনে নেবার মতো পীঠিকা বা পীড়ি তৈরি হ'য়েছে। কতকগুলি বহুপ্রচলিত আর যার সম্বন্ধে সত্য ব'লে সকলের বিশ্বাস আছে এমন নাম আর উপাখ্যান

আমরা পাই। এ-সবের আকর বা মূল বই হ'চ্ছে সংস্কৃতে আর বাঙলায় লেখা প্রাচীন বাঙালীর কুলশাস্ত্র; আর আমাদের ঘরে রাখা কুলজী। এই-সব উপাদান নিয়ে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কয়েক খণ্ডে 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' নাম দিয়ে বিরাট এক বই প্রকাশ ক'রেছেন—তার 'ব্রাহ্মণ খণ্ড', 'কায়স্থ খণ্ড' প্রভৃতি কতকগুলি বিভাগ আছে। তাঁর বহু পূর্বে লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' ব'লে তাঁর মূল্যবান্ গ্রন্থে বাঙালী ব্রাহ্মণের কুলের কথা, বিভিন্ন গোত্রের আর তার শাখার ইতিহাস প্রভৃতির প্রথম আলোচনা করেন। এই রকম কুলপঞ্জী বাঙলার বাইরেও অন্যত্র পাওয়া যায়—যেমন আসামে, উড়িষ্যায়, মিথিলায়, উত্তর-ভারতে কনৌজিয়া, গৌড়, সারস্বত, মালবীয় প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে, আর গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে, কোঙ্কণে, আর তা ছাড়া দ্রাবিড়-ভারতে অন্ধ্রদেশ কর্ণাটক তমিলনাডু কেরলে, তুলুব্‌নাডু কোডগুনাডুতে এই রকম কুল-পঞ্জী পাওয়া যায়। সারা ভারতবর্ষে এখন মূলতঃ পাঠান বা আফগান, ইরানী, আরব প্রভৃতি বিদেশীই হোক্ বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কায়স্থ বৈদ্য জাঠ কলিতা করণ প্রভৃতি স্বদেশীই হোক, উচ্চ বংশের মুসলমান ঘরেও অনুরূপ 'কুর্‌সীনামা' বা বংশপীঠিকা রক্ষিত থাকে। এই-সব কুলপঞ্জী গ্রন্থের বক্তব্য অন্য ইতিহাসের অভাবে আমরা সাধারণতঃ মেনে নিই। কিন্তু খুব খুঁটিনাটির সঙ্গে যাঁরা ইতিহাস-চর্চা করেন, একেবারে অবিসংবাদিত সত্য ব'লে চুলচেরা পণ্ডিতি বিচারে যা উতরায় নি এমন উপাদানে যাঁরা অস্বস্তি বোধ করেন, আর পারলে পরে পূরোপূরি 'নস্যাৎ' ক'রে দেন, তাঁরা এই কুলজী মানেন না—কুলগ্রন্থকে হেসে উড়িয়ে দেন। যাক্, সে তর্কে এখন যাবো না। তবে বাঙালীর ঘরের কথায় এর একটা স্থান বা মর্য্যাদা আছে—ভারতের বাইরে অন্য নানা দেশেও যেমন।

এই কুলজী-মতে, বিবাদ-গ্রস্ত ব্যাপার সব ছেড়ে এইটুকু অনুমান করা যায় যে, গৌড়-বঙ্গের কর্ণাট-ক্ষত্রিয় সেনবংশী রাজা বল্লালসেনের আমলে ('বল্লাল' নামটি মূলে কানাড়ী ভাষার), রাঢ়ী আর বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা যাদেরকে নিজেদের আদিপুরুষ ব'লে মনে ক'রে থাকেন, সেই রকম পাঁচ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উত্তর-ভারত থেকে, সম্ভবতঃ কান্যকুব্জ বা কনৌজ থেকে, জীবিকার সন্ধানে বাঙলায় এলেন।

২২।১।৭৬

তাঁদের সঙ্গে তাঁদের ভৃত্য বা অনুচর রূপে পাঁচ জন কায়স্থও আসেন, এইরকম 'ইতিহাস' আছে। এঁদের নাম ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় আর বেদগর্ভ। শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, ভারদ্বাজ, বাৎস্য, সাবর্ণ গোত্রের ব্রাহ্মণ এঁরা। রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা শাণ্ডিল্য গোত্রীয়, ভট্টনারায়ণের বংশের। বঙ্কিম, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শরৎচন্দ্র—এঁরা কাশ্যপ, দক্ষের বংশের। নানা শাখা-প্রশাখা নিয়ে এই-সব বংশের সম্বন্ধে বহু বই আর বড়ো বড়ো বংশলতিকা ছাপা হ'য়েছে।

ক'লকাতা অঞ্চলে আমাদের এই চাটুজ্যে বংশের অন্যতম আদিপুরুষ ছিলেন ভৈরবচন্দ্র। ইনি ফরিদপুর জেলার পাংশা গ্রাম থেকে, পদ্মানদীর দেশ ছেড়ে, ভাগীরথীতীরে এলেন, কিছুকাল পরে দামোদর পেরিয়েও নিজের স্থান ক'রে নিলেন। তিনি ছিলেন মহাকুলীন, পিতৃপুরুষের পাণ্ডিত্যের জোরে বংশ-মর্য্যাদায় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানে। শোনা যায় যে মহারাজা বল্লালসেন (কোনও মতে তাঁর এক পূর্বপুরুষ—মহারাজা আদিশূর) পাণ্ডিত্য আর ব্রাহ্মণের আচার-অনুষ্ঠানে নিষ্ঠা দেখে কনৌজ থেকে আসা এই পাঁচ ব্রাহ্মণের উত্তর-পুরুষ মাত্র ছাপ্পান্ন জন ব্রাহ্মণকে উচ্চতম মর্য্যাদা 'কৌলিন্য' বা 'কুলীনতা' দান করেন। পশ্চিম বঙ্গে, উত্তর-রাঢ় প্রদেশে, আজকালকার বর্ধমান হুগলী হাওড়া জেলায় চব্বিশ পরগনায় এঁদের ভরণ-পোষণের জন্য প্রত্যেককে এক একটি গ্রাম দেন; যাতে তাঁরা সেই গ্রামের আয় থেকে নিশ্চিন্ত মনে পঠন-পাঠন যজন-যাজন পূজা-হোম প্রভৃতি ব্রাহ্মণের কাজ ক'রে যেতে পারেন, হিন্দুসমাজে বৈদিক আদর্শ রীতিনীতি ক্রিয়াকর্ম উচ্চ চিন্তা সমস্ত রক্ষা ক'রে যেতে পারেন। এই ৫৬ গ্রামের নাম ধ'রে কুলীন রাঢ়ীদের ৫৬ গাঞি বা গাঁই।

২।২।৭৬

এঁদের মধ্যে, কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ সুলোচন, রাজার দান-করা চাটুতি, বর্ধমান জেলার গ্রাম, থেকে সম্মানিত চাটুতি গাঁইয়ের পদবী পান। 'চাটুতি' বা 'চট্টপুত্রিক' গ্রামের, সংক্ষেপে 'চাটু' গ্রামের* 'জীব বা জীবক, জীয়া,

* 'চাটু' বা 'চট্ট' গ্রামের (দ্রষ্টব্য সুনীতিকুমারের *The Origin and Development of the Bengali Language*, Part I, George Allen & Unwin Ltd., London, 1970, p. 409)।—অ।

জিয়া' অর্থাৎ মাননীয় ব্যক্তি—আধুনিক হিন্দীতে 'জী, জীউ'—ব'লে বংশ-পদবী 'চাটুর্‌-জীয়া, চাটুর্জ্যা, চাটুর্জ্যে, চাটুজ্জে' স্থলোচনের উত্তরপুরুষগণ প্রাপ্ত হন। পরে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের আশপাশে যখন ইংরেজরা বাঙলা দেশের শাসক হ'য়ে বসে, তখন তাদের মুখে এই নামের একটি ইংরিজি রূপ দাঁড়ায়—Chatterjee, Chatterji, chatterjea, Chatoorjya প্রভৃতি ৮ রকম বিভিন্ন বানানে লেখা হয়। আর ১৭৫০-এর পরে এই নামের এক পণ্ডিতি বা সংস্কৃত রূপও বাঙলা ভাষায় প্রচলিত হয়, 'চট্টোপাধ্যায়'—'জীয়া'র সঙ্গে 'উপাধ্যায়' শব্দের যোগ কল্পনা ক'রে। তদ্রূপ 'মুখটি' বা 'মুখড়া' গ্রাম থেকে 'মুখুর্জ্যা' বা 'মুখুজ্জে', ইংরিজিতে Mookerjee, Mukherji, Mukhurjya প্রভৃতি ১৪ রকমের ইংরিজি বানান, হালের সংস্কৃত রূপ 'মুখোপাধ্যায়'। 'বন্দ্যপুরী' গ্রাম থেকে ভাষায় 'বণ্ডউরী, বাঁড়ুরি, বাঁড়রি' গাঁই, বাঙলায় 'বাঁড়ুর্‌জীয়া, বাঁড়ুজ্জে', ইংরিজিতে Banarji, Banerjie, Bannerjee ইত্যাদি ৮ রকমের বানান; আর শাণ্ডিল্য গোত্রের 'বাঁড়ুরি গাঁই'-র ব্রাহ্মণদের নিবাস আর একটি গ্রাম 'বন্দি-ঘাটী' থেকে অথবা গ্রামের মূল নাম 'বন্দ্যপুরী' থেকে 'বন্দ' শব্দ নিয়ে, আধুনিক সংস্কৃত রূপ হ'ল 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। তেমনি 'গঙ্গাকুলিক' থেকে 'গাঙ্গৌলি, গাঙ্গুলি', সংস্কৃতীকরণ 'গঙ্গোপাধ্যায়'। ঢাকা জেলার প্রাচীন গ্রাম 'বাঘিয়া'—ক'লকাতার উচ্চারণে 'বেঘে'—কুলীন গাঙ্গুলী বংশের একটি নামী কেন্দ্র ছিল।

মধ্য যুগের বাঙলা দেশে, সংস্কৃত-আধারিত উচ্চ শিক্ষার একমাত্র অধিকারী ব'লে, রাজার আশ্রয়ে থেকে কিছু ভূসম্পত্তি থাকায় মোটের উপরে স্বচ্ছল অবস্থার উচ্চ শ্রেণীর রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক ব্রাহ্মণেরা স্বভাবতই নবসৃষ্ট বঙ্গভাষী জনসমূহের মধ্যে বুদ্ধিতে বিদ্যায় জ্ঞানে চিন্তাশক্তিতে বিচারে পরিচালনায় বরাবরই, এখনও পর্য্যন্ত, নেতৃত্ব ক'রে এসেছেন। ভারতীয় হিন্দু জাতির শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞান চিন্তার অধিকারী এক দিকে এঁরা যেমন ছিলেন, তেমনি অন্য দিকে যে সমাজকে তাঁরা পরিচালনা ক'রতেন সেই সমাজে যত কিছু প্রাচীন আর নবীন অবগুণ ছিল,—নানা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, চিন্তাশক্তি বা কাণ্ডজ্ঞানের অভাব, সৎসাহস ও বীরত্বের অভাব, নির্বোধ নিষ্ঠুরতা—এ সমস্তই নানাভাবে তাঁদের মধ্যে মানসিক জড়তা ও পঙ্গুতাও এনে দিয়েছিল। কুশাগ্রবুদ্ধি, বরেণ্য ধীশক্তির পাশাপাশি এই সমস্ত অবগুণও ছিল, আর এই-সব

অবগুণই যেন হিন্দুর অন্যান্য সমাজ বা শ্রেণীর মতো ব্রাহ্মণ সমাজকেও আবিষ্ট ক'রেছিল। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে এক নির্বোধ তুরপনেয় কলঙ্ক ছিল কৌলীন্য প্রথা আর তার আনুষঙ্গিক বহুবিবাহ।

কৌলীন্য প্রথার বর্ণনা দিতে ব'সবো না। সমাজের অতীত যুগের এক নির্বুদ্ধিতা ও লজ্জার কথা, ৪।৫।৬ পুরুষ আগে এই কৌলীন্যের মূঢ়তা ব্রাহ্মণ সমাজকে আচ্ছন্ন ক'রেছিল। এক সময়ে, এখন থেকে প্রায় ৫০০।৬০০ বছর পূর্বে, কৌলীন্যের সামাজিক মর্য্যাদার আর সঙ্গে-সঙ্গে সেই যুগের ব্রাহ্মণ সমাজের সংরক্ষণের জন্য 'মেল-বন্ধন' প্রভৃতি কতকগুলি বিধানের আবশ্যকতা ছিল। পরে সেগুলি নিরর্থক হ'য়ে দাঁড়ায়। তবে সুখের বিষয়, কৌলীন্যের আর কৌলীন্যের সঙ্গে-সঙ্গে বহুবিবাহের বর্বরতা বেশি দিন ধ'রে সমাজের হানি ক'রতে পারে নি। পূর্বপুরুষের পাণ্ডিত্য আর অন্যবিধ মর্য্যাদার দরুন তাঁদের প্রাপ্ত কৌলীন্যের সুযোগ নিয়ে, লোকের অন্ধ শ্রদ্ধার অযোগ্য পাত্র হ'য়ে, কুলীন ঘরের ব্রাহ্মণেরা, অকুলীন এবং সেইজন্য সামাজিক সম্মানে নিম্ন অন্য ব্রাহ্মণদের চোখে সর্বোচ্চ ব'লে গণ্য হ'তেন, অকুলীন ব্রাহ্মণেরা কুলীন পাত্রে কন্যা দান ক'রে নিজেদের ধন্য ব'লে মনে ক'রতেন। সেইজন্য, যথাসাধ্য অর্থ দান ক'রে, ভূসম্পত্তি দান ক'রে, কুলীন বরে কন্যা দান করার দিকে অকুলীন কন্যার পিতাদের মনে একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষা দেখা দিত। ধনী অকুলীন ঘরের মেয়েকে বিবাহ করাটাকে কুলীন ঘরের যুবক ও প্রৌঢ়েরাও যেন অর্থকর একটা ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু তার একটা অসুবিধা ছিল—কুলীন ব্রাহ্মণ বর অকুলীন ঘরের মেয়ে বিয়ে ক'রলেই, তাঁর কৌলীন্য তাঁকে খোয়াতে হ'ত—তিনি কৌলীন্যের মর্য্যাদা হারাতেন, 'কুলীন' থেকে তিনি 'বংশজ' পর্য্যায়ে অবনীত হ'তেন। কিন্তু এই বংশজ হবার সঙ্গে-সঙ্গে, তিনি অকুলীন পিতাদের কুলীন জামাইয়ের শ্বশুর হবার জন্য আগ্রহের সুযোগ নিয়ে, একের পর এক ক'রে অনেকগুলি ক'রে বিয়ে ক'রে যেতেন। সমাজের মধ্যে এমনই যুক্তিহীনতা এসে গিয়েছিল যে এই বর্বর প্রথাকে সাধারণতঃ কেউ ঘৃণ্য মনে ক'রত না।

৩।২।৭৬

আমার প্রপিতামহ ভৈরবচন্দ্র চাটুর্জ্যে মহাশয় এইরূপ কুলীন ছিলেন। পূর্ববঙ্গে তাঁর প্রথম নিবাস ছিল, শুনেছি ফরিদপুরের পাংশা গ্রামে। সেন-

রাজাদের আমল পর্য্যন্ত 'পঙ্গাবাস' নামে এই গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের এক প্রাচীন স্থান এই গ্রামটি। ইনি কৌলীন্যের বেসাতি করবার জন্য, কুলীন ব্রাহ্মণ এই বংশগৌরবটুকু সম্বল ক'রে, কালী-গঙ্গার দেশ অর্থাৎ ভাগীরথী নদী ও কালীঘাটের দেশে, আঁড়িয়াদহ বা এঁড়েদা গ্রামে, বড়ো নদী বা পশ্চিম বাঙলার দামোদরের পারের দেশ খানাকুল-কৃষ্ণনগর অঞ্চলে, রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগর গ্রামের কাছে সিংটি-শিবপুর সোনাগাছি গ্রামে, আর অন্যত্র শ্বশুরদের আশ্রয়ে আস্তানা স্থাপন করেন। মহাকুলীন ভৈরব চাটুর্জ্যে মহাশয় ভাগীরথী-তীরে এসে কুল ভাঙলেন। অকুলীনের মেয়ে বিয়ে ক'রে আর নিকষ কুলীন রইলেন না, 'ভঙ্গ' হ'লেন, 'বংশজ' হ'লেন। খালি মন্ত্র প'ড়ে বিয়ে করা ছাড়া তাঁর আর কোনও দায়িত্ব ছিল না। আমার পিতামহ ভূমিষ্ঠ হন, সিংটি-শিবপুর সোনাগাছি গাঁয়ে তাঁর মাতুলালয়ে —উত্তরকালে 'দেশ' ব'লতে ছেলে বয়সে আমরা দামোদর-তীরের এই সিংটি-শিবপুর সোনাগাছিকেই বুঝ্‌তুম। আমার পিতামহ ৮৯ কি ৯০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। কাজেই তাঁর জন্মের তারিখ ছিল খ্রীষ্টীয় ১৮১৬ কি ১৮১৭ সাল, আর সেই হিসাবে প্রপিতামহ মহাশয় এ অঞ্চলে আসেন সম্ভবতঃ ১৮১৬ সালের বছর কয়েক আগে। কৃতকর্মা ব্যক্তি, বিরাট্ কৌলীন্য-মর্য্যাদা, তাঁর পায়ে কন্যা সমর্পণ করবার জন্য, অসহায় কন্যার জীবনের সুখশান্তির বিনিময়ে পুণ্য বা অক্ষয় স্বর্গাকাঙ্ক্ষায় সমাজের নেতা অকুলীন ব্রাহ্মণ দেবতারা লালায়িত হ'তেন, আর তাঁদের অনুগৃহীত করবার জন্য, 'দরাজ হাতে' কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে, 'বাঙাল দেশ' থেকে আগত এই মহাকুলীন তাঁদের শ্বশুর-মর্য্যাদা দিতেন। এই ধরনের বহুবিবাহ-বিশারদ ভঙ্গ-কুলীনের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ বিষয়ে বইয়ে তাঁর সময়ে আর তার কিছু পূর্ব্বে যতগুলি এইরূপ বিবাহ-বিশারদের নাম পেয়ে-ছিলেন, তাঁদের একটা তালিকা প্রকাশ ক'রে দেন। আমার প্রপিতামহ কতগুলি বিবাহ ক'রেছিলেন, তা ঠিকমতো জানি না। তবে আমার পিতামহের মৃত্যুর পরে তাঁর শ্রাদ্ধে, আমার পিতা, বিশেষ ক'রে নিয়মভঙ্গ আর জ্ঞাতি-ভোজনের জন্য অনেক খুঁজে, পিতামহ মহাশয়ের মাত্র ৪।৫ জন বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সন্ধান পান ও তাঁদের নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু এ বিষয়ে ঠাকুমার কাছে কিছুটা বোধ হয় পাকা খবর পাই। আমরা তখন ৮।১০ বছর বয়সের ছেলে।

ঠাকুর্দা আর ঠাকুমা, বুড়ো বুড়ী দুজনে শেষ জীবন কাটাচ্ছেন, বাবা মা দেবতার আদরে তাঁদের রেখেছেন, আমরা নাতি-নাতনীরাও তাঁদের দুজনের স্নেহে মানুষ হ'চ্ছি। এঁদের দুজনের মধ্যে কখনও-কখনও একটু মতানৈক্যের জন্য ঝগড়ার মতন হ'ত—কথা-কাটাকাটি—অত্যন্ত লঘু ব্যাপার, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দাম্পত্য কলহ—খুদে-খুদে নাতি-নাতনীদের কাছে তা ছিল বিশেষ উপভোগ্য। একদিন শুনছি, ঠাকুমা কী কারণে চ'টে গিয়ে ঠাকুদ্দাকে গঞ্জনা দিচ্ছেন, তাঁর নিজের জোরদার খাঁটি বাঙলায়—"তোমাদের গুণপনার কথা আর ব'লো না—তোমরা যে 'ষাঠের বংশ'—তোমরা খালি মন্তর প'ড়ে বিয়ে ক'রতেই জানো—মাগ-ছেলের তত্ত্ব নেওয়া, তাদের দেখা-শুনো করা, ভাত-কাপড় দেওয়া—এসব তো তোমাদের কুষ্ঠিতে লেখে না।" আমরা বিপুল আগ্রহের সঙ্গে ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—"হ্যাঁ ঠাকুমা, 'ষাঠের বংশ' ব'ললে, ওটা কী?" তিনি উত্তর দিলেন, "তা জানিস না বুঝি? ওই যে তোদের ঠাকুদ্দা, ওঁর বাবা, আমার শ্বশুর ছিলেন যিনি, তিনি মহাকুলীন ছিলেন, তিনি ষাটটা বিয়ে ক'রেছিলেন। সব শ্বশুরবাড়ির নাম ঠিকানাও তাঁর মনে থাকত না, তাই একখানি খাতায় ক'রে লিখে রাখতেন। ষাটটি বিয়ে ব'লে তাঁর নাম হ'য়েছিল 'ষাট ফৈরব।'" শ্বশুরের, স্বামীর নাম সে যুগে মেয়েরা উচ্চারণ ক'রলে তাঁদের মহাপাপ হ'ত, তাই তাঁরা 'হরি'-কে 'ফরি', 'কালী'-কে 'ফালী', 'ভৈরব'-কে 'ফৈরব' ব'লতেন—আদ্য অক্ষরের জায়গায় 'ফ' বসিয়ে ব'ললে পরে পাপ হ'ত না। আমরা ঠাকুদ্দাকে জিজ্ঞেস ক'রলুম—"এ কী কথা শুনছি ঠাকুদ্দা? তোমার বাবা এই রকম ছিলেন?" ঠাকুদ্দা জবাব দিলেন—কিন্তু মনে হ'ল তাঁর জবাব তিনি তেমন জোর ক'রে দিতে পারছেন না—"না রে না, তোদের ঠাকুমার ওসব কথা শুনিস কেন?" আমরাও মজা পেয়ে ছাড়লুম না—"তবে ঠাকুদ্দা, তোমার বাবার কটা বিয়ে ছিল? ষাট না হ'লেও অনেকগুলো তো বটেই।" ঠাকুদ্দা ব'ললেন, "এই কত হবে? গোটা আষ্টেক দশ হয়তো হবে।" পরে এ বিষয়ে আমি একটু গবেষণাও ক'রেছিলুম—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ-বিষয়ক বইখানিতে তাঁর সংকলিত তালিকা দেখেছিলুম—বিয়ের সংখ্যা ধ'রে তিনি লিষ্টি ক'রে দিয়েছেন—হুগলী জেলার বসো গ্রামের ভোলানাথ বাঁড়ুজ্জে এই বহুবিবাহবিশারদ কুলীনদের অগ্রগণ্য ছিলেন তাঁর নিজের খোঁজখবর মতন—তিনি মাত্র ৮০টি কন্যার স্বামী থাকতেও বৈধব্য ঘটিয়ে, তাঁদের পিতাঠাকুরদের

স্বর্গবাসের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন।* তারপরে সংখ্যা ৭২, ৬২, ৫৬, ৫৫ এই ধরনে ক'মতে ক'মতে ৫ পর্য্যন্ত এঁদের নাম যা পেয়েছিলেন তা দিয়ে দেন।[৬] এই তালিকায় আমার পূজ্যপাদ প্রপিতামহের নাম পাই নি। হয়তো তাঁর খবর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে পৌছয় নি। অথবা তিনি সত্যি সত্যিই দশের উপরে ওঠেন নি—ঠাকুদ্দার অনুমান-ই ঠিক। এই সমস্ত কুলীন-পত্নীদের দুর্দশার কথা লিখ্‌বো না। বিনা দোষে, এক মূর্খ নিষ্ঠুর কুসংস্কারের ফলে, বহুপত্নীক উপার্জনাক্ষম যোগ্যতাবিহীন নিকম্মা এক পুরুষের গলায় তাদের ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত—যৌবনকালে পিতামাতার অবর্তমানে তাদের সম্মানের আশ্রয় অনেক সময়ে মিলত না। কেউ কেউ বিপথগামীও হ'ত, তাদের সংখ্যাও নগণ্য ছিল না—বাপ মা বা অভিভাবক অনেক স্থলে একটু হৃদয়বান্ হ'লে, বহু চেষ্টা ক'রে মিথ্যা আচার ক'রে মাতামহ-গৃহে জাত এই-সব বিজাতক কুলীন পুত্রদের গ্রহণ ক'রতেন, গোলমাল হ'তে দিতেন না, সমাজে তারা চ'লে যেত, বাপের কুলমর্য্যাদার আবরণের মধ্যে।† তবে এরূপ ব্যাপার সমাজের মানুষের চোখ এড়ায় নি। 'কুলীন-পুত্র' শব্দটি অজ্ঞাতপিতৃক, 'বেজম্মা' বা বেশ্যাপুত্রের অর্থে ভদ্রসমাজের রসজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত হ'য়েছিল। একজন যাত্রা-দলের মালিককে তাঁর দলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি ব'লেছিলেন—"পৌরাণিক কথার পালা লিখে দেন একজন অধ্যাপক পণ্ডিত, তিনি গানও বেঁধে দেন। বেহালা বাজান একটি জাত-বোষ্টম। ঢোলক বাজান একটি কায়স্থ সন্তান। পাঠ ব'লে ব'লে যান একটি ব্রাহ্মণ সন্তান। যারা গান গায়, যুড়ীর দল, দোহার, আর যারা নাটক করে, সব জাতের লোক আছে তাদের মধ্যে—বামুন, বদ্দি, কায়েত, তাঁতি, গন্ধবেণে। আর যে ৪।৫টা ছোঁড়াকে রাখতে হয়, রাজপুত্তুর সেজে যারা গানের আসর জমায়, সেগুলি সব 'কুলীন-পুত্র'।"

ঠাকুমার মুখে শুনেছি, তাঁর এক সৎ শাশুড়ী, আমার প্রপিতামহ ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যতমা পত্নী, নিরাশ্রয় হ'য়ে সপত্নী-পুত্র আমার ঠাকুদ্দার আশ্রয় নেন, ঠাকুদ্দা ঠাকুমা তাঁকে আপন মায়ের মতো যত্ন ক'রে ঘরে

* "স্বামী থাকতেও বৈধব্য ঘটিয়ে"—অর্থাৎ, এঁদের স্বামী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও, এঁরা স্বামীর সঙ্গ লাভে বঞ্চিত হ'য়ে, পিতৃগৃহে কার্য্যতঃ বিধবার মতোই জীবন কাটাতেন।—অ।

† এরকম ঘটনার কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' বইতেও আছে।—অ।

ঠাঁই দেন—কিন্তু তিনি নানা সংস্কারের ভারে জড়িত, তাঁর সমস্ত দাবি ঠাকুমাকে সইতে হ'ত। ঠাকুমার মুখে শুনেছি, "তোর ঠাকুদ্দার এক সৎমা এলেন, তাঁর আর কেউ নেই—তাঁর পরিচর্য্যা সেবা যত্ন আমাকেই ক'রতে হ'ত, তাঁর বায়নাও ছিল খুব—আমাদের হেঁসেলে ছোঁয়াছুঁইর বাইরে তাঁর জন্য রান্নাবান্না ক'রে দিতে হ'ত। পরিবারের শিলনোড়ায় তাঁর বাটনা বাটা হ'ত না—তাঁর বাটনা বেটে দিতে হ'ত ঠাকুরঘরের চন্দনপীড়িতে। এতেও তাঁর মন পাওয়া যেত না, খুঁৎ খুঁৎ ক'রতেন। শেষে দর্পহারী নারায়ণ তাঁর দর্প টুকু খেলেন—তিনি পিছলে প'ড়ে গিয়ে কোমর ভেঙে ব'সলেন, ন'ড়তে চ'ড়তে পারেন না, বিছানায় শুয়ে সব কিছু—বাহ্য পেচ্ছাপ নাওয়া-খাওয়া—সব আমাকেই করাতে হ'ত—মায়ের মতন তো, ফেলা যায় না। অনেক ভুগলেন, আমাদেরও ভোগালেন, তবে নিষ্কৃতি দিলেন।"

এই তো হ'চ্ছে কুলের ইতিহাস। কিন্তু এই কুসংস্কার গোঁড়ামি অজ্ঞতা নিষ্ঠুরতার মধ্যেও যে আদর্শনিষ্ঠা স্বার্থত্যাগ ভালোবাসা দয়ামায়া মানবিকতা দেখেছি—বিশেষ ক'রে সমাজের এই নিপীড়িতা মেয়েদের মধ্যে, তা মনে ক'রলে বুক ভ'রে ওঠে, চোখের জল বাধা মানে না—সব দোষ সত্ত্বেও আমার এই আধুনিক সর্বদোষের আকর হিন্দুসমাজকে এইরূপ দু পাঁচ দেবী-প্রকৃতির নারীর জন্মক্ষেত্র আর কর্মক্ষেত্র ব'লে, হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে এই সমাজকে ভালো না বেসে পারি না। যত কিছু মন্দ জিনিস এর মধ্যে নিহিত আছে তা জেনেও, আমার ঠাকুমা, আমার মা, আমার অন্য অন্য বহু আত্মীয়াদের মতন পুণ্যচরিত মেয়েদের দেখে, একটা আনন্দময় গর্বসুখে কৃতজ্ঞতায় মন ভ'রে যায়। যাঁদের এ সৌভাগ্য হ'য়েছে, তাঁরা নিজেদের সমাজের শত অপরাধ উপেক্ষা ক'রে, সমাজের এই সর্বত্যাগী স্নেহময়ীদের কথা ভেবে এই সমাজকে ভালো না বেসে পারেন না—বাইরের থেকে শত জোর হাওয়া এলেও, সহস্র মানসিক আত্মিক সাংস্কৃতিক টান এলেও, শেষটায় এই সমাজকে আঁকড়ে থাকতেই ভালো লাগে। মনে হয়, এ যুগের বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, প্রভাত মুখুজ্যে, রমেশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, সকলের মধ্যে ঘর আর বা'র দুটোরই সঙ্গে যাঁদের পরিচয়, তাঁদের সকলের সম্বন্ধেই একথা বলা যায়।

ঘরের কথা, আশপাশের কথা, যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ হ'য়ে উঠেছি,

তার কথা এইবার একটু বলা যাক। সব জাতের মানুষই মানুষ ব'লে সমান, বামুন ব'লে বিশেষ ক'রে অব্রাহ্মণ কেউ যদি আমাদের একটু খাতির ক'রতে চাইত বা সম্মান দেখাত,—হিন্দু সমাজ থেকে বামনাইয়ের কদর এখন উচিত-ভাবেই বিদায় নিচ্ছে, কারণ ব্রাহ্মণের যে-সব গুণের জন্য আগেকার কালে লোকে তাঁদের মান্য ক'রত, যুগধর্মের প্রভাবে সে-সব গুণ এখন লোপ পাচ্ছে, লোকের অন্ধবিশ্বাসে বামুনের মধ্যে জন্মগত অধিকারের জন্য সে-সব গুণ কিছুটা অন্ততঃ সুপ্ত থাকত ব'লে এই খাতিরটুকু হ'ত,—আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগ্‌ত না। যেমন বাস্তবিকই একদিন একটা মানসিক আঘাত পেয়েছিলুম—একটা যাত্রার আসরে ঠাসাঠাসি, ভীড়ের মধ্যে ব'সে যাত্রা শুন্‌ছি, এমন সময়ে আচম্‌কা আমার পাশে বসা একটি আধবুড়ো ব্যক্তির পা-টা আমার গায়ে লাগে, তাকে দেখে মনে হ'ল কারিগর শ্রেণীর মানুষ, সে তো চ'ম্‌কে গিয়ে আমায় ব'লে উঠ্‌ল, "খোকাবাবু, তোমরা বামুন?" আমি "হাঁ" বলায় সে তখনি উঠে, বয়স্ক লোক, আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রলে, আর ব'লে উঠ্‌ল, "খোকা, আমি মহাপাপী, তোমরা বেরাম্মন, তোমার গায়ে পা লাগ্‌ল, আমার পাপ হ'ল, বাবা তুমি আমায় ক্ষমা করো।" আমার মনে খুব আশ্চর্য্য ভাব এল, তবে সবটা বুঝলুম না, আর বামুন ব'লেই এই প্রণাম পায়ের ধুলো নেওয়া, পাপ মনে করা, কী রকম যেন লাগ্‌ল।

আবার ওদিকে, গোঁড়ামির বশবর্তী না হ'য়ে, সহজভাবে ঠাকুদ্দা ঠাকুমা ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে ব'লেই যে সদাচার শেখাতেন, সেটাও ভালো লাগ্‌ত। আমি যে ব্রাহ্মণ, দুদিন পরে আমার পৈতে হবে, তখন আমায় কতকগুলি নিয়ম মেনে চ'লতে হবে, আর-সব ঘরের ছেলের মতো নয়, কতকগুলি বিষয়ে আমায় আত্মদমন ক'রে চ'লতে হবে, এ বোধটাও একটু আনন্দ দিত। নিশ্চয়ই তার সঙ্গে একটু আত্মপ্রসাদ আত্মতৃপ্তি আর অজ্ঞাতসারে দম্ভভাবও ছিল। যেমন ঠাকুদ্দা ব'লতেন, "হিঁদুর ঘরে জ'ন্মেছ, ব্রাহ্মণ ব'লে সকলে মান্য করে, তার যোগ্য হওয়া চাই। সকালে উঠে বাসিমুখে খাবে না—মুখ ধুয়ে দাঁত মেজে তবে খাবার কথা চিন্তা ক'রবে। ভাত খাবার সময়ে ভাতের সঙ্গে দাল তরকারি যখন মাখ্‌বে, পরিষ্কারভাবে তা ক'রবে, হাতের চেটো কব্‌জি পর্য্যন্ত ভাত-তরকারি মাখিয়ে নোংরা ক'রবে না, চুন-সুরকির তাগাড় মাখার মতো—আঙুলের দুটি পাবের উপরে যেন ভাত-তরকারি মাখামাখি না হয়। আল-

গোছা জল খেতে শেখো। খাটন-মালা হ'য়ে ব'সে খাবে।" ঠাকুমা ব'লতেন —"এঁটো ক'রে গেলাস থেকে জল খেলে, গেলাসটা ধুলে না? বামুনের ঘরে জ'ন্মেছ কেন—সে কথা মনে থাকে না?"

৪।২।৭৬

পূর্বপুরুষদের ইতিহাসে গৌরবের অনেক কিছু আছে। তার বেশিটা হ'চ্ছে বিদ্যা নিয়ে, তাঁদের অনেকের চারিত্রিক বল নিয়ে, তাঁদের সহজ দয়ামায়া আর মানুষের কল্যাণচিন্তা নিয়ে। আমাদের ঘরের কান্যকুব্ জাগত দক্ষ থেকে আমি পর্যন্ত এই আটাশ পুরুষের যাঁদের নাম পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে বেশ পণ্ডিত ছিলেন ক'জন, তা তাঁদের নাম থেকে বোঝা যায়। যেমন এঁদের মধ্যে দ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন সুলোচন, যিনি রাজার কাছে গ্রাম পেয়ে 'চাটুজ্জে' গাঁইয়ের আদিপুরুষ হন। সপ্তম পুরুষ ছিলেন অধ্বর্যু শ্রীকর—বৈদিক যজ্ঞ ক'রে তাঁর এই সম্মানীয় উপাধি। দশম পুরুষে অবসথী সর্বেশ্বর—বাড়িতে টোল ক'রে বিনা ব্যয়ে ছাত্র পড়াতেন—তিনি হুগলী জেলায় দেশমুখা গাঁয়ে বাস করেন। এগারো পুরুষে অবসথী তেকড়ি। পনেরো পুরুষের ছিলেন পরাশর, তাঁর ছোটো ভাই জগন্নাথের বংশে পরে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সপ্তদশ পুরুষে অবসথী রবিকর চাটুর্জ্যা, ইনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সর্বানন্দী-মেলের বা বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁর পুত্র বিষ্ণু শিকদার বরিশালের ঝালোকাঠি পরগনায় মুসলমান সুলতান সরকারে চাকরি নেন। বিষ্ণু শিকদারের তিন কৃতবিদ্য পুত্র ছিলেন—তাঁদের মধ্যে যাদব সার্বভৌমের বংশের আমরা। পঁচিশ পুরুষে প্রপিতামহ ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালদেশ ছেড়ে ভাগীরথী-তীরে আসেন, কুলীন থেকে ভঙ্গ হন। পিতামহ (২৬ পুরুষ) ঈশ্বরচন্দ্র, জীবৎকাল আনুমানিক ১৮১৬ থেকে ১৯০৬—ইনিই ক'লকাতায় বসবাস করেন। বাহির সিমুলিয়া চালতাবাগান পল্লীতে সুকিয়াস্ স্ট্রীটে ভদ্রাসন বাটী তৈরি ক'রে থিতু হন।

৭।২।৭৬

ঠাকুদ্দার জীবনের ইতিহাস ঠিকমতো জানি না। শুনেছি, তিনি ফারসি আর ইংরিজি পড়েন, তারপরে ক'লকাতায় কোনও ইংরেজ ব্যবসায়ী কোম্পানির

'হৌসে' বা আপিসে কেরানির কাজ নেন। এই রকম একটা কোনও হৌসের চাকরি নিয়ে পশ্চিম অঞ্চলে কয়েক বৎসর কাটিয়ে আসেন, কোথায়, কোন্ সময়ে তা জানতে পারি নি। মিউটিনির সময়ে নাকি পশ্চিমেই ছিলেন। তার পরে ক'লকাতায় ফিরে এসে আবার এক সাহেব কোম্পানির আপিসে ঢোকেন। সিংটি-শিবপুর সোনাগাছিতেই তাঁর জন্ম হয়, সেখানেই বিয়ে হয়। ঠাকুমা যাতুমণি দেবীর বাবা কার্ত্তিকচন্দ্র বাঁড়ুজ্জে ঐ অঞ্চলে সংগতিসম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। ঠাকুদ্দা ক'লকাতায় এসে কিছুকাল স্থকিয়াস্ স্ট্রীট (এখনকার 'কৈলাস বসু স্ট্রীট') আর আমহার্স্ট স্ট্রীট (এখনকার 'রাজা রামমোহন সরণি')-এর সংযোগস্থলে, স্থকিয়াস্ স্ট্রীটের উপরে যে শিবমন্দির আছে (মহেশ ঘোষ বা ময়শা গয়লার মন্দির নামে পরিচিত*), তার পূবে রমাপ্রসাদ রায়ের লেনে বাস করেন, শুনেছি সেই বাসায় বাবা জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরে ঠিক কোন্ সময়ে জানি না, তখন বাবা কিছুটা বড়ো হ'য়েছেন, ঠাকুদ্দা বা'র সিমলে চালতাবাগান পাড়ায় আড়াই কাঠা জমি কিনে তাঁর আপনার বসতবাটী ভিটের পত্তন করেন। আড়াই কাঠা জমিতে দুখানি কাদার গাঁথুনি ইটের ঘর, মায় পাকা ছাত, এই দুখানি ঘরের সামনে একটু লম্বা দালান, তার গ'ড়েন খোলার চাল, আর তার সামনে আর একখানি ছোটো পাকা ঘর, আর একটি খোলার চালের ঘর—আর তা ছাড়া ইটের দেয়াল খোলার চালের ছাত আর একখানি ছোটো 'বাইরের ঘর'ও তৈরি সদর দরজার পাশে। বাড়ির মধ্যে বেশ একটু জায়গা খালি ছিল, সেখানে পেয়ারা করবী প্রভৃতি দু চারটে গাছ ছিল, একটা খোলার চালের গোয়াল-ঘরও ছিল। এই নিয়ে এই বাড়ির পত্তন, যেখানে আমি আমার জীবনের ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত ৪৩ বৎসর কাটাই। পরে এই বাড়ির সবটাই পাকা হয়, দোতলা হয়। এখনও আমার মনে অনেকটা অস্পষ্টভাবে হ'লেও এই বাড়ির ছবি মুছে যায় নি। এ-সব ছাড়া, আরও একটা জিনিস বা'র বাড়ির খালি জায়গাটুকুতে ছিল, সেটাও বেশ মনে প'ড়ছে —চারটে শক্ত কাঠের পায়া বা খোঁটার উপরে দুটো মোটা কাঠের বার— 'প্যারালেল বার', সবুজ রঙ করা—বাবা ছেলেবেলায় এই বারে ব্যায়াম ক'রতেন, আমরাও পরে ক'রেছি। এর একটু ছোটো ইতিহাস আছে, পরে ব'লছি। †

* দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট', "শৈশব-স্মৃতি"।—অ।

† সে "ছোটো ইতিহাস" আর বলা হয় নি।—অ।

১৮৬০ সালের দিকের কথা, এখন থেকে একশ' বছরের আগেকার সময়, আমি তো জ্ঞান হওয়ার সময় থেকে এই বাড়িই দেখে এসেছি, এর মধ্যে মানুষ হ'য়েছি। সে-সব দিন-কাল, আবহাওয়া সবই আলাদা ছিল। বিলিতি সওদাগরি আপিসে কেরানির কাজ ক'রে ১০০ টাকারও কম মাইনে পেয়ে, বাড়িটুকুন ক'রে এই একশ' বছর আগে সংসার চালাতেন। বাড়িতে আমার ঠাকুমা, একমাত্র ছেলে আমার বাবা, ৪।৫টা মেয়ে, এঁরা আমার পিসি, এঁদের নিয়েই সংসার। মাঝে মাঝে 'দেশ' থেকে আত্মীয়-সমাগম হ'ত, এঁদের থাকবার ব্যবস্থা হ'ত বাইরের ঘরে। বড়ো পিসি ক্ষেত্রমণি দেবীকে দেখি নি—বেলঘরের যোগীন্দ্রনাথ বাঁড়ুজ্জে ছিলেন আমার বড়ো পিসেমশাই, এঁদের ছেলেদের—উপেনদা, ফণীদা, জ্ঞানদা—এঁদের ছেলেবেলা থেকেই বেশ জানতুম—এঁরা আমাদের ভালোবাসতেন—খালি ফণীদার মৃত্যু হ'য়েছিল খুব কম বয়সেই, ফণীদার বিয়ে হ'য়েছিল ক'লকাতায় কম্বুলেটোলায়, সেই বউদির স্নেহ আমরা কিছু কালের জন্য আমাদের মায়ের মৃত্যুর পরে আমাদের বাড়িতে পেয়েছিলুম।

৮।২।৭৬

উপেনদা বাবার চেয়ে ৪।৫ বছরের ছোটো ছিলেন, কিন্তু তিনি বাবার বন্ধুর মতোই ছিলেন, তিনি পরে, তখনকার দিনের ক'লকাতার বিখ্যাত হোটেল-ওয়ালা আর বিলিতি খাদ্যদ্রব্যের দোকানি G. F. Kellner কোম্পানির, যাদের উত্তর-ভারতের সমস্ত রেলগাড়ির আর রেলস্টেশনের রেস্তোরাঁ চালাবার একচেটে কারবার ছিল, তাদের ক'লকাতার প্রধান আপিসের বড়োবাবু হ'য়েছিলেন। স্বগ্রামের অনেকগুলি ভদ্রসন্তানের চাকরি ক'রে দিয়েছিলেন, আর আদর্শ পিতৃভক্ত পুত্র ছিলেন। কতকগুলি ছেলেপুলে রেখে আমার পিসিমার মৃত্যুর পরে, পিসেমশাই, তাঁর পিতাঠাকুর, আবার বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানদের উপেনদাদা আপন মায়ের পেটের ভাইয়ের মতন দেখতেন। উপেনদাকে ছেলেবেলা থেকেই আমরা অশেষ শ্রদ্ধা ক'রতুম, সমাজের মধ্যে আমরা সকলে তাঁকে আদর্শ পুত্র ব'লেই মনে ক'রতুম। কম বয়সেই আমাদের বৌদি মারা যান, উপেনদা আর বিয়ে করেন নি, কিন্তু ভাইয়েদের আর অন্য আত্মীয়দের অনুচিত ব্যবহারে, আর দুই ছেলের মধ্যে

অবনিবনা ও একটি নাতির মানসিক বিকারে ও অসুখ-বিসুখে নানা দুঃখ পান, চুপ ক'রে মুখ বুজে সব সহ্য করেন—পরের জন্য নিজের সুখ-দুঃখ বিসর্জন-দেওয়া এমন মানুষ পাওয়া যায় না। আমার মেজোপিসিমা ক্ষান্তমণি দেবীর বিয়ে হ'য়েছিল এক ডাক্তারের সঙ্গে, কিন্তু তিনি কম বয়সেই যক্ষ্মার রোগী দেখ্‌তে গিয়ে তাঁর ছোঁয়াচে ঐ মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, আর তাঁর দুই ছেলে সুরেনদা আর ভূতোদা, মেয়ে সুশীলা দিদি, সুরেনদার ছেলে অনাথ, সুশীলা দিদির দুই সন্তান মেয়ে কাজল আর ছেলে পটল—এই দুই পুরুষের এত-গুলি প্রাণী ঐ কালরোগের কবলে পড়ে। এদের মধ্যে ভুতোদাকেই বেশ মনে পড়ে—সুন্দর চেহারা, ডাগর চোখ, ভূতোদা আমাদের বাড়িতে, মেজোপিসিমা যে পাকা ঘরটি তৈরি ক'রে দেন, সেই ঘরে থাকতেন, ছোটো মামাতো ভাই আমি তাঁর খুব নেওটো ছিলুম—আমায় তাঁর বইয়ের ছবি দেখাতেন। অতি শিশুকালের এটি একটি আনন্দের স্মৃতি। কিন্তু একে একে পতিপুত্রকন্যাহীন হ'য়ে পিসিমার প্রকৃতি বিষিয়ে ওঠে। তিনি ভয়ানক ঝগড়াটে আর কুঁদুলে হ'য়ে ওঠেন। দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী মেয়ে ছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর স্মৃতি এই যে, যার উপরে তাঁর রাগ হ'ত চীৎকার ক'রে আঙুল ম'ট্‌কে ম'ট্‌কে তার মৃত্যু কামনা ক'রে গালি দিতেন। তাঁর আপন ভাই, আমার বাবা, তাঁর প্রতি ত্যক্ত-বিরক্ত হ'য়ে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ ক'রে দেন, এমন কি প্রতিজ্ঞা ক'রে তাঁর পয়সায় তৈরি ঘরখানির ভিতরে কখনো যেতেন না। কয়েক বছর আমাদের বাড়িতে থেকে তিনি জোর ক'রে বাড়িঘর বাপ-মাকে ছেড়ে কাশী-বাস ক'রতে গেলেন। তিনি ব'লতেন—"কারো তোয়াক্কা রাখি না—কাশী গিয়ে বিশ্বনাথের দরজায় মাথা গোঁজ্‌বার একটা ঠাঁই ক'রে নেবো, একখানা সতরঞ্চি মুড়ে তার আধখানার উপর শোবো আর আধখানায় শীত নিবারণ ক'রবো।" ঠাকুদ্দা তাঁকে এভাবে ছেড়ে দেন নি, কাশীতে নিয়ে গিয়ে একটা বড়ো বাসায় একটি কামরা ভাড়া ক'রে রেখে আসেন, আর মাসে মাসে তাঁকে ছটি ক'রে টাকা পাঠাতেন (তখন ঠাকুদ্দা বেকার, বয়স হ'য়েছে, সে টাকা বাবাই তাঁর স্বল্প বেতন থেকে দিতেন)—শস্তাগণ্ডার দিনে তখন ঐ টাকাতেই চ'লত—আট আনা কি বারো আনা ঘর ভাড়া, বাকি পাঁচ টাকায় একজন ভদ্র ব্রাহ্মণঘরের বিধবার চ'লে যেত।

১১।২।৭৬

তখন টাকা দেড়েক ছিল চা'লের মণ, গম আরও শস্তা, দু-তিন পয়সার শাকসব্জিতে একজনের চ'লে যেত, দু পয়সায় ছোটো এক ভাঁড় মালাই। পরে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে, পিসিমার মাসহারাও বাবা বাড়িয়ে দেন, বোধ হয় দশ টাকা হয় শেষে—আর পিসিমার আগ্রহে বাবা কাশীর বাঙ্গালীটোলার গলির মধ্যে ছোট্ট আধ-কাঠার মতন জমিতে দেড়খানি ঘরওয়ালা একটুকরো দোতলা পাথরের বাড়ি কেনেন, ১৩০০ টাকার ভিতরে, তাতেই পিসিমা পরে বাস ক'রতেন। সেই বাড়িতেই তাঁর কাশী-লাভ হয়। আমার ষোলো বছর বয়সে—তখন আমি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিই নি—আমি একবার কাশী যাই। রেলের থার্ড ক্লাস ভাড়া বোধ হয় তখন ৩ টাকার মধ্যে ছিল। কাশী তখন অদ্ভুত সুন্দর লেগেছিল, আর পিসিমা তখন ভাইপোকে পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পান—দিন পনেরো কুড়ি ছিলুম—কাশীর সমস্ত ঘাট মন্দির দ্রষ্টব্য স্থান নৌকো ক'রে কাশীর রাজার বাড়ি ব্যাসকাশী সব কিছু খুঁটিয়ে দেখান। পিসিমাকেও কোন্ শিশুকালে দেখেছিলুম—আবার দেখলুম—তিনি তখন খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির হ'য়েছেন। পরে আবার ক'লকাতায় এসেছিলেন, আমাদের বাড়িতে ছিলেন, ঠাকুমা তখন প্রায় মৃত্যুশয্যায়*, ঠাকুদ্দা দেহত্যাগ ক'রেছেন—আমার বিবাহও হ'য়ে গিয়েছে[৭], ১৯১৪ সালের পরে। অন্য আত্মীয়স্বজনকে বরদাস্ত ক'রতে পারতেন না।

আমার ছোটো পিসিমা বিনোদিনী দেবী বাবার চেয়ে বেশি বড়ো ছিলেন না। ছোটো পিসেমশাই দুর্গাপদ ঘোষাল সেকালের রুড়কীর পাস-করা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন—সরকারি কাজ ক'রতেন, কোম্পানির রাজ্যে বড়ো ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, জীবনের বেশির ভাগ পশ্চিমে পাঞ্জাবে আর উত্তর প্রদেশে কাটান, আসামে গৌহাটিতে আর অন্যত্রও ছিলেন। শেষ বয়সে অবসর গ্রহণ ক'রে ক'লকাতায় ৯৬নং গড়পার রোডে বাড়ি ক'রে বাস করেন। সেখান থেকেই তাঁর চার ছেলে পড়াশুনো ক'রে মানুষ হন—আমার চার পিসতুতো ভাই—দেবেন্দ্রনাথ (ইনি ডাক্তারি পাস ক'রে উত্তরকালে জীবনের বেশির ভাগ ব্রিটিশ মালায়াতেই কাটিয়ে দেন), মহেন্দ্রনাথ (কেমিস্ট্রিতে এম-এ পাস ক'রে

* সুনীতিকুমারের পিতামহী যাদুমণি দেবী ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর "প্রায় ৯২ বছর বয়সে" দেহরক্ষা করেন।—অ।

মজফ্‌ফরপুরে ওকালতি করেন), ভূপেন্দ্রনাথ (শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কৃষি-বিষয়ে পাস ক'রে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন), আর উপেন্দ্রনাথ (ইতিহাসে এম-এ পাস ক'রে বাঙলা সরকারের শিক্ষাবিভাগে অধ্যাপকের কাজ করেন, ক'লকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বহু বৎসর অধ্যাপনা করেন, ঐ কলেজে ওঁর ছাত্র আমি ছিলুম—প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ কতকগুলি ভালো বইও তিনি লেখেন*)। ছোটো পিসিমার তিন মেয়ে ছিল নগেন্দ্রবালা, বীরেন্দ্রবালা, সুরেন্দ্রবালা—আমার বাল্যস্মৃতির অনেকখানি আমার মামার বাড়িতে মাসুতো ভাইবোনদের সঙ্গে এই পিসুতো ভাইবোনেরাও জুড়ে ছিল।

জীবন-কথা পত্তন করবার সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুদ্দা ঠাকুমা বাবা আর মা'র সম্বন্ধেও কিছু বলি। এঁরা সকলেই মধ্যবিত্ত (কতকটা নিম্ন-মধ্যবিত্ত) বাঙালী ভদ্র পরিবারের মানুষ ছিলেন, এই মধ্যবিত্ত সমাজের আবেষ্টনীর মধ্যেই তাঁদের জীবনচর্য্যা সীমায়িত ছিল। এই সমাজের দোষ গুণ মহত্তা ক্ষুদ্রতা সবই তাঁদের ছিল। কিন্তু তা ছাড়া, জ্ঞান হওয়া থেকে যা দেখে এসেছি, তাঁদের মধ্যে কতকগুলি অসাধারণ সহজ সদ্‌গুণও ছিল, সেগুলির জন্য তাঁদের সাধনা ক'রতে হয় নি—আর সেই-সব গুণের জন্য তাঁদের বার বার অসংখ্য প্রণাম করি। আমার মধ্যে যদি কিছু ভালো বা প্রশংসার যোগ্য থাকে, মানসিক নৈতিক দিক থেকে, সে সমস্ত তাঁদেরই কৃপায় আর তাঁদের নির্বাক্ শিক্ষায় আর দৃষ্টান্তেই পেয়েছি। ঠাকুরদাদা মশাই দীর্ঘকায়, প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি, গৌরাঙ্গ, বেশ সুপুরুষ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছেলেবেলায় ফারসি প'ড়েছিলেন, সংস্কৃতও কিছু জান্‌তেন, আর ইংরিজির classics কিছু কিছু প'ড়তেন—যেমন Oliver Goldsmith-এর গদ্য আর পদ্য রচনা, Shakspere-এর রচনা, ইংরিজিতে Arabian Nights, বিজ্ঞান আর ইতিহাসের ছোটো ছোটো বই ; এ-সব বইয়ের একটি ছোটো সংগ্রহ তাঁর হাতে বাড়িতে গ'ড়ে উঠেছিল, ছেলেবেলায় তা দেখেছি। আর বাঙলা সাহিত্যেও তাঁর প্রীতি ছিল—নিয়মিতভাবে তিনি 'জন্মভূমি' পত্রিকা নিতেন। বঙ্গবাসীর সংস্করণ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের বাঙলা অনুবাদ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারত, কিছু কিছু অন্য পুরাণের অনুবাদ, আর অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সংস্করণে কবিকঙ্কণ চণ্ডী আর বৈষ্ণব পদাবলী, আর তা ছাড়া নববিধান সমাজের গিরিশচন্দ্র সেনের

* এঁর জীবৎকাল ১৮৮৬-১৯৬৯।—অ।

বাঙলা 'তাপসমালা' (তজকিরাৎ অল্-আউলিয়া)—এই রকম কতকগুলি বই তাঁর ছিল। তিনি পশ্চিমে কবে কোথায় ছিলেন, কী কাজ ক'রতেন জানি না। স্পষ্টভাষী লোক ছিলেন, আর রেগে গেলে চোস্ত হিন্দুস্থানী গালিগালাজ ক'রতেন, বকতেন। ক'লকাতায় Ewing কোম্পানির হাউসে কেরানির কাজ ক'রতেন, পরে চোখে ছানি পড়ে, সে কাজ ছেড়ে দেন। আমাদের শিশুকালে তিনি আমাদের পড়া ব'লে দিতেন, ইংরিজি পড়াতেন, আর ব'লতেন—"খুব চেঁচিয়ে ইংরিজির 'মতন' প'ড়বি।" 'মতন' শব্দটির মানে কী বহু দিন ধ'রে জানতুম না, তাঁকে জিজ্ঞাসাও করি নি—পরে যখন কলেজে প'ড়তে প'ড়তে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় রস পেলুম, তখন জানলুম যে 'মতন' মানে 'মূল পাঠ—text'। আর বহু সংস্কৃত নীতিশ্লোক তিনি মুখে মুখে আমাদের শিখিয়েছিলেন।

ঠাকুমার কাছে ঠাকুদ্দার চোখে ছানি পড়ার, আর দেশী গাঁয়ের ছানি কাটার বৈদ্য 'মাল'-জাতীয় লোকের হাতে চিকিৎসা আর শেষে অস্ত্র ক'রে সেই ছানি কাটার বর্ণনা শুনি। এটি বোধ হয় ১৮৬৮।১৮৭০-এর কথা।

১৩।২।৭৬

চোখে ছানি হওয়ায় তিনি অকর্মণ্য হ'য়ে যান, আপিসের চাকরিও ছাড়তে বাধ্য হন, বেকার অবস্থায় চরম দুরবস্থায় পড়েন। যা সঞ্চয় ছিল, তা থেকে চিকিৎসা করান। মালবৈদ্যরা আসুরিকভাবে চিকিৎসা ক'রত। 'নস্তর্' অর্থাৎ অস্ত্র করবার সময়ে রোগীকে অচৈতন্য করবার বালাই তখন ছিল না, আর local anaesthesia, অর্থাৎ দেহের যেখানে অস্ত্র করার ছুরি বা শলা চ'লবে, ওষুধ দিয়ে সে জায়গাটা অসাড় করার উপায় তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। পাড়াগেঁয়ে মালবদ্দি এলেন, তাঁর পারিশ্রমিক ঠিক হ'ল, কয় গণ্ডা টাকা, আর রোগী অস্ত্র করার পরে দেখতে পেলে ধুতি চাদর। ষণ্ডা জোয়ান চেহারার লোক, একটা সেকেলে ক্যাম্বিসের ব্যাগে তাঁর যন্ত্রপাতি আর ওষুধপত্র জড়ি-বুটি, আর দুজন সহকর্মী, এঁরাই যেন আজকালকার anaesthetic assistant, রোগীকে ক্লোরোফর্ম করবার মতন কাজ এঁরা ক'রবেন। বেশ বলবান্ দুই বাগ্দি জোয়ান। রোগী তো অস্ত্র করবার আগে ভীষণ আতঙ্কিত হন। হবারই কথা। তাঁকে আগের দিন খুব হাল্কা কিছু খাওয়ানো হয়। অস্ত্রের সময় ঐ দুই ষণ্ডামার্কা সহকর্মী রোগীকে বিছানায় শুইয়ে তাঁর হাত-পা এমনভাবে ধ'রে

রইল যে তাঁর নড়বার চড়বার শক্তি রইল না। আর শল্য-চিকিৎসক মাল মহাশয় রোগীর মাথা কোলে নিয়ে, দুই হাঁটু দিয়ে এমন ক'রে চেপে ধ'রলেন যে, তিনি একেবারে অসাড় হ'য়েই রইলেন, যেন বড়ো সাঁড়াশি দিয়ে তাঁর মাথাটা চেপে ধরা হ'য়েছে। সেই অবস্থায়, একটা নরুনের মতন ছুঁচালো-মুখ লোহার শলা দিয়ে, বাঁ হাতে রোগীর থুতনি কামারের লোহার যন্ত্র vice (বাইসের) মতন জোরে ধ'রে, 'মোতিয়া বিন্দ্' অর্থাৎ চোখের তারায় ফুটিয়ে দিয়ে নাড়া দিলেন। এই হ'ল operation বা অস্ত্রোপচার। ছানি অর্থাৎ চোখের উপরে যে একটা আবরণ পড়ে, এইভাবে নাড়া খেয়ে প'ড়ে যেত। ছুঁচ ফোটাবার সময়ে ভীষণ যন্ত্রণা পেয়েও রোগী দাঁতে দাঁত চেপে থাকত। প্রাণ গেলেও মাথা নাড়াত না—মাথা নাড়ালেই ছানি ছিঁড়ে ছড়িয়ে প'ড়বে আর চোখের দৃষ্টিশক্তিও চিরতরে চ'লে যাবে এই মারাত্মক আশঙ্কায়। রোগী অসহ্য যন্ত্রণায় কোনও রকমে চুপ ক'রে আছে, চোখ থেকে রক্তপাত হ'চ্ছে,—তখন প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মাল মহাশয়, কতকগুলি তাঁদের ওষুধের গাছের পাতা বেটে রেখেছিলেন, সেগুলি চোখের উপরে কলাপাতা দিয়ে প্রলেপের মতো ক'রে লাগিয়ে দিলেন, তার পরে বেশ শক্ত অথচ আলগা ক'রে কাপড়ের পটি বেঁধে দিলেন চোখের মাথার কপালের উপরে। হুকুম হ'ল, তিন দিন মাথা এক্কেবারে যাতে না নড়ে, রোগী যেন কথা না বলে, আর যেন হাঁচি দমন ক'রে থাকে। তিন দিন পরে মাল মহাশয় এসে চোখের পটি খুলে দিলেন, তার পরে চোখের সামনে নিজের আঙুল তুলে ধ'রে নাড়তে লাগলেন, রোগী কিছু দেখতে পাচ্ছে কি না। কিছু দৃষ্টিগোচর হ'লে, বোঝা গেল যে অস্ত্র করা সার্থক হ'য়েছে। তার দু-চার দিন পরে, চোখের ফুটোর ঘা শুখোলে, মুসলমান চশমাওয়ালার দোকানে গিয়ে, এ চশমা সে চশমা দেখিয়ে, যাতে প'ড়তে পারা যায় আর লোক চেনা যায়, এমন মোটা পরকলার কাচের চশমা কেনা।

এইভাবে ঠাকুদ্দা তাঁর ছানি-পড়া চোখ ফিরে পান।

১৭।২।৭৬

পড়বার সময়ে চোখে চশমা প'রতেন, মাঝখানটা খুব মোটা কাচের পরকলা। আর সেই সময় থেকেই তিনি এক কবিরাজি ওষুধ ধ'রলেন, কপালে মালিষ ক'রতেন, মহাদশমূল তেল। সবুজ রঙের চট্‌চটে তেল, একটা দুর্গন্ধ

মতো—প্রায় সব সময়েই কপালে ঘ'ষতেন। চোখ ফিরে পাওয়ার বহু দিন পরে, আমি যখন ৭।৮ বছরের হ'য়েছি, তখনও ঠাকুদ্দার আগ্রহ ছিল, সংসার চ'লছে স্বল্প মাইনের অ্যাপ্রেন্টিস্ কেরানি আমার বাবার রোজগারের উপরে,—ঠাকুদ্দাও সেই বুড়ো বয়সে বাবার সাহায্য করবার জন্য নোতুন ক'রে মাঝে মাঝে কেরানি-গিরি চাকরির চেষ্টায় দরখাস্ত দিতেন। তাঁর নিজের টানা-হাতে তাঁর লেখা দরখাস্ত দেখেছি—ইংরেজ হাউসওয়ালাদের কর্তার কাছে লেখা মামুলি গৎ—Being given to understand that you require some clerical hands in your office, I beg to offer myself as a candidate for one of these posts. As regards my qualifications, I have the honour to state that I have a good knowledge of general clerical work, including accounting, and I have a neat hand for writing English (তখনকার দিনে টাইপ-রাইটার ছিল না, হাতের লেখাতেই চিঠিপত্র নকল হ'ত—নকল-নবীশ কেরানির চাহিদা ছিল). Should you be pleased in your kindness to think me suitable for the post, I shall be in duty bound to try my very best to give you all satisfaction in my work. I have the honour to be, Sir, your most obedient servant. এই ছিল বাঁধা গৎ, এবং ইস্কুলের ছেলেদের হাতের লেখায় এটা কস্ত করাবার জন্য শেখানো হ'ত। ঠাকুদ্দা তাঁর নামের ইংরিজি বানান এই রকম লিখতেন, Issur Chundra Chatterjee—দুটি ss টানা লম্বা অক্ষরে এমনভাবে লিখতেন, সে যুগের হাতের লেখার কায়দা মতো—যেন ſſ-এর মতো দেখাত। ঠাকুদ্দা বাবার কাছে লুকিয়ে এই সব দরখাস্ত নিয়ে তাঁর চেনাশুনো বন্ধুদের আপিসে মাঝে মাঝে ব্যর্থ ঘোরাঘুরি ক'রতেন। বাবা জানতে পেরে রাগ ক'রে দুঃখু ক'রে ঠাকুদ্দার কাছে অভিমানের সঙ্গে অনুযোগ ক'রে, এমন কি কতকটা যেন ধ'মকে অনর্থ ক'রতেন।

৬।৩।৭৬

একদিনের কথা মনে আছে—বাবা ব'লছেন, "আমি তো বেঁচে র'য়েছি এখনো, তুমি এই বুড়ো বয়সে ছানি-কাটা চোখ নিয়ে এ-আপিস সে-

আপিস ক'রে ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে চাকরির জন্য হা-পিত্যেশ ক'রে—আমি তো মরি নি, দিনান্তে একমুঠোর সংস্থান ক'রে যদি আনতে পারি, তা হ'লে তোমায় আধমুঠো দিয়ে তবে আমরা খাবার কথা ভাব্‌বো—আমি থাক্‌তে তুমি যদি চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াও, তাতে তুমি আমার কত অকল্যাণ করো তা বুঝ্‌তে পারো না।" ঠাকুর্দা এই-সব কথা শুনে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে প'ড়তেন, একটু হাঁ-না ক'রতেন—শেষে চাকরির চেষ্টায় ঘোরা একেবারেই ছেড়ে দিলেন।

বাবা জন্মগ্রহণ করেন ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৯ সাল, ইংরিজি ১৮৬২ সালে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ইংরিজি ১৮৬১, স্বামী বিবেকানন্দের ইংরিজি ১৮৬৩ সালে। সুতরাং বাবা এই দুই মহাপুরুষের কাছাকাছি সময়ের লোক ছিলেন। এঁদের মধ্যে স্বামীজীকে ছেলেবেলায় তিনি জানতেন, কতকটা এক পাড়াতেই বাস ছিল—একথা পরে ব'লছি।* রবীন্দ্রনাথকে তিনি একটু বড়ো বয়সে দূর থেকে দেখেছিলেন, কিন্তু কখনও আলাপ পরিচয় হ'তে পারে নি। বাবার জন্ম হ'য়েছিল বোধ হয় রমাপ্রসাদ রায় লেনের ভাড়াবাড়িতে, তবে ছেলেবেলা আর সারা জীবন তাঁর কাটে সুকিয়াস্ স্ট্রীটের লাগোয়া উত্তর দিকে একটা সরু গলিতে ঠাকুদ্দার তৈরি ছোটো বাড়িটিতে—আমাদের সত্যকার পৈতৃক ভিটেয়। প্রথমটায় এই বাড়ির নম্বর ছিল ৬৪ নম্বর সুকিয়াস্ স্ট্রীট, এই বাড়ির পিছনের খিড়কি দরজাটাই তখন ছিল সদর দরজা। পরে যখন বাড়িখানির পশ্চিম দিকে সুকিয়াস্ স্ট্রীট থেকে একটি সরু গলি বেরুলো, সেই গলির নাম হ'ল 'নন্দকুমার চৌধুরীর সেকেণ্ড লেন'। বাড়ির নোতুন নম্বর দাঁড়ালো '৩ নম্বর নন্দকুমার চৌধুরীর সেকেণ্ড লেন'। বিরাট্ নাম—ভাগ্যিস্ তখনকার দিনে টেলিগ্রামের রেওয়াজ অতটা ছিল না। পরে শেষটায় আবার নাম আর নম্বর পাল্‌টে গিয়ে এখন দাঁড়িয়েছে ৩ নম্বর সুকিয়াস্ রো! এই আড়াই কাঠার বাড়ি এখনও চাটুজ্যে পরিবারের হাতছাড়া হয় নি—এই বাড়ি আমার দাদা অনাদিকৃষ্ণের একমাত্র পুত্র অনিলকৃষ্ণের অধিকারে আছে।† অনিলের দুই মেয়েদেরই বর্তাবে।

তখন এই অঞ্চলটা—আমার ছেলে বয়স পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯১০ পর্যন্ত, বেশ

* এই লেখাতে "একথা পরে" আর বলা হয় নি, তবে অন্যত্র ইতিপূর্বে এ প্রসঙ্গে কিছু ব'লেছেন (দ্রষ্টব্য টীকা ৮)—অ।

† সুনীতিকুমারের অগ্রজ অনাদিকৃষ্ণের মৃত্যু হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে।—অ।

পাড়াগাঁয়ের মতনই ছিল। এখানে ওখানে সেখানে ডোবা বা ছোটো পুখুর, মাঠ, না'রকল আর অন্য গাছ, গোলপাতায় ছাওয়া ঘর, ক্বচিৎ দু'চারখানা খাপরা বা টালির বাড়ি, আর এদিকে ওদিকে দুই একখানা ছোটো একতলা পাকা বাড়ি। রাস্তায় লোহার থামের উপরে কাচে ঢাকা চৌকো লণ্ঠন, তাতে সবে গ্যাসের পাইপ লাগিয়ে গ্যাস-ল্যাম্পের ব্যবস্থা হ'য়েছে আমাদের শিশু-কালে, কেরাসিন তেলের কাচের ল্যাম্পের বদলে। সন্ধ্যেবেলায় মিউনিসি-পালিটির ল্যাম্পওয়ালারা একটা ক'রে মই ঘাড়ে ক'রে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে সব লোহার থামের কাঁধের দুই লম্বা হাতের উপরে মই লাগিয়ে হাতের জ্বলন্ত ল্যাম্প থেকে গ্যাসের কলের মুখ খুলে ল্যাম্প জালিয়ে দিয়ে যেত—সন্ধ্যেবেলায় এটা শহরের শোভার নিত্য পরিচর্য্যা ছিল। সেই সময়েই প্রায় সব গৃহস্থ গৃহে ও ঠাকুরঘরে আর তুলসীতলায় সন্ধ্যাদীপ জালাতেন, জলছড়া দিতেন, আর শাঁখ বাজাতেন গৃহিণীরা আর বধূরা। গ্যাসের ল্যাম্প থেকে ধোঁয়া বেরুতো প্রচুর, আর পরে এই টিম্‌টিমে আলোকে ছাপিয়ে ক'লকাতার নৈশ অন্ধকার আরও গভীর দেখাতো। ইন্‌ক্যাণ্ডেসেণ্ট গ্যাসের আলো দুই একটা বড়ো রাস্তায় ক্রমে-ক্রমে আসছে, আর বোধ হয় হাওড়া থেকে শেয়ালদহ পর্য্যন্ত তখনকার দিনের হ্যারিসন রোডে রাস্তার মাঝখানকার বড়ো বড়ো আলোক-স্তম্ভের উপরে আমাদের কাছে তখনকার দিনের আশ্চর্য্য বস্তু বিজলীর বাতির উজ্জ্বল আলো প্রথম দেখা দেয়।

ক'লকাতা তখনও—অর্থাৎ ৭০।৮০ বছর আগে, প্রায় খাঁটি বাঙালীর শহরই ছিল। কেবল বড়োবাজার অঞ্চলে, তুলাপটি খেঙ্‌রাপটি চিৎপুর রোডে মারোয়াড়ীদের বাস বেশি ক'রে ছিল, আর কলুটোলা ক্যানিং স্ট্রীট মুর্গিহাটা টেরিটিবাজারে পশ্চিমা আর বোম্বাইয়া মুসলমান দোকানী কাপড়ওয়ালা, ওষুধওয়ালাদের পাড়া আর বসতি ছিল। আর চিৎপুর রোডে ক্যানিং স্ট্রীট থেকে টানা প্রায় ধর্মতলা পর্য্যন্ত ছিল ক'লকাতার আর ক'লকাতার পূর্বের গাঁ ট্যাংরায় উপনিবিষ্ট চীনা চামড়াওয়ালা আর জুতোওয়ালা মুচিদের সারি-সারি দোকান—তাদের সব অদ্ভুত অদ্ভুত চীনা নাম, A-Hoy, Choong Yee, A-That, Chao-Hing, Thoot-Sin, A-Sik-Im-Son, Fat-Lim, Hong-Yim, কাণ্টনী চীনা নাম, আর "খোদা-ঘর" বা মন্দির—এখনও তার কিছুটা অবশিষ্ট আছে। সাহেব-বাড়ির বা ইউরোপীয়ানদের দোকানের দামী বিলিতি জুতোর

চেয়ে এই সব চীনা-বাড়ির দোকানের [জুতোর] কদর বা চাহিদা কিছু কম ছিল না। এ ছাড়া, ধর্মতলা আর চাঁদনি অঞ্চলে ছিল মেটেবুরুজ অঞ্চলের বাঙালী মুসলমান দরজির কাটা কাপড় জামা পাৎলুনের সারি-সারি খোলার চালের একতলা দোকান, আর কোথাও বা (যেমন খিদিরপুরে কলিঙ্গ-বাজারে) বাঙলার বাইরের দক্ষিণী তেলুগু সেপাই আর খালাসীদের পুরাতন আড্ডা। গঙ্গার ঘাটগুলি ধীরে ধীরে উড়িয়া ব্রাহ্মণ ঘাটিয়ালদের দখলে আসছে। মোটের উপর শ্রমিক শ্রেণীর লোক অনেকটা বিহারী আর উড়িয়া হ'য়ে গেলেও, ক'লকাতা তখনও—৭০।৮০ বৎসর আগে পর্য্যন্ত, প্রধানতঃ বাঙালীদেরই স্থান ছিল। এই কারণে বোধ হয় তখন এই শহর সম্বন্ধে আমাদের খাস ক'লকাতিয়াদের মনে ক'লকাতার সম্বন্ধে একটা আত্মীয়তাবোধ, একটা ভালোবাসা মমতা ছিল। এখন যেমন নানা জাতের মানুষের চাপে বাঙালী—এমন কি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থী বাঙালীও—কোণঠাসা হ'য়ে হতভম্ব হ'য়ে প'ড়ছে, সে রকমটা হয় নি।

বাবার ছেলেবেলা, যৌবন, প্রৌঢ়কাল, বার্ধক্যের বেশির ভাগ, এই ক'লকাতায় কেটেছিল। তাঁর বাবার তৈরি এই বাড়ি তাঁর বাস্তুভিটে ব'লে প্রাণের চেয়ে প্রিয় ছিল, আর তিনি যা চেয়েছিলেন, এইখানেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস প'ড়েছিল [১৮ শ্রাবণ ১৩৫২/৩ আগস্ট ১৯৪৫]।

৮।৩।৭৬

সে সময়ে ছেলেদের লেখাপড়া শুরু হ'ত সেকেলে পাঠশালাতে।—আগে মাটির উপর দাগা বুলিয়ে, তার পরে কলাপাতার উপরে আর পরে লম্বা 'পাততাড়ি'র সরু লম্বা এক একখানি তালপাতার উপরে মোটা খাঁকের কলমে ঘরের তৈরি কালিতে বাঙলা লেখা শিখ্‌ত ছেলেরা। একটু বড়ো হ'লে লেখাতে বেশি উন্নতি হ'লে, শস্তা হ'ল্‌দে রঙের 'বালির কাগজে' বাঙলা আর ইংরিজি লেখা আরম্ভ হ'ত, হাতের লেখা 'পাকা' করবার জন্য ঐ কম দামের কাগজের খাতার পাতাগুলিতে ক্রমাগত লাইনের পর লাইন ধ'রে লেখা 'মক্‌শ' ক'রে খাতা ভরাতে হ'ত, শেষটা খাতাখানার প্রত্যেকটি পাতা মক্‌শ-করা লেখার নকশার চাপে অপরূপ হ'য়ে উঠ্‌ত, যখন আর পাতায় একটুখানিও খালি জায়গা থাক্‌ত না, তখন সেই খাতা পুরাতন কাগজ-পত্র বই খবরের কাগজ

শিশি-বোতল কেনা মুসলমান ফেরিওয়ালাদের (আজকালকার ক'লকাতিয়া ভাষায় যাদের 'বিক্রিওয়ালা' বলা হয়) কাছে সের দরে ৪/৫ পয়সা থেকে দু'চার আনা পর্যন্ত সেরে বিক্রি হ'ত।

১৩.৮।১৯৭৬

আমার জীবনে আমার হাতের লেখা শেখা সেকালের বাঙালী ঘরের ছেলের মতো সব পথ ধ'রেই চ'লেছিল। আমাদের পাড়ার স্থকিয়াস্ স্ট্রীট (এখনকার কালের 'কৈলাস বসু স্ট্রীট') আর আমহার্স্ট স্ট্রীট (এখনকার কালের 'রাজা রামমোহন সরণি')-র মিলন-স্থানের দু'খানা বাড়ি পশ্চিমে যে শিবের মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে, প্রতিষ্ঠাতার নাম ধ'রে যে মন্দিরকে ছেলেবেলায় আমরা 'মহেশ ঘোষের শিবালয়' বা 'ময়শা গয়লার শিবমন্দির' ব'লে জানতুম (এখন এ নামটা আশা করি বদলানো হয় নি), তার সামনেই এক গোলপাতার ঘরে পাঠশালায় প্রথম শিক্ষারম্ভ হয়। বয়স তখন পাঁচ বছর আন্দাজ হবে। আমার দাদা ঐ পাঠশালায় যেত, ঠিক হ'ল আমি বাড়িতে মিছামিছি সময় নষ্ট না ক'রে দাদার সঙ্গে পাঠশালায় যাবো। খুব উৎসাহ আর আনন্দ হ'ল মনে—কিন্তু কে একজন বিজ্ঞ বৃদ্ধ আত্মীয় তখন হেসে আমায় ব'লেছিলেন, এখন পাঠশালায় যাবে ব'লে এত ফুর্তি লাগ্‌ছে, দু'দিন পরেই পাঠশালায় যাবার নামে কাঁদ্‌বে। মা আমার জন্য একখানা পাঁচহাতি বিলিতি কলের ধুতি কিনে আনালেন, তখনকার কালে বাঙালী ঘরের ছেলের হাফ-প্যাণ্ট পরার রীতি আসে নি—দিগম্বর অবস্থার পরেই একেবারে পাঁচহাতি ধুতিতে প্রোমোশন হ'ত। বইটই তখন কিছু হ'ল না। খালি একটা ছোটো মাদুরের আসন এল, পেতে বসবার জন্য। দাদার সঙ্গে পাঠশালায় প্রথম দিন গেলুম, সঙ্গে যথারীতি বাড়ির ঝী ছিল। পাঠশালা ব'লতে খালি গুরুমশাইয়ের থাক্‌বার দু'খানা গোলপাতা-ছাওয়া ঘর, সামনে এক চিল্‌তে সরু গোলপাতা-ঢাকা দাওয়া বা বারান্দা, তারই এক দিকে তাঁর রান্নাঘর, বারান্দার খুঁটিতে দু'টো হুঁকো ঝুলছে, একটির গায়ে একটা কড়ি বাঁধা, সেই হুঁকো থেকে কেবল ব্রাহ্মণেরাই তামাক খাবেন। খালি গায়ে, তিনি দাওয়ায় একটি মাদুরের উপরে ব'সে আছেন। হাতে একগাছি সরু বেত। ঝী গিয়ে ব'ললে—গুরুমশাই, এই ছেলেটিকেও ভরতি ক'রে নিন্, এর দাদার সঙ্গে আজ থেকে রোজ সকালে আসবে,

মাইনে সিধে দেওয়া হবে। এই হ'ল সহজভাবে বিদ্যাস্থানে আমার প্রবেশ। বাইরে উঠানে রোদ্দুরের মধ্যে গুটি তিরিশ ছেলে নানা রকম কলরব ক'রতে ক'রতে প'ড়ছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়', "প্রথম ভাগ", "দ্বিতীয় ভাগ" আর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা', আর বড়ো ছেলেদের জন্য বটতলার ছাপা 'শিশুবোধক'। প্রত্যেক ছেলের আলাদা মাদুরের আসন, কারো তালপাতার পাততাড়ি, কারো বা বালির কাগজের খাতা। স্লেট্ ('সেলেট') নাই ব'ললেও হয়। গুরুমশাই ব্রাহ্মণ, আধাবয়সী, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, মাথায় টিকি। আমায় দেখে একবার বেশ ভালো ক'রে তাকালেন, তাতে আমার বড্ড ভয় হ'ল। ব'ললেন, "বেশ, এইবার থেকে রোজ দাদার সঙ্গে পাঠশালায় আস্‌বি, দাদার পাশে ব'স্‌বি, আর মন দিয়ে প'ড়বি, লিখ্‌বি। আর যদি পড়াতে অমনোযোগী হ'স, তা হ'লে, এই যে বেত দেখ্‌ছিস, এই বেত দিয়ে তোর হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় ক'র্‌বো।"—এই হ'ল শিক্ষায় আবাহন—সে যুগের 'কুমার-কানন' বা Kindergarten. একটু ভয় হ'ল—রোজ রোজ গুরুমশাই বেত মারবে না কি ?

যা হোক্, প্রথমটায় মাটিতে "দাগা বুলিয়ে" অর্থাৎ রামখড়ি দিয়ে গুরুমশাই "অ, আ, ক, খ" সব লিখে দিতেন, সেগুলি খড়ি দিয়ে বুলিয়ে, পরে তালপাতায় খাঁকের কলমে লিখে, মা সরস্বতীর সাধনা শুরু হ'ল। কলাপাতার উপরে লেখাটা পাঠশালায় করানো হয় নি, বাড়িতে মায়ের তত্ত্বাবধানে সপ্তাহ খানেক ধ'রে কলাপাতার পাঠ হয়। এইভাবে দাদার সঙ্গে এই পাঠশালাতেই হাতে-খড়ি—গুরুমশাই এক দিনও বেত মারেন নি। সকাল ৭৷৷-৮টায় পাঠশালা ব'স্‌ত, ঝীয়ের সঙ্গে আস্‌তুম, আবার বেলা ১১-১১৷৷টায় পাঠশালা শেষ হ'ত। শেষ হ'ত 'শট্‌কে বা শতকিয়া', 'কড়াকে বা কড়াকিয়া', 'বুড়্‌কে বা বুড়িকিয়া' আর 'নামতা' বা গুণন-সংখ্যা, এক থেকে ১০০ পর্যন্ত সব ছেলে মিলে সুর ক'রে তারস্বরে পাঠ ক'রে—'নামতা' হ'ত বারো দশক পর্যন্ত মুখস্থ পাঠ ক'রে।

এইভাবে পাঠশালায় লেখাপড়ার সূত্রপাত। পরে ঐ পাড়াতেই, তখনকার দিনের ৬৩নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে, Calcutta Academy ব'লে একটি এণ্ট্রান্স ইস্কুলে দু বছরের জন্য ভরতি হ'লুম। ইংরিজি মতে Infant Class-এ, বাঙলা 'প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ' আর 'শিশুশিক্ষা' আবার ভালো

ক'রে ধরানো হ'ল, আর সঙ্গে-সঙ্গে প্যারীচরণ সরকারের ইংরিজি First Book of Reading—বোধ হয় অর্ধশতক ধ'রে এই বই বাঙালী ছেলেদের ইংরিজি পাঠ আরম্ভ ক'রতে সাহায্য ক'রে এসেছিল। যেমন ১০০ বছরের বেশি ধ'রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাঙলা 'প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ' আর "সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা" আর সংস্কৃত "ঋজুপাঠ" তিন ভাগ এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের প্রধানতম সাধন হ'য়েছিল।

Calcutta Academy-তে যখন ভরতি হই, আমার ৭।৮ বছর বয়সে, তখন বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য আর পরমেশ্বর ভট্টাচার্য্য ব'লে দুই ভাই ঐ ইস্কুলটি চালাতেন। দু'জনেই বেশ রাশভারী মাষ্টার ছিলেন। ইস্কুলটি পরে ৬৩ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে উঠে গিয়ে ওঁদেরই একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়—ঐ আমহার্স্ট স্ট্রীটেই একটি বাড়িতে যুগলকিশোর দাসের গলির সামনে। উত্তরকালে যখন কলেজে অধ্যাপনা ক'রতে থাকি, একটু নাম-ডাকও হয়, তখন এঁরা এঁদের ইস্কুলের Infant Class-এর এক নগণ্য ছাত্রকে স্মরণ ক'রে ইস্কুলের পারিতোষিক বিতরণ সভায় আহ্বান ক'রে যথেষ্ট হৃদ্যতার পরিচয় দেন। বোধ হয় ইস্কুলটি এখনও টিঁকে আছে।

এর পরে [১৮৯৮ সালে] ক'লকাতায় প্লেগের মড়ক দেখা দিলে, প্রাণের ভয়ে আমরা আমার পিতামহের তৈরি ৬৪ নং সুকিয়াস্ স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে শিবপুরে আমার দিদিমা আর মামাদের আশ্রয়ে গিয়ে এক বছর কাটাই—ঐ বছরটা আমাদের পক্ষে পরম আনন্দে কাটে, কারণ শিবপুরে কোনও ইস্কুলে এক বছরের জন্য ভরতি হওয়া হয়ে ওঠে নি। তবে মামারা সংগতিপন্ন ঘরের ছিলেন, তাঁদেরই একখানি বাড়িতে আমরা ছিলুম, প্রায় সমান বয়সের মাস্তুতো ভাই কতকগুলিকে পাই, পল্লীজীবনের একটা স্বাদ বেশ ভালোভাবেই পেয়েছিলুম—ক'লকাতার ছেলে ব'লে যেটার অভাব ছিল। এখনকার মতন তখন হাওড়া শহর এক অতি জনাকীর্ণ উপনগরে চেহারা বদলায় নি—শিবপুর ঠিক পল্লীগ্রামই ছিল।

১৪।৮।১৯৭৬

একটি পুরো বছর পরম আনন্দে শিবপুর গ্রাম যেন "চ'ষে" বেড়াতুম। প্রচুর খালি জায়গা—মাঠ, বাগান, গাছ-পালা, ছোটো বড়ো পুখুর, রাস্তায়

কেরোসিন-তেলের ল্যাম্প অতি বিরল ল্যাম্প-পোষ্টের উপরে জ্ব'লত। দু পাঁচ-খানা থার্ড ক্লাস ভাড়াটে, হাড্ডিসার দুই টাট্টুতে টান্‌ত। আমার মাতামহ টারনার মরিসন কোম্পানির আপিসের মুচ্ছুদ্দি বা বড়োবাবু ছিলেন, 'দেশে' অর্থাৎ সিংটি-শিবপুর গ্রামে তাঁর জমিজমা ছিল—তাঁর নিজের গাড়ি আর দু-তিনটে ভালো ঘোড়া ছিল—বেশ মনে আছে, একটা ঘোড়া ছিল হ'ল্‌দে রঙের আর একটা সাদা—তাঁকে জীবনে আমার ৬/৭ বছর বয়সে বোধ হয় দুই একবার দেখেছি। ধব্‌ধবে সাদা চাপকান ধুতি, মাথায় সাদা কাপড়ের মুরেঠা পাগড়ি, এই প'রে তিনি আপিস যাবার জন্য গাড়িতে উঠ্‌ছেন। তাঁর পাঁচ মেয়ে—বড়ো বিজয়া, মেজো আমার মা কাত্যায়নী, সেজো অন্নপূর্ণা, ন' ত্রিগুণা, আর ছোটো মনোরমা। দুই ছেলে ছিল, আমার দুই মামা, বড়ো মন্মথনাথ, ছোটো প্রবোধনাথ (দাদামশায়ের মৃত্যুর পরে ছোটো মামার জন্ম হয়)। চার মেশোমশায়, সকলকেই দেখেছি, সকলেই অতি অমায়িক সজ্জন ছিলেন, আমাদের বেশ স্নেহ ক'রতেন—বড়ো মেসোমশাই বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি আদালতে চাকরি ক'রতেন, তিনি থাকৃতেন নোয়াখালিতে। সেজো মেসোমশাই নিরাপদ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন টারনার মরিসন কোম্পানির শালিমার রঙের কারখানার বড়োবাবু। ন' মেসোমশাই ফকীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিল্লীতে ভারত সরকারের কী দপ্তরে কাজ ক'রতেন—প্রতি বৎসর তাঁকে দিল্লী-শিমলা যাওয়া-আসা ক'রতে হ'ত—ধীরভাবে, খুব অভিজাত ধরনে কথাবার্তা ক'রতেন। আর ছোটো মেসোমশাই শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া জেলা আদালতের এক নামী উকিল ছিলেন—খুব উচ্চশিক্ষিত, সকলেই তাঁর কাছে যুক্তি পরামর্শ নিত। মামার বাড়িতে একটা কিছু হ'লেই পাঁচ বোনের মিলন হ'ত—আর সঙ্গে-সঙ্গে মহা আনন্দে আমরা প্রায় দু ডজন মাস্‌তো ভাই-বোন একত্র হ'তুম—সেটা ছিল ছেলেবেলার অতি কাম্য আনন্দ, বিশেষতঃ কোনও উৎসবের দিনে। মামার বাড়িতে দিদিমার যত্নে তাঁর দৌহিত্রদের মধ্যে "দীয়তাং ভুজ্যতাং" সারাক্ষণ চ'ল্‌ত—আর আমার ঘোড়া-ঘোড়া বাই ছিল, বড়ো মামার আস্তাবলে তিন চারটে ঘোড়া, সেখানে গিয়ে সহিসদের সঙ্গে ভাব জমাতুম, ঘোড়াগুলিকে দানা খাওয়াতে দেখ্‌তুম, সহিসদের আর কোচমানের উপর উৎপাত ক'রতুম।

এই মামার বাড়ির গুটিকয়েক স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে জল্ জল্ ক'রছে।

প্রথম তো দিদিমার কথা। অতি বুদ্ধিমতী "দশকর্মান্বিতা" মেয়ে ছিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁর জমিদারি আর অত বড়ো সংসার পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে, এমন কি দাপটের সঙ্গে তিনি চালাতেন। সব বিষয়ে তাঁর কথাই ছিল যেন শেষ কথা — অথচ জোর ক'রতেন না। তার পর, বাড়িতে দুচারজন পুরোনো চাকর ছিল, তাদেরও রোয়াব কম ছিল না। তারা ছিল দিদিমাদের গ্রামের জমির প্রজা। শিবপুরে এসে ঘরদোর সব তারা নিজের মতন ক'রে দেখ্‌ত। বাড়িতে ৬/৭টা গোরু ছিল—সব ঝী চাকররাই দেখ্‌ত, কিন্তু তদারক ক'রত বুড়ো চাকর কার্তিকচন্দ্র বা "কার্ত্তিকে"। আমাদের, বাড়ির ভাগ্নেদের, কি শাসনটাই সে না ক'রত—ছেঁড়া কাগজ, না'রকল মালা, না'রকল পাত, এসব দিয়ে বৈঠকখানা অপরিষ্কার ক'রছি দেখলেই সে হুংকার ছাড়্‌ত, আমাদের আত্মাপুরুষ যেন খাঁচা-ছাড়া হ'য়ে যেত—মামারা বয়সে ছেলেমানুষ ছিলেন, তাঁদেরও বাদ দিত না। বাড়িতে হিসেব টিসেব লেখবার জন্য, ফাই-ফরমাস খাটবার জন্য, দরকার হ'লে ছেলেমেয়েদের ক-খ-গ শেখাবার জন্য, একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাঁর নামটা ভুলে গিয়েছি, তাঁর কথাও মনে পড়ে। তবে তিনি হিসেবপত্র নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। আর ছিলেন "মানি-কাকা"। ইনি একটি অসাধারণ চরিত্রের খাঁটি মানুষ—সরল, পরোপকারী, ধার্মিক প্রকৃতির। এঁর কথা মনে হ'লেই এঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। এঁর সম্বন্ধে আমি বহু পূর্বে একটি নিবন্ধ লিখেছি, সেটা প'ড়ে অনেকেরই মনে এর প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জেগেছে।* দিদিমা তান্ত্রিক মতের ছিলেন, দেবীর উপাসনা ক'রতেন, দুর্গা কালী দশমহাবিদ্যা এঁদের সম্বন্ধে ভক্তি-সংগীত লিখ্‌তেন (তাঁর লেখা ছোটো একখানি দেবীপূজার গানের সংগ্রহ তিনি ছাপিয়ে বিতরণ ক'রেছিলেন)। তাঁর একজন দীক্ষাগুরু ছিলেন, কৌলিক মন্ত্রদাতা, তিনি বছরে দু-তিন বার ক'রে মামার বাড়ি শিষ্যা-গৃহে পদার্পণ করতেন—সে সময়ে আমরা থাকলে খুবই তাঁর উপস্থিতির সুযোগ নিতুম। দিদিমা নানা উপচারে গুরুদেবের আহারাদির সুন্দর এবং প্রচুর আয়োজন ক'রতেন, আর তা থেকে আমরাও বঞ্চিত হ'তুম না—ভালো গাওয়া ঘীয়ের লুচি, রকমারি শাক-সব্‌জি, ভালো মাছ কাত্‌লার মুড়ো, গল্‌দা চিংড়ি, দই, পায়স, ক্ষীর, ছানা, সন্দেশ, মিষ্টান্ন। দিদিমা সংকল্প ক'রে উপর-উপর চার বৎসর বাড়িতে কালীপূজো করেন। তখন আমার বয়স ১১।১২ হবে।

* দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট', "মানি-কাকা"। —অ।

মাস্তুতো ভায়েরাও ছিল, তারা তো হরদম পটকা একদমা দোদমা বোমা ফাটিয়ে বাড়ি কাঁপিয়ে তুল্‌ত, অন্য বাজিও পোড়াত। এই পূজোতে একটা জিনিসের অভিজ্ঞতা অর্জন করবার সুযোগ আমি পেয়েছিলুম। সেটা হ'চ্ছে প্রায় সারা রাত্রি ধ'রে কালীপূজোর অনুষ্ঠানটি পুরো দেখা। শুন্‌লুম, কালীপূজো, মায় পাঁঠাবলি হবে রাত্রে, রাত নটার পর থেকে সারারাত ধ'রে পূজো হবে, ভোরের দিকে বলিদান। এখনকার মতন উপযুক্ত বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান্‌ পণ্ডিত পুরোহিত তখন দুর্লভ হয় নি। ভালো পুরোহিত পাওয়া গিয়েছিল, দুজন তন্ত্রধারক তাঁকে সাহায্য কর্‌বার জন্য। আমরা মাত্র ৩।৪ জন দ্রষ্টা এবং শ্রোতা—তখন এই-সব পূজো পাঠের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস ছিল। যখন তান্ত্রিক মন্ত্রগুলি নানা বীজমন্ত্র "ঐং হ্রীং ক্লীং হসৌ ওঁ ফট্‌" প্রভৃতির সঙ্গে নিশুতি রাত্রে পাঠ হ'তে লাগ্‌ল, একটা রোমাঞ্চকর eerie feeling আমাকে কতকটা অভিভূত করে। মনে হ'ল, বামুনের ঘরের ছেলে, এই পূজো দেখ্‌বার সুযোগ আমার পক্ষে যেন মা-কালীর দান। পরে আমাকে তন্ত্রশাস্ত্র—মহানির্বাণ তন্ত্র, ষট্‌চক্রভেদ, প্রভৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে হয়, ইংরিজিতে এম-এ পাস কর্‌বার পরে—পিতৃবন্ধু প্রতিবেশী অটলবিহারী ঘোষ মহাশয় আর তন্ত্রানুসন্ধানী হাইকোর্টের জজ উড্‌রফ সাহেবের টানে*—তখন এই কালীপূজোর সঙ্গে পরিচয়ের অভিজ্ঞতাটুকু কার্য্যকর হ'য়েছিল।

মামার বাড়ি থেকে আর একটি বিষয়ে আমার মানসিক সংস্কৃতির একটু উৎকর্ষ লাভের সুযোগ পেয়েছিলুম—সেটা হ'চ্ছে আমাদের কালোয়াতি সংগীত ধ্রুপদ খেয়ালের সৌন্দর্য্যের দিকে একটা আকর্ষণ। আর তা থেকে উত্তরকালে স্বদেশের ও বিদেশের Classical Music উচ্চকোটির মার্গসংগীতের উদাত্ত মধুর-গম্ভীর বায়ুমণ্ডলের অনুভূতি আর সে সম্বন্ধে অব্যক্ত প্রীতি। মামাদের তখন যৌবনকাল, আমরাও ইস্কুলের ছাত্র সে সময়ে।

১৫ আগস্ট ১৯৭৬

দিদিমার অতন্দ্র দৃষ্টি, মামারা দুজনেই খুব শান্তশিষ্ট ছিলেন, বদ-সংসর্গে

---

* স্যর জন জর্জ উড্‌রফ তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চা করেন, 'আর্থার আভালন' ছদ্মনামে কতকগুলি গ্রন্থ সম্পাদন আর রচনা করেন। উড্‌রফ সাহেবের অনুরোধে সুনীতিকুমার তাঁর জন্যে তন্ত্রশাস্ত্রের কিছু কিছু মূল সংস্কৃত থেকে ইংরিজিতে অনুবাদ ক'রে দেন। —অ।

মিশে বদ-খেয়ালির চক্করে পড়েন নি। তখন শিবপুরে একটু অবস্থাপন্ন ঘরের তরুণদের মধ্যে গানবাজনার শখ আর চর্চা ছিল। মামাদেরও আকাঙ্ক্ষা ছিল ওস্তাদি বা কালোয়াতি গান শিখবেন। কোনও বড় ওস্তাদের শাগরেদ হ'য়ে যে নিয়মিত ধ্রুপদ খেয়ালের সাধনা আরম্ভ ক'রেছিলেন তা নয়, বাড়িতে প্রায়ই ওস্তাদি গানের মাইফেল বা মহফিল অর্থাৎ আসর ডাকতেন। শিবপুর হাওড়া কলকাতা আর আরও দূর জায়গা থেকে নামী গাইয়েদের পাখওয়াজীদের তবলচীদের আহ্বান ক'রে আনতেন, শনিবার দিন প্রায় সারা বিকাল আর রাত্রির প্রথম প্রহর ধ'রে গানের মজলিস চ'ল্‌ত। চায়ের প্রচলন তখন হয় নি, হরদম পান তামাক চ'ল্‌ত। আট দশখানা ঘোড়ার গাড়ি মামার বাড়ির পাশে জমা হ'ত, সহিস কোচুয়ানরা ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেদের মধ্যে জটলা ক'রত, পয়সাওয়ালা গানের শৌখীন মামার বন্ধুরা আসতেন। তখন শিবপুরে (কি হাওড়ায় ঠিক এখন স্মরণ নেই) নিকুঞ্জ দত্ত বা কানা নিকুন নামে এক বিখ্যাত ধ্রুপদী ছিলেন, তাঁকে প্রায়ই আনা হ'ত। পাখোয়াজ আর তানপুরার সংগতে ধ্রুপদ ছিল প্রধান চর্চার বিষয়, বাঁয়াতবলা আর তানপুরা, আর কালেভদ্রে বা সেতার নিয়ে খেয়াল, এও চ'ল্‌ত। এর নীচে এঁরা নামতেন না। হয়তো বা মেয়েদের অনুরোধে দয়া ক'রে কেউ বা একটা 'শ্যামাসংগীত', অথবা 'নিধুবাবুর টপ্‌পা' গাইলেন—এই যা, ব্যস্‌। বাড়ির ভাগ্নে আমরা অনেক সময়ে বড়োদের এই গানের মজলিসের এক কোণে জায়গা ক'রে নিতুম। আমি বুঝ্‌তুম না কিছু, কিন্তু ধ্রুপদের বিরাটত্ব কেন জানি না আমাকে অভিভূত ক'রে ফেল্‌ত। অন্য সব ধরনের গানের প্রকার চাল বা সুর—এমন কি বাঙলার চল্‌তি ঢপ কীর্তনও—কেমন যেন খেলো, যেন নিম্নশ্রেণীর মনে হ'ত। এই ভাবটা বরাবরই র'য়ে গিয়েছে। ভারতীয় সংগীতের প্রতি আমার এই যে টান মামার বাড়ির পরিবেশের কল্যাণে কী ক'রে মনে গেঁথে গেল, সে সম্বন্ধে পরে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি—সেটা ছাপা হ'য়েছে, দু-চারজনের ভালোও লেগেছে।[৯]

মামার বাড়ির সঙ্গে যোগের ফলে ছেলেবেলায় সমানবয়সী মাস্‌তো ভাইয়েদের সঙ্গে একটা সহজ বন্ধুত্ব হ'য়ে গেল। মামার বাড়িতে মা আর মাসিরা যেন এক পরিবারের লোক হ'য়ে পড়েন, এঁদের ছেলেপুলেরা একই পরিবারের মতো, সব ক'টি মাস্‌তো ভাই-বোন যেন ছিল এক মায়ের পেটের

ভাই-বোন—সকলকে একসঙ্গে ধ'রে নাম করা হ'ত। বড়ো মাসিমার ছেলেরা নিত্যরঞ্জন, সত্যরঞ্জন, চিত্তরঞ্জন, [জ্ঞানরঞ্জন], ঝী-চাকরদের কাছে আর অন্য মাস্‌তুতো ভাই-বোনদের কাছে ছিল বড়্‌দা, মেজ্‌দা, সেজ্‌দা, ন'দা ; আবার আমার দাদা অনাদি আর আমিও ছিলুম বাড়ির অন্যতর বড়্‌দা, মেজ্‌দা। সকালে এই একপাল ছেলেমেয়ে একসঙ্গে ব'সে জল খেতুম—রুটি বা পরটা, আলুভাজা, বেগুনভাজা, শাকভাজা, গুড়, একবাটি ক'রে দুধ। দুপুরে আমরা একসঙ্গে গোল হ'য়ে ব'স্‌তুম। মস্ত এক থালায় দা'ল, ভাত, ঝোল, চচ্চরি, টক, দুধ নিয়ে মাঝখানে ব'স্‌তেন দিদিমা, বা কোনও ঠানদিদি, বা মায়েরা কয় বোনের কেউ—তিনিই ভাত তরকারি মেখে প্রত্যেকের মুখে পর পর এক এক গ্রাস ('গরাস') ক'রে খাওয়াতেন। তখন সে বার প্রথম সিমেণ্টের মেঝে হ'ল মামার বাড়ির এক দালানে—কী চমৎকার লাগ্‌ত, মার্বল পাথর তখন কোথায় ? খুব ভালো ক'রে ধুয়ে মুছে দেওয়া হ'ত সে মেঝে, তারপরে সেই পরিষ্কার মেঝেতে ঢালা হ'ত এক ধামা গরম গরম মুড়ি, আর গোটা দশটা কি পনেরোটা কলা, আর খানিকটা গুড়, আর দু'চার হাতা দুধ, একজন কেউ এসে সেই সবটা চ'ট্‌কে একসঙ্গে মেখে দিতেন, আর তার চারদিকে ব'সে ছেলেমেয়ের দল তাতেই বিকালের জলখাবার সারতুম—এর উপর এক বাটি ক'রে দুধ ছিল। দুপুরে মায়েরা পাড়ার মেয়েরা গিন্নিবান্নিরা তাস খেল্‌ছেন, গল্প ক'রছেন—আর আমরা এদিকে দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্ছি। বড়ো বাড়ি, মায়েদের প্রত্যেকের জন্য ঘর ছিল, বাবা আর মেসোমশায়রা এলে সেই বাড়ির মধ্যেই যেন কতকগুলি পরিবারের বাস হ'ত। মামাদের বিয়ে হ'য়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে দুই ভাইয়ের দু'খানা বড়ো বড়ো ঘর তৈরি হ'ল—আর কতকগুলি দামী আসবাবপত্র আরশি, বড়ো বড়ো ছবি, এসব এসে বাড়ির সৌষ্ঠব বাড়ালে।

এই মামার বাড়িতেই দিদিমার আর মামাদের আগ্রহে আমার বড়ো মাসির ন' ছেলে জ্ঞানরঞ্জন আর আমার দুজনের পইতে একসঙ্গে দেওয়া হয়। জ্ঞান আর আমি এক বয়সের, বোধ হয় ২/৫ মাস বড়ো আমার চেয়ে। একটা পুরোনো কথা আছে—মাস্‌তুতো ভাইয়েদের মধ্যে হয় সহজ মৈত্রী, আর জেঠুতো খুড়ুতো ভাইদের মধ্যে সহজ বৈরি-ভাব—এদের মধ্যে বংশগত সম্পত্তির ভাগ-বখরার কথা আছে কিনা। জ্ঞান শিবপুরে থেকে হাওড়া জেলা ইস্কুল থেকে, আর আমি ক'লকাতায় মোতী শীলের ফ্রী ইস্কুল থেকে, একসঙ্গে

এণ্ট্রান্স পাস করি ১৯০৭ সালে। জ্ঞান সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই-এস-সী পাস ক'রে মেডিকেল কলেজে ঢোকে, ডাক্তার হ'য়ে বা'র হয়, "স্বদেশী আন্দোলনের ছেলে" ব'লে, পরে অনেক পোড় খেয়ে শেষটায় ব্রিটিশ আমলেই সরকারি ডাক্তার ডিস্ট্রিক্ট সিভিল সার্জন হয়। আর আমি জেনেরাল অ্যাসেম্ব্রিজ্ ইন্স্টিট্যুশন থেকে ইণ্টারমিডিয়েট ইন্ আর্টস, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি-এ আর এম্-এ পাস ক'রে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হই। এক-সঙ্গে আমাদের পইতে, নেড়া হওয়া কান-ফোঁড়া, রোদ্দুর দেখা থেকে আর শুদ্দুরের মুখ দেখা থেকে নিজেদের বাঁচানো, দণ্ডিঘরে থাকা, হবিষ্যি করা, গঙ্গায় গিয়ে দণ্ড ভাসানো—বড়োই কৌতুককর লেগেছিল।* খুব খেটে ঐ সময়ের মধ্যে দু'জনেই শ্যামাচরণ কবিরত্নের "আহ্নিককৃত্যম্" থেকে সন্ধ্যা-আহ্নিকের মন্ত্রগুলি মুখস্থ করি—মানে না বুঝে। তবে গায়ত্রীটার মানে মোটামুটি আয়ত্ত ক'রতে পেরেছিলুম, আর গায়ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল। মামার বাড়িতে তখন একটি ব্রাহ্মণ কর্মচারী ছিলেন, খাতাপত্র লিখতেন, তিনি আমাদের সন্ধ্যা করাতেন। মামার বাড়ির সামনে এক বাড়িতে আমাদের বয়সের একটি ছেলে ছিল, তার নাম ছিল জগৎপতি, তার সঙ্গে খুব ভাব হ'য়েছিল, তারও পইতে আমাদের বছরেই হয়; সে খুব নিষ্ঠাবান্ হ'য়ে ওঠে, সন্ধ্যার মন্ত্র আর গায়ত্রী খুব যত্ন ক'রে প'ড়ত—পরে শুনলুম হঠাৎ সে কয়দিনের মাত্র অসুখে মারা যায়, মৃত্যুর পূর্বে কয়দিন ধ'রে আর শেষ নিশ্বাস নেবার সময়েও সে আঙুলে পইতে জড়িয়ে গায়ত্রী জপ ক'রত। তার এই ভক্তি আমাকে খুবই অভিভূত ক'রেছিল।

আমার ইস্কুল পর্বটার সম্বন্ধে কিছু "স্মৃতিচারণ" ক'রবো এবার।

১৩।৮।৭৬

ক'লকাতায় প্লেগের মড়কের ভয়ে আমরা তো এক বছর শিবপুরে মামাদের আশ্রয়ে কাটালুম—মামাদের একখানা বাড়িতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। বাবা ক'লকাতায়, লালদীঘীর ধারে Writers' Buildings রাইটার্স বিল্ডিংসের পিছনে Lyons Range লায়ন্স্ রেঞ্জ সড়কে অবস্থিত ইংরেজ

* সুনীতিকুমারের এই মামাতো ভাই জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক বছর আগে দেহরক্ষা ক'রেছেন।—অ।

ব্যবসায়ীদের দপ্তরে Turner Morrison and Co. টার্নার মরিসন অ্যাণ্ড কোম্পানির আপিসে চাকরি ক'রতেন। তিনি শিবপুর আমাদের বাড়ি থেকে* হেঁটে গঙ্গার ঘাটে আস্‌তেন, সেখান থেকে পান্‌সি নৌকোয় চ'ড়ে নদী পেরিয়ে হাইকোর্ট-এর সামনে চাঁদপাল ঘাটে নাম্‌তেন, তারপরে বাকি পথটুকু আপিস পর্য্যন্ত হেঁটে যেতেন। তখন গঙ্গা-পারানির এই-সব পান্‌সি নৌকো শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেন থেকে, শিবপুর ঘাট থেকে, রামকৃষ্ণপুর ঘাট থেকে, সাল্‌কে বালি থেকে এপারে খুব আস্‌ত, নৌকোর উপরে ভাসমান হাওড়ার সাঁকোতে সকলের কুলাত না। এই-সব পারানি নৌকো এখন উঠে গিয়েছে—মাঝে খেয়া-স্টীমার তার স্থান নিয়েছিল, এখন তা-ও নেই – ট্রাম বাস হওয়ায় ডাঙা পথেই লোক চলাফেরা করে এখন, জলপথে পারাপার বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। এই-সব খেয়া বা পারানি নৌকো চালিয়ে হুগলী মেদিনীপুরের বিস্তর বাঙালী মাঝি দু মুঠো ক'রে খেত। আপিসের বাবুরা, অন্য যাত্রীরা সকাল বিকাল এই-সব নৌকায় 'শেয়ারে' যাওয়া-আসা ক'রত – ১৬।১৭ জন যাত্রী সাধারণতঃ একটা নৌকায় উঠ্‌ত, একজন ক'রে মাঝি, দুজন ক'রে দাঁড়ি, একটা পালও ছিল, হাওয়া অনুকূল হ'লে সেটা মাস্তুল লাগিয়ে তাতে চড়ানো হ'ত। শিবপুর থেকে চাঁদপাল ঘাট – ভাড়া জনা-পিছু ছিল দু পয়সা ক'রে। আপিসের বাবু যাত্রীদের জন্য তামাকের ব্যবস্থা ছিল, ব্রাহ্মণদের জন্য কড়ি-বাঁধা হুঁকো, একজন দাঁড়ি নৌকো ছাড়বার আগে তামাক সেজে হুঁকোয় ক'লকে বসিয়ে যাত্রীদের সেবায় দিত। এইভাবে আমরাও কতবার শিবপুর থেকে ক'লকাতায় যাওয়া-আসা করেছি। যে বছরটা আমরা প্লেগের ভয়ে শিবপুরে ছিলুম, সুখের বিষয় সেই পূরো বছরটা আমাদের কলকাতার বাড়ি খালি প'ড়ে থাকে নি – আড়াই কাঠা জমির উপর চারটে ঘর একটা দালানওয়ালা কোঠা বাড়ি – দালানটা আর একটা ঘর ছিল খোলার চালের—মাসিক পনেরো টাকায় এক ভাড়াটে পাওয়া গিয়েছিল—রাজকুমার বাঁড়ুজ্জে ব'লে আপিসের কেরানি এক ভদ্রলোক, অতি সজ্জন—আমরা ফিরে আসবার সময়েই তিনি বাড়ি ছেড়ে দিলেন, অন্যত্র উঠে গেলেন। তখন লোকসংখ্যা এত হয় নি, বাড়ির অভাব ছিল না।

ক'লকাতায় ফিরে এসেই, কোনও ইস্কুলে আমাদের ভর্তি ক'রে দেবার

* "শিবপুর আমাদের বাড়ি থেকে", অর্থাৎ শিবপুরে আমাদের যে বাড়িতে ও'রা থাকতেন।—অ।

কথা হ'ল। বাবার মাসিক বেতন তখন বোধ হয় ৩৫ কি ৪০ টাকা মাত্র, আজকালকার হিসাবে তার মূল্য হবে ১২৫।১৫০ টাকা। নিজেদের বাড়ি, বাড়িভাড়ার পাট নেই, তবু ঐ টাকার মধ্যে চারটি প্রাণী, ছোটো ছেলেমেয়ে চার পাঁচটি, ঝী একজন, লোকলৌকিকতা, জলের ভারীর মজুরি, হাড়ী বা মেথরের মাইনে, এই-সব খরচ ছিল, আর স্থকিয়াস্ স্ট্রীট থেকে লালদীঘী পর্যন্ত ট্রামের বা শেয়ারের গাড়ির খরচ পাঁচ পয়সা ক'রে, এর উপর ইস্কুলে যাবার বয়সের আমরা দুই ভাই, দাদা আর আমি, তাদের মাসিক বেতন, সেও দেড় টাকা দেড় টাকা ক'রে তিন টাকা। চা'লের দাম তখন ছিল দু'টাকা ন'সিকে ক'রে মন, সেই দাম কিছুদিন পরে যখন আড়াই টাকায় উঠ্ল—তারপর থেকে দাম তো কখনও কমল না, বেড়েই চল্ল—তখন ঠাকুমা মাথায় হাত দিয়ে ব'সলেন—বাবার মাইনে তখন কিছু বেড়েছে—টাকা পঁয়তাল্লিশ হবে—এই মাইনে দিয়ে ক'লকাতায় এত বড়ো সংসার কী ক'রে চ'লবে। তখন ঠিক হ'ল যে, বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে অবস্থিত হ'লেও, আমাদের দুই ভাইকে হ্যালিডে স্ট্রীটের মোতী শীলের ফ্রী ইস্কুলেই ভর্তি করাবার চেষ্টা করা হবে—এক পয়সাও মাইনে লাগবে না, তবে নয় দশ বছর বয়সের ছেলেদের একটু লম্বা পথে রোজ যাওয়া-আসা ক'রতে হবে। পুণ্যশ্লোক মোতীলাল শীল মহাশয় (এখন থেকে দেড়শ' বছর আগেকার ঢঙের ইংরিজি বানানে Motilal Sil -এর বদলে Mutty Lall Seal) গরিব অবস্থা থেকে নিজের সততায় আর বুদ্ধির জোরে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বাঙালীদের মধ্যে শীর্ষস্থানে উঠেছিলেন— যেমন তাঁর উপার্জন ছিল, তেমনি তাঁর দুঃখীর প্রতি দরদ আর জনসেবা – গরিবকে অন্নদান, রোগীর সেবা, আর শিক্ষার বিস্তার—প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার, আর ইংরিজি ইস্কুলের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা দুইয়েরই। ১৮৪২ সালে তিনি একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরিজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন—বিদ্যার্থী যে-কেউ আসবে তাকে পরীক্ষা ক'রে নিয়ে বিনা বেতনে তার ছাত্রজীবনে ভালো ক'রে পড়াবার ভার নেওয়া হবে। এই ইস্কুলটি প্রথমটায় মিশনারি সাহেবদের হাতে দেওয়া হয়, পরে মোতীলাল এটিকে স্বতন্ত্র একটি বাঙালীর পরিচালিত বিদ্যালয় রূপে দাঁড় করান, ১৮৪৩ সালে—৩০০।৪০০।৫০০, পরে আরও বেশি ছাত্র এই ইস্কুলে বিনা বেতনে প'ড়ত। ইস্কুলটিকে চিরস্থায়ী charity বা ধর্মদেয় রূপে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা তাঁর ছিল, কিন্তু সেই সময়ে নাকি একশ' বছরের বেশি কোনও

Charitable Institution বা বিনা শুল্কের প্রতিষ্ঠান করার আইন-গত বাধা ছিল, সেইজন্য বাধ্য হ'য়ে মোতীলাল ইস্কুলটিকে ১০০ বছরের জন্যই কায়েম করেন। ইতিমধ্যে ইস্কুলটির উন্নতি হ'তে থাকে, আর যখন ১৮৫৭ সালে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজ গভর্নমেণ্ট স্থাপিত ক'রলে, তার পরে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মোতী শীলের ইস্কুল (সরকারি নাম Seal's Free College) সংযুক্ত হ'ল। ১৮৪৩ সাল থেকে একশ' বছর পরে ১৯৪৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানটির আইন অনুসারে বন্ধ হ'য়ে যাবার কথা। মোতী শীল মহাশয়ের বংশের উত্তরাধিকারীরা তখন ইচ্ছা ক'রলে এই ইস্কুলের জন্য তাঁর প্রদত্ত টাকা তুলে নিয়ে, নিজেদের যাঁর যেমন প্রাপ্য তেমনি অংশ ভাগাভাগি ক'রে নিতে পারতেন। কিন্তু অসাধারণ মহানুভবতা দেখিয়ে তাঁর বংশধরেরা (দুই একজন ছাড়া) এই টাকা নিলেন না, উপরন্তু ইস্কুলটিকে তাঁদের পূর্বপুরুষের এবং বাঙালী হিন্দু জাতির অবিনশ্বর কীর্তি ব'লে চিরস্থায়ী ক'রে নূতন ভাবে পত্তন ক'রলেন।

১৮৯৯ সালে যখন আমরা দুই ভাই ভর্তি হ'লুম*, তখন এ-সব ছিল দূরের কথা। ভর্তির সময়ে একটু চেষ্টা ক'রতে হ'য়েছিল। ঠাকুদ্দা একটু ঘোরাঘুরি ক'রেছিলেন, আর ক'লকাতার সিদ্ধেশ্বরী-তলার (কালীতলার) বিখ্যাত সুবর্ণবণিক বংশ দত্তদের প্রিয়লাল দত্ত বাবার বন্ধু ছিলেন, সেই সূত্রে, তাঁদের সুপারিশে মোতী শীলের বাড়ির কর্তাদের অনুগ্রহে আমরা ভর্তি হ'লুম। তার পরে আমার আর দুই ভাই, সেজো ভাই সুজ্যোতিনাথ আর ছোটো ভাই বাসন্তীকুমার†, বিনা আয়াসে ঐ ইস্কুলে স্থান পেলে। দাদা ভর্তি হ'ল সপ্তম শ্রেণীতে, আমি অষ্টম শ্রেণীতে।** ছোটো ভাইয়েরাও অষ্টম শ্রেণী থেকে ঐ ইস্কুলে এল। এইভাবে আমরা চার ভাই, গরিব কেরানি ঘরের ছেলে, আট আট বছর ক'রে, ক'লকাতার এক শ্রেষ্ঠ ইস্কুলে, একটি পয়সা খরচ না ক'রে, লেখাপড়া করবার সুযোগ পাই। জীবনে আমাদের কয় ভাইয়ের যেটুকু প্রতিষ্ঠা, তা এইভাবে মহাত্মা মোতীলাল শীলেরই দয়ায়। তাঁর কথা মনে হ'লে, শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা সহজেই নত হ'য়ে যায়, তাঁর চরণে আমাদের

* দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট', "আমার ছেলেবেলার কথা"।—অ।

† সুনীতিকুমারের এই দুই ভাই বর্তমানে আছেন ক'লকাতার উত্তর উপকণ্ঠে বরানগরে নিজের নিজের বাড়িতে।—অ।

** "তখন ক্লাসের সংখ্যাকরণ অন্যভাবে হ'ত"—দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট' "হেড পণ্ডিত মশায়", প্রথম অনুচ্ছেদ।—অ।

কোটি কোটি প্রণাম আপনা থেকেই নিবেদিত হয়, নিজেদের পক্ষ থেকে, আর আমাদের মতো সহস্র সহস্র গরিব ঘরের ছাত্রদের পক্ষ থেকে। এই ইস্কুলের উপর ছায়ার মতো থেকে এর উচ্চ আদর্শকে জীইয়ে রেখেছিল মোতীলালের অশরীরী আত্মা আর আদর্শ তো বটেই, আর সঙ্গে-সঙ্গে নাম ক'রতে হয় ইস্কুলের শিক্ষকদেরও। অষ্টম শ্রেণীর ইংরিজির শিক্ষক অশ্বিনী-কুমার ঘোষ, সপ্তম শ্রেণীর মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ষষ্ঠ শ্রেণীর জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, পঞ্চম শ্রেণীর ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি (ইনি দোর্দণ্ডপ্রতাপ স্থপারিণ্টেণ্ডেট ছিলেন), চতুর্থ শ্রেণীর গিরিজাপ্রসন্ন মিত্র, তৃতীয় শ্রেণীর বিষ্ণুপদ পাঁজা, দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থশীলকুমার নিয়োগী আর প্রথম শ্রেণীর বা এণ্ট্রাস ক্লাসের হেডমাষ্টার—প্রথমটায় নকড়ি ঘোষ, পরে জগবন্ধু ঘোষ। এ ছাড়া ছিলেন আমাদের হেডপণ্ডিত মহাশয় প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন, আর অন্য শিক্ষক রসরাজ ঘোষ আর হরিশ্চন্দ্র দাস, আর ড্রয়িং-শিক্ষক গোষ্ঠবিহারী শীল। এঁদের সকলের কাছ থেকে যে স্নেহ যত্ন হিতৈষণা পেয়েছি তার তুলনা নেই। ক্লাসে বয়সে ছোটো "ভালো ছেলে" ছিলুম, প্রত্যেক বৎসরই প্রথম হ'তুম, ইংরিজিতে খুব লায়েক ছিলুম ব'লেই বেশি খাতির—কিন্তু গণিতে অত্যন্ত পিছ্পা ছিলুম—ভালো নম্বর কখনও পেতুম না, যদিও কষ্টেস্থষ্টে পাসের মতো নম্বর পেয়ে সব ছেলেদের মধ্যে প্রথম স্থানটি কোনও রকমে বজায় রাখতুম। একবার পঞ্চম শ্রেণীতে হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায় অঙ্কে ১০০-র মধ্যে একটি পূরো গোল্লা—শূন্য মাত্র পাই। স্থপারিণ্টেডেণ্ট ব্রজেনবাবু, আমাদের পঞ্চম শ্রেণী যাঁর তাঁবে ছিল—অত্যন্ত রাশভারী লোক ছিলেন—খুব ঢাঙা মানুষ, চাপকান-পাতলুন পাক-দেওয়া চাদর প'রে আসতেন, তাঁর হুংকারে অতি দুষ্ট বখাটে ছেলেরাও ভয়ে কাঁপত, আর তাঁর হাতের গাঁট্টা আর লম্বা বেতও ছিল ভীতিপ্রদ। আমার গণিতে এই ফল হওয়ায় তিনি আমাকে পরীক্ষার পরে আপিসে ডেকে পাঠালেন। খুব ক'ষে ধমক দিলেন—এরকম ক'রে যদি গণিতে গাফিলতি করি, তাহ'লে এণ্ট্রান্স পাস ক'রতেই পারবো না, ইস্কুলের বদনাম ক'রবো, ঠাকুদা বাবা ঠাকুমার মনঃকষ্টের কারণ হবো। মন দিয়ে অঙ্ক না কষার জন্য ভবিষ্যৎ কালের প্রতিষেধক হিসেবে মাথায় তিনি গুটি কতক গাঁট্টা মারলেন। সেই গাঁট্টার দাওয়াইয়ে কতটা ফল হ'ল তা জানি না—কিন্তু আর একটি ব্যবস্থা সেই সঙ্গেই তিনি ক'রলেন। হুকুম হ'ল—"কাল থেকে চারটেয় ইস্কুলের ছুটি হ'লেই বাড়ি যেতে পাবি না।

আমার সামনে আপিসে ব'সে ব'সে ঘণ্টাখানেক অঙ্ক ক'ষবি। আমি ছটা অবধি ইস্কুলেই থাকি।" এই-সব শিক্ষকের জ্ঞানের পরিধি বা গভীরতা খুব বেশি কিছু ছিল না, কিন্তু যেটুকু তাঁরা জানতেন সেটুকু ভালো ক'রেই জানতেন, আর সব কিছু তাঁরা দরাজ হাতে ছাত্রদের কাছে উজাড় ক'রে দিতেন। ব্রজবাবুর সম্বন্ধে আমরা শুনতুম, সেকালের বহুপ্রচলিত ইস্কুল-পাঠ্য গণিতের বই Barnard Smith-এর Arithmetic-এর প্রশ্নাবলীর প্রত্যেকটি অঙ্কের উত্তর তাঁর মুখস্থ ছিল। যা হোক, এই ভাবে তো তিনি অযাচিত স্নেহ দেখিয়ে আমার গণিতের বিদ্যার উন্নতির ভার নিলেন। এর পরে, উঁচু শ্রেণীতে, কতকটা নিজের আগ্রহে ও পরিশ্রম ক'রে ভালো ফল পাওয়া গেল—১৯০৭ সালে যখন এণ্ট্রান্স পাস ক'রে বা'র হ'লুম, তখন গণিতের পূর্ণ সংখ্যা ১৬০-এর মধ্যে ১২২ পেয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে, কুড়ি টাকার প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পেয়ে with drums beating অর্থাৎ "ড্যাং-ডেঙিয়ে" পাস ক'রে গেলুম। ইস্কুলের জন্য গৃহশিক্ষক রাখার তেমন সংগতি ছিল না—অবস্থা বুঝে, হেডমাষ্টার জগবন্ধু ঘোষ মহাশয় নিজেই এসে বাবার কাছে প্রস্তাব ক'রলেন—"আপনার ছেলে এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ভালো ক'রবে, আমাদের নাম রাখবে, এই আশা করি। আপনি চিন্তিত হবেন না—পরীক্ষার তিন চার মাস বাকি আছে—আমি এখন থেকে রোজ সন্ধ্যেয় এসে ওকে দু ঘণ্টা ইংরিজি পড়াবো, সংস্কৃতটাও একটু দেখে দেবো। কোনও চিন্তা ক'রবেন না—মাইনের কথাই নেই—ভালো ক'রে পাস ক'রলে আমাদেরই সার্থকতা।" এই ভাবে তাঁরা আমাদের স্নেহ দিয়ে মানুষ ক'রেছিলেন। আমাদের হেডপণ্ডিত মহাশয়—চতুর্থ শ্রেণী থেকে চার বছর ধ'রে যিনি আমাদের সংস্কৃত পড়ান—তাঁর চরিত্র অসাধারণ ছিল। ছেলে বয়সে তাঁকে "পাগলা পণ্ডিত" ব'লে আমরা ঠাট্টা ক'রতুম কিন্তু কখনও অবজ্ঞা করার চিন্তাই করি নি। তাঁর নিঃশব্দ উদাহরণ আমাদের চরিত্রকে গ'ড়ে তুলতে যে কতটা সাহায্য ক'রেছিল, তা এখন আমরা বুঝতে পারি। তাঁর সম্বন্ধে আমার প্রণাম নিবেদন ক'রে ইতিপূর্বেই একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত ক'রেছি।*

যখন ১৯২২ সালে বিলেতে তিন বছর থেকে, দু বছর লণ্ডনে আর এক

* দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট', "হেড-পণ্ডিত মশায়"।—অ।

বছর প্যারিসে, আর তা ছাড়া বার্লিনে রোমে আথেন্সে—লণ্ডনের ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এলুম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ পেলুম, তখন আমার পুরোনো ইস্কুলে শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলুম। তাঁরা আমায় দেখে খুব খুশি। বিলেতের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ ধারণা ছিল না। উঁচু শ্রেণীর মাষ্টাররাও মনে ক'রতেন, আমাদের ভারতবর্ষের মতন, ইংলাণ্ডে তো বটেই, ইউরোপে অন্য সব দেশেও ইংরিজিই হ'চ্ছে উচ্চশিক্ষার বাহন। ইংরিজি ছাড়া অন্য ভাষা কী ক'রে হ'তে পারে? যখন ব'ললুম ফ্রান্স জরমানি ইটালি গ্রীসে তারা ইউনিভার্সিটিতে অনেকে ইংরিজি জানে না, ব'লতেও পারে না, নিজেদের সব ভাষায় ইণ্টারমিডিয়েট, বি-এ, এম-এ, ডক্‌টরেট প্রভৃতি পাঠ করে, পরীক্ষা দেয়—তাঁরা একটু আশ্চর্য্য হ'লেন। একজন কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "তুমি ওসব দেশে গিয়েছিলে, ওসব ভাষা কিছু কি ব'লতে পারো?" ব'ললুম—"একটু একটু পারি।" তখন প্রশ্ন হ'ল, "আচ্ছা, বলো তো, ফ্রেঞ্চে What is thy name কী হবে?" আমি ব'ললুম, "'তুই' ব'ললে এক রকম, 'তুমি' বা 'আপনি' বল্‌লে আর এক রকম। Comment tu t'appelles 'কমঁ৷ ত্যু তাপেল', মানে 'তোর নাম কী?' Comment vous vous-appelez 'কমঁ৷ ভূ ভূজাপ্লে', মানে 'তোমার বা আপনার নাম কী?'" "আর জরমানে?"—"জরমানে Wie heisst Du 'ভী হাইস্ট ডু' অর্থে 'তোর নাম কী?' আর Wie heissen Sie 'ভী হাইস্‌ন্ জ়ী' অর্থে তোমার বা আপনার নাম কী?'"—এ কথা শুনে তো তাঁরা হেসেই আকুল। ইংরিজির বদলে এ ভাষা শিখে আবার ওদের দেশে বি-এ, এম্-এ, ডক্‌টর ডিগ্রি নিতে হবে? এ যেন কেমন অসম্ভব ব্যাপার।

১৭ আগস্ট ১৯৭৬

এই যে লম্বা আটটি বছর ইস্কুলে কাট্‌ল, বেশ আনন্দের সঙ্গেই কেটেছিল। পড়াশুনোয় ভালো ছিলুম ব'লে প্রশংসা পেয়েছি। বারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মায়ের ভালোবাসা আদর যত্ন পেয়েছি, তার স্মৃতি এখনও মনকে আকুল করে—আমার বয়স যখন বারো, তখন মা দেহরক্ষা ক'রলেন অকালে। বাবা ছিলেন, ঠাকুদ্দা ছিলেন, আমার ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলবার জন্য তাঁদের কী না আগ্রহ আর চেষ্টা ছিল। ঠাকুমা অতি যত্নে অতি কষ্টে আমাদের চার ভাই

দুই বোনকে মায়ের চেয়েও বাড়া ক'রে মানুষ করেন। গরিবের ঘর, খুব গরিব না হ'লেও অভাব অসুবিধা নানা রকমের ছিল, কিন্তু সেগুলো আমরা বুঝ্‌তেই পারতুম না—তার জন্য কোনও চিন্তা ছিল না। আমরা এ বিষয়ে কখনও ভাবি নি, কিন্তু, পরবর্তী কালে বাবা আক্ষেপ ক'রে আমাদের ব'লেছেন, যেন কতকটা অপরাধীর মতন—"তোদের ভালো ক'রে মানুষ ক'রতে পারি নি—বর্ষাকালে তোদের একটি ছাতাও দিতে পারি নি—স্লেট মাথায় দিয়ে বা অন্য লোকের ছাতার কানাচের তলায় আশ্রয় নিয়ে ভিজতে ভিজতে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে ইস্কুলে যাচ্ছিস, দেখে কষ্ট হ'ত, উপায় ছিল না, টাকা নেই।" কই, সে কথা আমাদের তো কখনও মনেই হয় নি। জুতো অনেক সময়ে ছিল না, খালি পায়েই সুকিয়াস্ স্ট্রীট থেকে হ্যালিডে স্ট্রীটে গ্যাঁড়াতলায় ইস্কুলে তো বেশ আনন্দ ক'রতেই ক'রতেই যেতুম—গায়ে অনেক সময়ে একটা গেঞ্জি ছাড়া আর জামা জোটে নি ; মোতী শীলের ইস্কুলে ভর্‌তি হবার পূর্বে কম দামের চীনে বাড়ির জুতো ছাড়া দাদার আর আমার আর কোনও পাদত্রাণ ছিল না। পরে ইস্কুলে ভর্‌তি হবার পরে, হোয়াইটঅ্যাওয়ে লেড্‌ল Whiteaway Laidlaw ব'লে সাহেবদের বড়ো দোকান থেকে পূজোর সময়ে দাদার জন্য টাকা পাঁচেক দিয়ে এক জোড়া মজবুত বিলিতি ঘোড়-তোলা বুট জুতো* কেনা হ'ল, পেরেক মেরে তলাটা লোহার নাল দিয়ে আঁটা—এই জুতো আমরা চার ভাই পর-পর দুই-দুই বছর ক'রে আট বছর ধ'রে ব্যবহার করি। কিন্তু দুঃখু ছিল না। ঠাকুদ্দার ব্যবস্থায়, আর কিছু না হোক, খানিকটা ক'রে খাঁটি ঘী ভাতের সঙ্গে খেতে পেতুম। চালের মন দু টাকা আড়াই টাকা, চন্দ্রকোণার মট্‌কির দানাদার সুরভি ভয়সা ঘীয়ের মন বত্রিশ টাকা—ঠাকুদ্দা পশ্চিমে ছিলেন, দা'ল ঘীয়ের কদর বুঝতেন—মাছের তেমন ভক্ত তিনি ছিলেন না, তুলনায় মাছও ছিল আক্রা—শাক-সব্‌জি, আনাজ-তরকারি খুব বেশি আস্‌ত না—তিনি ব'লতেন "কলাইয়ের দা'ল বা মুগের দা'ল দিয়ে কণ্ঠা পর্যন্ত ঠেসে ভাত খাবি, আর তার সঙ্গে এক খাম্‌চা ক'রে ঘী—ব্যস, এইতেই শরীর ঠিক থাকবে।"

* 'ঘোড়'='গোড়'—উঁচু-গোড়ালি-ওয়ালা বুট-জুতো। বাঙলাতে কিছু দিশি আর তদ্ভব শব্দের উচ্চারণে অল্পপ্রাণ বর্ণের স্থানে মহাপ্রাণ বর্ণ আর মহাপ্রাণ বর্ণের স্থানে অল্পপ্রাণ বর্ণের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য *The Origin and Development of the Bengali Language*, Part 1, p. 439)। —অ।

তখন ৩। ৪ আনার বাজারেই—আলু বেগুন পটল লাউ কুমড়ো শাকেই আর কিছু মাছেই পর্য্যাপ্ত হ'ত। আমাদের কাছে ঐ ঘী দিয়ে ঠাকুমা আর মায়ের হাতের রান্না দা'ল ভাত যেন্ অমৃতের মতো লাগ্‌ত, যেদিন বেশি ক'রে আলু-ভাজা হ'ল তো মনে হ'ল আজ "ফিষ্টি" লেগে গেল। গুড়-তেঁতুল বা লেবু-চিনি মিশিয়ে অপূর্ব চাটনি বা আচারের কাজ হ'ত। মুখ বদ্‌লাবার জন্য মাঝে মাঝে বাবা বড়োবাজারের তুলাপটির এক মারোয়াড়ী হালুইকরের দোকান থেকে তখনকার দিনের খাঁটি ঘীয়ে তৈরি পশ্চিমা মেঠাই আমাদের জন্য আনতেন—বেশি আনতে পারতেন না, কিন্তু সকলের কথা ভেবে যা নিয়ে আস্‌তে পারতেন তাই আমাদের কাছে ছিল যথেষ্ট—ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম অঙ্গ মিষ্ট পক্কান্নের সঙ্গে এইভাবে অন্তরঙ্গ পরিচয়—হিঙ্-এর কচৌরী, সেউ দাল-মোট, কিশমিশের সিঙাড়া, মুগের লাড্ডু, গোলাপ-জাম, বর্ফী, মগ্‌দাল [?], পশ্‌দারী লাড্ডু, ইমিরতী—এ-সবের রসে আমাদের ছেলেরা বঞ্চিত হ'চ্ছে, চকোলেট ললিপপ কেক লজেঞ্জ বিস্কুট-এর টানে—এমন কি নামও জানছে না। বাড়িতে বাবাই আমাদের কয় ভাইয়ের পড়াশুনা দেখতেন। বাবার পড়াশুনা এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পৌঁছায় নি—তাই, যখন উঁচু ক্লাসে প'ড়তুম, তখন তিনি খুব ভোরে উঠে H. C. Sur বা হেমচন্দ্র সুরের ইংরিজি-বাঙলা অভিধান দেখে আমাদের সেদিনকার ইংরিজি পাঠের কঠিন কঠিন শব্দের মানে খুঁজে খুঁজে বা'র ক'রে খাতায় লিখে দিতেন, সময়মতো ঠাকুদ্দাও অঙ্কতে সাহায্য ক'রতেন। বাবার একটা খুব আগ্রহ, যাতে আমরা ভালো ক'রে ইংরিজি শিখি। সেকালে উচ্চ শিক্ষা মানেই ভালো ক'রে ইংরিজির চর্চা, শেক্‌স্পিয়র, মিল্‌টন, শেলি, ব্রাউনিং, টেনিসন, ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থ, ডিকেন্স্, থ্যাকারে, অ্যাডিসন্, সুইফ্‌ট্ যার মুখস্থ নয়, সে আবার পণ্ডিত কিসের? অনেক বেশি ইংরিজি বই, ক্বচিৎ সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কৃত বইও, যাঁরা প'ড়তেন, তাঁদের Walking Library ব'লে সম্মান করা হ'ত। তখন লাইব্রেরির পাট বেশি ছিল না—আমাদের ইস্কুলে ছাত্রদের জন্য আলাদা লাইব্রেরি ব'লে কিছুই ছিল না। খালি মাষ্টার মশায়দের জন্য দু চারখানা বিনা পয়সায় পাওয়া পাঠ্যপুস্তক, আর অল্পদামী অভিধান ব্যাকরণ আর ছুট্‌কো ইংরিজি বই থাক্‌ত—এই যথেষ্ট। (এইরকম বইয়ের মধ্যে মাষ্টারদের ঘরের আধ-আলমারি বইয়ের মধ্যে আমি Prescott-র *Conquest of Mexico* পাই, সেখানা সবটা না বুঝেও প'ড়ে ফেলি, অসীম

কৌতূহল আর আনন্দ লাভ করি তা থেকে)। বাবা বই পড়ার কদর বুঝতেন। তিনি জানতেন, কেবল কখানি পাঠ্যপুস্তক নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রলে কিছু হয় না—পাঠের পরিধি সর্বদা বাড়াতে হয়। এই জন্য খুব বেশি ক'রে, সেকালের ভাষায়, ইংরিজি out-book অর্থাৎ পাঠ্যের বাইরেকার বই পড়া চাই। সে বই কিনে পড়াবার সংগতি ছিল না, তবে ক'লকাতার পুরোনো বইয়ের দোকানে, আর রাস্তায় ঢালা কম দামের ছেলেদের উপযোগী পুরোনো ইংরেজি বই দু-চার আনার পাওয়া যেত, বেছে-বেছে সে রকম বই বাবা প্রায়ই আমাদের জন্য কিনে নিয়ে আসতেন। আমাদের নিজে পড়াতেন। এই থেকে "গ্রন্থ-কীট" হবার একটা প্রবৃত্তি আমার মনের মধ্যে ছেলেবেলাতেই জেগে ওঠে।

২৩ আগস্ট ১৯৭৬

বাবার নিজের পড়ার অভ্যাস কিছু কিছু ছিল। বাড়িতে ঠাকুদ্দার কেনা তিনটি বিরাট খণ্ডে কালীপ্রসন্ন সিংহের সংস্কৃত মহাভারতের বাঙলা অনুবাদ ছিল, সেটা তিনি মাঝে মাঝে প'ড়তেন। আমিও সেই বিশাল মহাভারত সাগরের কিনারায় ব'সে তার ঢেউয়ের মধ্যে আছাড় খেতুম—লোভ হ'ত, বইখানি প'ড়ে ফেলি, সাহস আর সময় হ'ত না। Oliver Goldsmith-এর কাব্য, নাটক আর গদ্যরচনার এক বড়ো সংগ্রহ ছিল, সেটা বাবা প'ড়তেন। তিন চারটে টীকা সমেত গীতার এক বড়ো সংস্করণ তিনি কিনে আনেন, সেটাও প'ড়তেন, আমার কিন্তু সাহস হ'ত না। আর নানারকম ইংরিজি নভেল বাবা সংগ্রহ ক'রে এনে প'ড়তেন, আর কিছু কিছু বাঙলা বইও। ইংরেজ সওদাগরি আপিসের কেরানির পক্ষে, ব'লতে হবে, বাবার পড়াশুনার দিকে খুবই ঝোঁক ছিল। তাঁর কাছ থেকে তার কিছুটা আমি পেয়েছিলুম সন্দেহ নেই। ১৯০৩ সাল, প্রথম অবনীন্দ্রনাথের ছবির মোহে পড়ি—সেই সময়ে বোধ হয় ক'লকাতায় ৮৬নং কলেজ স্ট্রীটে হ্যারিসন রোড (এখনকার মহাত্মা গান্ধী রোড) আর কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে আমেরিকানদের স্থাপিত Y. M. C. A. College Branch—তাতে কেবল কলেজের ছেলেরাই সদস্য হ'তে পারত—এর বাড়িতে ইস্কুলের ছেলেদের জন্য একটা YMCA Boys' Branch স্থাপিত হ'ল, সেটা আমার পক্ষে এক অভাবনীয় আনন্দের

ব্যাপার। এই Boys' Branch ছিল বাড়ি থেকে মোতী শীলের ইস্কুলে যাবার পথেই। বাড়িতে বাবার অনুমতি নিয়ে, সামান্য নামমাত্র চাঁদা দিয়ে, তার সদস্য হ'লুম। অনেক সুবিধে ছিল—ছেলেদের জন্য ব্যায়ামশালা, ছেলেদের জন্য ইংরিজি গল্পের বই আর ছবির বইয়ের লাইব্রেরি (বাঙলা বই তখন তেমন পাওয়া যেত না), নানা সান্ধ্য সম্মিলন, গান-বাজনার আড্ডা, Boys' Branch-এর পরিচালক ইংরেজ পাদরি Arthur Lefevre-এর সান্নিধ্য, তাঁর সঙ্গে সন্ধ্যে বেলায় আলাপ-আলোচনা, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খ্রীষ্টান যাজক, অতি সজ্জন, বিদ্বান্ হৃদয়বান্ চরিত্রবান্ ব্যক্তি, তাঁর বক্তৃতা আর তাঁর উপদেশ, এঁর পুত্র হৃদয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালক হন পরে, তিনি বেশ অমায়িক মিশুক ব্যক্তি ছিলেন—এঁরা ছিলেন প্রধান আকর্ষণ। আর আমার কাছে সব-চেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিল এই Boys' Branch-এর লাইব্রেরি। আমার কাছে এ যেন এক নোতুন স্বর্গের দরজা খুলে দিলে। ছোটো বড়ো ছবিওয়ালা নানান্ রকমের ছেলেদের উপযোগী ইংরিজি বইয়ের এত বড়ো সংগ্রহ আগে দেখি নি। আমি তো গা ঢেলে দিয়ে এই-সব বই প'ড়তে মেতে গেলুম। Boys' Own Paper, Chatterbox প্রভৃতি সচিত্র ছেলেদের পত্রিকা পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে প'ড়তুম—বিনা শ্রমে ইংরিজি ভাষার swing-এর মধ্যে অর্থাৎ তার অন্তরঙ্গ প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হবার পথ একটা পেলুম। G. A. Henty ব'লে [লেখকের লেখা] সে যুগে কিশোর বয়সের ছেলেদের উপযোগী ঐতিহাসিক কাহিনীর উপন্যাস সবগুলিই আস্‌ত। সেগুলি নিয়ে আর Andrew Lang-এর অদ্ভুত সুন্দর Fairy Books—নানা জাতির রূপকথার বই—H M. Brock ব'লে সে যুগের শিল্পীর রঙীন আর কালি-কলমের টানে আঁকা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছবিতে ভরা এই বইগুলি—এ সব নিয়ে কল্পলোকে বিচরণ ক'রতুম। Lefevre সাহেব আমায় খুব ভালোবাসতেন। পরে YMCA-এর অন্যতম পরিচালক হন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস নামক এক খ্রীষ্টান যুবক, ছেলেদের বড়ো ভাইয়ের মতন হ'য়ে যান, সকলেরই শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার পাত্র হন তাঁর বিদ্বত্তা আর চরিত্রবত্তার জন্য, আর সকলকে নানাভাবে সাহায্য করার আগ্রহের জন্য। তাঁর এক বন্ধু ছিলেন, তিনিও মাঝে মাঝে Boys' Branch-এর ছেলেদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রতে আসতেন, পরীক্ষার পূর্বে ইংরিজি ইতিহাস প্রভৃতি

বিষয়ে উপদেশ দিতেন, তিনি ছিলেন কেশবচন্দ্র গুপ্ত—পরে তিনি ক'লকাতা পুলিস্ কোর্টের নামী উকিল হন, বাঙলার অন্যতম প্রখ্যাত সাহিত্যিক হন—বরাবরই আমার প্রতি তাঁর স্নেহ অটুট ছিল। পরে কর্মক্ষেত্রে ঢুকেও কত বার তাঁর কাছে গিয়েছি, আমাকে তিনি ছোটো ভাইয়ের মতো দেখতেন, আমার স্ত্রীকেও তিনি আর তাঁর পত্নী অত্যন্ত স্নেহ ক'রতেন, আপনজন ক'রে নিয়েছিলেন—আমার একমাত্র পুত্রের [শ্রীসুমনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের] বিবাহে বৌমাকে [শ্রীমতী ছায়া চট্টোপাধ্যায়কে] দেখে কেশববাবুর কী আনন্দ, কী আশীর্বাদ। আমার জীবনে তাঁর সঙ্গে এই সংযোগ YMCA Boys' Branch-এ আমার যোগ দেবার অন্যতম ফল।*

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো চরিত্রবান্ খ্রীষ্টান নেতার উপদেশ আমাদের নৈতিক জীবনও অনেক চিন্তাশীল অনেক উন্নত ক'রতে সাহায্য ক'রেছিল। আমি যখন YMCA Boys' Branch-এর সদস্য—প্রায় ৭০।৭৫ বছর আগেকার কথা—তখন সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলেরা সন্ধ্যা আহ্নিক ক'রত, সকলের অন্ন আহার ক'রত না। বিলিতি বিস্কুট, মুর্গির ডিম দেওয়া কেক, মুসলমান খ্রীষ্টান-এর ছোঁওয়া বা পরিবেশন করা খাবার জিনিস খেত না।—আর অতি সহজ ভাবেই অন্য বর্ণের বা ধর্মের লোকেরা তাদের এই-সব আচার মেনে নিত—একটু ঠাট্টা ক'রলেও শ্রদ্ধা ক'রত। নিষ্ঠার সঙ্গে যে-সব ব্রাহ্মণ সন্তান চ'লত, তারা কষ্ট স্বীকার ক'রলেও একটু আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রত। ইস্কুলে পড়বার সময়ে যখন সুকিয়াস্ স্ট্রীট থেকে হাঁটা পথে লম্বা পাড়ি দিয়ে হ্যালিডে স্ট্রীট গ্যাঁড়াতলার মোতী শীলের ইস্কুলে সাড়ে দশটায় আস্তুম, আর চারটের পরে ইস্কুল ভাঙলে বাড়ি ফেরার পথেই বহুদিন YMCA Boys' Branch-এ এসে হাজির হ'তুম, সেখানে সন্ধ্যা ৭টা ৮টা অবধি থাকতুম—ব্যায়াম সভাসমিতি লাইব্রেরিতে পড়া সব তখন হ'ত, তখন এই টানা ৮। ১০

* ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল সুনীতিকুমার ও কমলা দেবীর বিবাহের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষ্যে সুনীতিকুমারের ১৬ হিন্দুস্থান পার্কে "সুধর্মা" ভবনে একটি প্রীতি-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সেই শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হ'য়ে সুনীতিকুমার আর তাঁর সহধর্মিণীকে আশীর্বাদ করেন। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুন কেশবচন্দ্রের ৮৯ বৎসর পূর্ণ হয়, ঐ বছরই ২৯ নভেম্বর তিনি দেহরক্ষা করেন।—অ।

ঘণ্টা খাবারের নিয়মিত ব্যবস্থা আমার মতো বাড়ন্ত বয়সের ছেলের জন্য তেমন ভালোভাবে করা সম্ভব হ'ত না। সকালে অবশ্য দশটায় ভাত খেয়ে ইস্কুলে আসতুম—সঙ্গে বাড়ি থেকে টিনের কৌটো ক'রে কিছু জল-খাবার নিয়ে আসতুম, বেলা দেড়টায় সেটা খেতুম—খানপাঁচেক লুচি বা পরটা, আলুভাজা, বা একটু মোহন-ভোগ—এই যা। এটা সন্ধ্যা ৭টা ৭॥টা পর্য্যন্ত চালাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না—কিন্তু নানা নোতুন জিনিস দেখ্‌বার শোন্‌বার জান্‌বার উৎসাহে আমরা তা গায়ে মাখ্‌তুম না। তবে কোনও কোনও দিন ৪॥-টে ৫টার মধ্যে বাড়ি ফিরে, জলটল খেয়ে, আবার YMCA-তে এসে ৬টা ৭টা ৮টা পর্য্যন্ত কাটাতুম। এই সময়ের মধ্যে YMCA-র পরিচালক Lefevre সাহেব কিংবা অন্য কর্তারা, ছেলেদের চা-বিস্কুট খেতে দিতেন—কোনও কোনও দিন Party থাকলে কচুরি, জিলিপি মিঠাই সন্দেশ সিঙাড়া তাঁরা পরিবেশন ক'রতেন স্বহস্তে, হিন্দু ছেলেদের খেতে দিতেন। কোনও প্রশ্ন বা সংকোচ না ক'রে সাধারণ হিন্দু ছেলেরা (যায় ব্রাহ্মণ ছেলেরাও) তা খেতে অভ্যস্ত হয়। YMCA-র এই রকম একটি Party-তে এই ভাবে জলখাবার পরিবেশন ও ভোজন চ'লছে, সেখানে রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন উপস্থিত। তিনি নিজে ব্রাহ্মণের ছেলে, সব রীতিনীতি জানেন। সব কিছু দেখে, দু'টি ছেলের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ জমালেন। "তোমরা এখানে এই সাহেবদের, খ্রীষ্টানদের ছোঁওয়া জিনিস খাচ্ছ—বাড়িতে তোমাদের মা-বাবা অভিভাবকেরা আছেন, তাঁরা কি খুব গোঁড়া, বা এসব বিষয়ে উদার ?" ছেলেরা একটু থত-মত খেয়ে, যেন কিছু অন্যায় ক'রেছে এইভাবে ঘাড় হেঁট ক'রে স্বীকার ক'রলে, বাপ-মা কেউই এই খ্রীষ্টানের সঙ্গে ছোঁয়ালেপা পছন্দ ক'রবেন না—জানলে পরে তাদের ব'কবেন। তখন রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায় ব'ললেন, "দেখো, এসব ছোঁয়ালেপার কোনও মূল্য নেই, এ ধরনের ব্যবস্থাতে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণাই প্রকাশ পায়। এ থেকে হিন্দু সমাজের মুক্তি পাওয়া উচিত ব'লেই আমাদের মনে হয়। কিন্তু তোমরা এখন ছেলেমানুষ, স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নও। এ বিষয়ে সাহস থাকে তো বাপ-মার মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁদের বিরাগভাজন হ'তে পারো। কিন্তু আমি বলি, তার দরকার নেই। বিষয়টা সামাজিক আর নৈতিক হ'লেও, আধ্যাত্মিক বিচার বা বিবেকের ব্যাপার নয়। পরে বড়ো হ'য়ে স্বাধীন হ'য়ে দায়িত্ব নিয়ে যা উচিত মনে ক'রবে তা ক'রতে

পারবে। এখন খ্রীষ্টান-ছোঁয়া খেয়ে বাড়িতে গিয়ে মিথ্যে কথা ব'লতে হবে, 'না খাই নি,' কিংবা 'হাঁ খেয়েছি' ব'লে বাড়িতে তাঁদের বিরাগ-ভাজন হ'তে হবে। তার চেয়ে বরং এক কাজ করা কি ভালো না? আত্মসংযম করা। খেলে দোষ হয় না, কিন্তু আমি খাই নি। এই ভাবে সরলতার সঙ্গে সত্যের সঙ্গে চলা কি ভালো নয়?"—এঁদের আদর্শ, এঁদের হৃদয় কী মহান্ কী উঁচু ছিল!

এইভাবে ভালো মন্দ নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কৈশোরে মন মেজাজ শিক্ষা নিষ্ঠা গ'ড়ে উঠছিল। এই সময়ে দু'টি দিক থেকে আমার উপরে দুই বিরাট অভিজ্ঞতার ধকল এসে প'ড়ল। প্রথমটি হ'চ্ছে—বারো বছর বয়সে, ১০ই এপ্রিল ১৯০২ সালে মায়ের মৃত্যু। এর ফল—মানসিক স্বাতন্ত্র্যের গোড়াপত্তন। আর দ্বিতীয় ব্যাপারটি হ'চ্ছে আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জগৎকে নিয়ে—১৯০৩ সালে তখন আমি ফোর্থ ক্লাসে (এণ্ট্রাস পরীক্ষার পূর্বের চতুর্থ শ্রেণীতে) পড়ি—আর ১৯০৪ সালে, তখন আমি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র—বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

আমার মা, বাবার আর ঠাকুদ্দার বাড়ির তুলনায়, বড়ো ঘরের মেয়ে ছিলেন। বাবা-মা'র বিয়ে হয়েছিল ১২৮৬ সালের শ্রাবণ মাসে—ইংরিজি ১৮৭৯ সালে। বাবার জন্ম-তারিখ ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৯, ইংরিজি [১৬ মে] ১৮৬২। মায়ের জন্ম-তারিখ জানা যায় না, বিয়ের সময়ে বয়স ছিল ১২। টার্নার মরিসন কোম্পানির মতো বড়ো এক ইংরেজ সওদাগরি হৌসের বড়োবাবুর বারো বছরের কন্যা, বিয়ে হ'ল এক বেকার কেরানির এণ্ট্রাস-পাস-না-করা চাকরির উমেদার ১৭।১৮ বছর বয়সের ছেলের সঙ্গে। কিন্তু কেমন চট ক'রে আমার মা গরিব শ্বশুরবাড়ির সংসারকে আপনার ক'রে নিলেন, তার কথা নানা প্রসঙ্গে বাবার মুখে শুনেছি, ঠাকুমার মুখে শুনেছি। নিজস্ব ব'লতে আড়াই কাঠা জমির উপর একটি পাকা বাড়ি, তিনখানি ঘর, ইটের তৈরি কাদার গাঁথুনি, একটি দালান, তার খোলার চাল, আর একখানি ঘর, তার ইটের গাঁথুনি খোলার চাল, একটু খোলা জমি। বাবা হেয়ার ইস্কুলে আর পরে সংস্কৃত কলেজের ইস্কুলে বোধ হয় ফোর্থ কি থার্ড ক্লাস অবধি পড়েন। এ তল্লাটে বড়ো-নদী দামোদরের পার—সোনাগাছি-সিংটি-শিবপুর গ্রামে ঠাকুদ্দার ঠাকুমার জন্ম ও বাল্যজীবন কাটে, খানাকুল-কৃষ্ণনগর, রাজা

রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরের কাছে এই গ্রাম—আমার মাতৃকুলেরও আদি বাস ঐ সিংটি-শিবপুর গ্রামে—সেই সূত্রে বাঙালদেশ ফরিদপুর পাংশা থেকে আগত ভঙ্গ মহাকুলীন ভৈরব চাটুজ্জের তিন-পুরুষে' বংশজ পৌত্র আমার পিতৃদেব হরিদাস চাটুজ্যের বিবাহ হয়, মুখুজ্জে ঘরের জমিদার আর হৌসের বড়োবাবু নবগোপাল মুখুজ্জের দ্বিতীয়া কন্যা কাত্যায়নীর সঙ্গে।

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ রবিবার

বিয়ে হ'ল ইংরিজি ১৮৭৯ সালে ; তার কিছু পরেই বাবা ইস্কুল থেকে—সংস্কৃত কলেজ [“সংস্কৃত কলেজের ইস্কুল”] থেকে বিদায় নিলেন, ডিসেম্বর ১৮৮১ সালে। তখন ঠাকুদ্দার চাক্‌রি-বাক্‌রি নেই। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বাবার চাকরি হ'ল ১৮৮২ সালে, বাঙলা ১২৮৮, টার্‌নার মরিসন কোম্পানির আপিসে—মাসিক পনেরো টাকা মাইনের অ্যাপ্রেন্‌টিস বা শিক্ষানবিশ কেরানির কাজ। মনে হয়, মাতামহের চেষ্টাতেই তাঁর আপিসেই এই কাজ তাঁর হয়। এখানেই বাবার পূরো ৪০ বছরের সুদীর্ঘ কর্মজীবন—১৮৮২ থেকে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত টানা ৪০ বছর ধ'রে। ১৫ টাকা থেকে মাইনে বছরে বছরে প্রথম প্রথম দু টাকা, পরে পাঁচ টাকা, দশ টাকা ক'রে বেড়ে শেষটায় বোধ হয় মাসিক টাকা তিনশোতে দাঁড়ায়। এই ভাবে “এক কলমে” প্রায় টানা ৪১ বছর যোগ্যতা আর সম্মানের সঙ্গে কাজ করবার পরে তাঁর অবসর গ্রহণ করায়, আপিসের কর্তারা খুশি হ'য়ে যাবজ্জীবন মাসিক দেড়শো টাকা ক'রে তাঁকে পেন্‌শন্ দেয়—সওদাগরি ইংরেজের আপিসে এই পেন্‌শন্ দেওয়াটা তখন একটা অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। একটা থোক টাকা, এক হাজার দু হাজার বড়ো জোর, গ্রাচুইটি বা দান হিসেবে দিলে, তাতেই বাধ্য হ'য়ে লোকে খুশি হ'ত।

আমার ঠাকুদ্দা ছিলেন অতি সুপুরুষ, দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, প্রায় ছয় ফুট ঢাঙা, সুগঠিত দেহ। আর একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য ক'রেছি, তাঁর চোখের রঙ ছিল নীলাভ, একেবারে কালো রঙের নয়। আর তাঁর মাথার চুল কুচ্‌কুচে কালো ছিল না—একটু কপিশ, কটা বা লালচে ধরনের। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় আমায় একবার ব'লেছিলেন, উচ্চ শ্রেণীর বাঙালী ব্রাহ্মণের ঘরে অনেক সময়ে এই দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ কান্তি, নীলাভ চক্ষু, মাথায় হিরণ্য বা স্বর্ণ বর্ণ কেশের শেষ পরিবর্তন এই কটা চুল, এখনও বহু স্থলে পাওয়া যায়—এটা

পতঞ্জলির বর্ণিত মগধের ব্রাহ্মণদের চেহারার মতন, দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ, হিরণ্যকেশ, নীলনয়ন। মূল-আর্য্য পিতৃপিতামহদের দেহের গঠনের কি এটা অবশেষ? আমার বাবাও বেশ গৌরবর্ণ ছিলেন, তবে তিনি ঠাকুদ্দার মতো অত ঢাঙা ছিলেন না—৫ ফুট ৬ ইঞ্চির একটু উপর হবেন, তবে তাঁর চোখ একেবারে কালো ছিল না—একটু পিঙ্গল বর্ণ, আর তাঁর যৌবনের ফোটো দেখেছি—মাথার চুল যে বেশ কটা ছিল তা থেকে বোঝা যায়। আমার নিজের দৈহিক দৈর্ঘ্য বয়সকালে হ'য়েছিল ৫॥ ফুটের একটু উপর, আর ষোলে সতেরো বছর বয়স পর্য্যন্ত মাথার চুল কটাশে' ছিল, তা বেশ মনে আছে। আমার পুত্রের মাথার চুলও তার দশ বারো বছর বয়স পর্য্যন্ত বেশ কটাশে' ছিল। ক্রমে সব কালো হ'য়ে যাচ্ছে। এটা কি এই কয় পুরুষের মধ্যে লক্ষণীয় জাতীয় type বা দেহরূপের বর্ধমান পরিবর্তন? আমার মা একটু শ্যামা ছিলেন, বাবার মতো ফর্সা ছিলেন না। বাবার চুরাশি বছর বয়স পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গ পাই—তিনি দেহরক্ষা করেন ইংরিজি ৩রা আগস্ট ১৯৪৫ (বাঙলা ১৮ই শ্রাবণ ১৩৫২ সাল) —কিন্তু মা চ'লে যান ১০ই এপ্রিল ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে (২৭ চৈত্র ১৩০৮ সাল, বৃহস্পতিবার), তখন আমার বয়স ছিল মাত্র বারো বছর। মায়ের চেহারা পূরোপূরি মনে আসে না, কিন্তু মুখের আর দেহাবয়বের আদল এখনও কতকটা যেন ভুলি নি। মাথায় ঘোমটা, ডাগর চোখ হাসি-হাসি মুখ, স্নেহভরা চাউনি —বড়োই মিষ্টি লাগত। আর মায়ের কাজের বিরাম কখনও দেখতাম না। রান্না-বান্না তো ক'রতেনই, নোতুন নোতুন অল্প খরচের কত রকম জলখাবার আমাদের জন্য ক'রতেন—এ কাজে ঠাকুমা তাঁকে সাহায্য ক'রতে আসতেন, কিন্তু মা তাতে বাধা দিতেন। সাজি মাটি দিয়ে কাপড় বিছানার চাদর কাচা, গোবর কয়লার ঘেষ দিয়ে ঘুঁটের জন্য উনুনের গুল দেওয়া, ঘরের ঝাড় পোঁচ করা, ঝুল ঝাড়া, সেলাই করা, পশমের বোনার কাজ নোতুন এসেছে সেই "উল-বোনা", খুঞ্চিপোশ তৈরি করা, কাঁথা সেলাই করা, লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না, তারি মধ্যে আমাদের বর্ণ-পরিচয় পড়ানো—মাকে কখনো ব'সে থাক্‌তে দেখতুম না। তারই মধ্যে আবার তিনি সংসারের সুখদুঃখ নিয়ে "গান বাঁধতেন" তাঁর আঁকাবাঁকা অক্ষরের লেখায়—আজকালকার ভাষায় "কবিতা লিখতেন"—তার একটার দুই এক ছত্র এখনও মনে আছে—সেটা বাবার প্রতি গভীর সহানুভূতির কথা—আমার দেবতার মতন স্বামী, আমাদের জন্য কত

কষ্ট ক'রছেন, তাঁর মুখ দেখে আমার বুক যেন ফেটে যায়—মা দুর্গা, তুমি মা আমার প্রতি দয়া করো, তাঁর মুখে যেন তৃপ্তির হাসি দেখতে পাই—আর কিছুই চাই না—এই ধরনের কথা। এক টুকরো বাজে কাগজে মায়ের লেখা এই রকম একটি কবিতা বাবা মায়ের মৃত্যুর পরে ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিজের বিছানার শিয়রে রেখেছিলেন। আর আমাদের জন্য—চার ভাই দুই বোনের জন্য—তাঁর চিন্তার আর চেষ্টার অন্ত ছিল না। মাঝে কী জন্য জানি না, আমার দশ এগারো বছর বয়সে ভীষণ অরুচি হয়—কিছুই খেতে পারতুম না—মা অকুলানের সংসার থেকে পয়সা বাঁচিয়ে আমার জন্য ভালো মিঠাই খাবার আমার রুচিমতো কিনে আনিয়ে আমায় খাওয়াতেন। একবার বাবার মনে হ'ল বাড়িতে ব'সে তিনি ব্যবসায় ক'রবেন, দু'টাকা যাতে উপায় হয়। তখন কেরাসিন তেলের রেওয়াজ ছিল খুব—উজ্জ্বলতম আলোর জন্য কেরাসিন তেলের ল্যাম্পই ছিল একমাত্র প্রধান পথ—রেড়ির তেলের মাটির প্রদীপ সর্বত্রই চ'লত, তার নীচে কেরাসিন তেলের কুপো বা টিমি বা লম্পো অর্থাৎ lamp তার ধোঁয়ায় চারদিক ভ'রে যেত—এ সবের উপরে হারিকেন ল্যাণ্টার্ন, আর বড়ো বড়ো তেলের টেবিল ল্যাম্প, চিম্‌নি- আর শেড- ওয়ালা, বেশি দামের ভালো কেরাসিনে যা জ'লত ; এই কেরাসিন তেল বিহারী ফেরিওয়ালারা এক এক টিন ক'রে কিনে এনে, তিন চার পাঁচ টাকায়, তা থেকে আট পয়সায় এক "বোতল" আর চার পয়সায় এক "পাঁট" ক'রে বিকালের দিকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি ক'রত। বাবা হিসাব ক'রে দেখলেন, তাঁর আপিসের সঙ্গে অন্য কারবার উপলক্ষ্যে সংযোগ আছে এমন এক মারোয়াড়ী মহাজন, যে টিন টিন কেরাসিন তেল শস্তা দরে কিনে এনে বাজার-দরে এই ফেরিওয়ালাদের বিক্রি করে, সে রাজি হ'ল, একটু কম লাভে শস্তা দরে একসঙ্গে ৩০। ৪০ টিন বাবাকে বিক্রি ক'রবে—ভালো তেল, আর আমাদের বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে সেই তেলের টিন রেখে, ফেরিওয়ালাদের এক-এক টিন ক'রে দু চার আনা শস্তায় আমরা দিতে পারবো—এতে আমাদের কিঞ্চিৎ লাভ থাকবে। মারোয়াড়ী ভদ্রলোকের নামটি ছিল বোধ হয় বন্‌সীধর হর্‌দয়াল। মিষ্টিমুখ সজ্জন ব'লে মনে হ'ল। এই ৩০।৪০ টিন তেল কেনবার টাকা কই? মা তখুনি তাঁর দু চার খানি গয়না সব বাবাকে এনে দিলেন। নারকেলডাঙায় শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে খালের উপর দিয়ে যে রেলের সাঁকো,

তার পাশেই ছিল বন্‌সীধর হর্‌দয়ালের আড়ৎ। আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বাবা পরিচয় করিয়ে দিলেন—আমি বন্দোবস্ত মতো না'রকলডাঙার গুদাম থেকে গোরুর গাড়ি ক'রে তেলের টিন নিয়ে, গোরুর গাড়ি চ'ড়ে সুকিয়াস্‌ স্ট্রীটে বাড়িতে আনতুম। কিছু দিন ব্যবসা বেশ চ'লল—উঁচু দরের ভালো তেল মহাজন দিচ্ছিল—কিন্তু গরিব বাঙালী বাবুকে মেরে সে আরও দু'পয়সা করবার মতলব ক'রলে—বিভিন্ন দরের তেলের টিন হ'ত—Tiger বা বাঘ মার্কা, Rising Sun বা উঠন্ত সূর্য্য মার্কা, আর সব-চেয়ে ভালো Snow White-নামে তেল—কম দামের বাজে তেলে Snow White-এর টিন ভ'রে আমাদের দিতে লাগল। ফেরিওয়ালারা চট ক'রে ধ'রে ফেললে—বেশি দামে কেনা Snow White-এর টিনের মধ্যে থেকে নিরেস Tiger বাঘ মার্কা তেল বেরুতে লাগল—আমাদের খদ্দের ফেরিওয়ালারা ক্রমে ঝগড়াঝাটি ক'রে একে একে ভেগে প'ড়ল—মায়ের গয়নার টাকা যা এই তেলের ব্যবসায়ে লাগানো হ'য়েছিল সব উবে গেল। কিছুদিন ধ'রে একটি খাতায় ক'রে এই-সব তেলের হিসেব আমিই রাখতুম—অজ্ঞ অপটু বাঙালীর বাণিজ্যে পুনরবতরণের এই অক্ষম প্রয়াস এই ক্ষুদ্র একটি হাস্যকর কাহিনীর সঙ্গে এই ভাবেই দশ বছর বয়সে আমায় জড়িত হ'তে হ'য়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে মায়ের যে স্বার্থত্যাগ, সংসারের উন্নতির জন্য, বাবার চিন্তা লাঘব করবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা দেখেছিলুম, তা ভোল্‌বার নয়—মাকে এজন্য আমার বালক-মনের ভক্তি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা ভালোবাসা জানাবার তো সৌভাগ্য হ'ল না।

৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

এইরূপ সহজ ভাবে শিশুকাল থেকে বেশ আনন্দে জীবন কাটছে। শরীর বেশ ভালো যাচ্ছে, মন আনন্দে আছে। কিন্তু জীবনের এক বড়ো ব্যাধি, সারা জীবন যা নিয়ে ভুগেছি, তা প্রথম দেখা দিলে বা ধরা প'ড়ল আট বছর বয়সে। খুব শিশুকালে, ৫ কি ৬ বছর বয়সে কী ক'রে জানি না, এক অজ্ঞাত ব্যাধিতে অকর্মণ্য হ'য়ে প্রায় শয্যাশায়ী হ'য়ে থাকি প্রায় ৬ মাস। তখন সেই ব্যাধির স্বরূপটি চিকিৎসাশাস্ত্রে ধরা পড়ে নি—সাধারণতঃ তাকে শিশুদের পক্ষাঘাত—Infantile Paralysis বলা হ'ত। এখন এই রোগের প্রকৃতি আর পরিচর্য্যা জানা গিয়েছে—শুনেছি, এই অসুখের এখনকার নাম হ'চ্ছে

Polio. আমার এইটুকু মনে আছে, আমি কয় মাস ধ'রে মোটেই হাঁটতে, চলাফেরা ক'রতে পারতুম না। খালি সারা দিন বিছানায় শুয়েই থাকতুম, মাঝে মাঝে উঠে ব'সতে পারতুম, ঘ'ষটে ঘ'ষটে, বিছানার মধ্যেই একটু আধটু নড়াচড়া ক'রতুম। চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা হয় নি। পারিবারিক চিকিৎসক কেশববাবু ছিলেন—কেশবচন্দ্র দত্ত—ঠন্‌ঠনের শঙ্কর ঘোষের কালী মন্দিরের পশ্চিমের লাগাও বাড়িতে থাকতেন, সেকেলে L. M. S. পাস-করা ডাক্তার, খুব বিচক্ষণ, হৃদয়বান্ ব্যক্তি, টাকার কঞ্জুস ছিলেন না, তিনি আমাকে দেখ্‌তেন। একদিন অন্তর আমাকে দেখে যেতেন, পায়ে হেঁটে গলায় stethescope ঝুলিয়ে আসতেন। তাঁর দর্শনী ছিল মাত্র দুটি টাকা—তা সে যুগের পক্ষে [এখনকার] দশ টাকার কাছাকাছি হবে। তাঁকে বড্ড ভয় ক'রতুম। নানা রকমের ওষুধ তিনি অনেকক্ষণ ধ'রে আমায় দেখে দেখে দিতেন—প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখতেন প্রত্যেক বার—সে যুগের ডাক্তারি প্রেসক্রিপ্‌শন কতকটা লাটিনে কতকটা ইংরিজিতে হ'ত—বাঙালী ডাক্তাররা মেডিকাল কলেজে তাই শিখত—℞—অর্থাৎ Recipe "এই সব ওযুধ নিয়ে মেশাও"—এই শব্দ দিয়ে আরম্ভ হ'ত। আজকালকার ১৬। ৩২। ৬৪ টাকার ডাক্তাররা অনেকেই যেমন নমুনা হিসাবে পাওয়া নানা রকম antibiotic tablet অনেক রকমের রোগীর ঘাড়ে চালান, সে-রকমটি ছিল না। ২ টাকা ৪ টাকা ভিজিটের ডাক্তাররা বেশ সময় দিতেন, কখনও কখনও রোগী দেখ্‌তে দেখ্‌তে তামাক খেতেন, বাড়িতে ভালো মন্দ কিছু রান্না হ'লে তাও তাঁদের চেখে দেখতে হ'ত—রোগীর পথ্য যবের মণ্ড রোগীর জন্য মশিনার পুলটিশ প্রভৃতি ক'রে দেখাতেন। ধুতি কোট চাদর পরা কেশববাবু ডাক্তার আস্‌তেন দুপুর বেলায়—বাইরের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে হুংকার দিতেন ঠাকুদ্দাকে ডেকে—"ঈশ্বরবাবু!"—অমনি আমি ভয়ে আঁত্‌কে উঠ্‌তুম—চুপ ক'রে শুয়ে থাক্‌তুম। কিন্তু এঁরই চিকিৎসায়, মাস ছয়েক শয্যাশায়ী থেকে, আমি নিরাময় হ'য়ে উঠ্‌লুম। বিছানায় শুয়ে কেবল টিনের তৈরি ঘোড়া আর গাড়ি বিছানায় চালিয়ে আমার একমাত্র খেলা ছিল। যে দিন কেশববাবু আমায় প্রথম ঝোল-ভাত খেতে দিলেন, দেয়াল ধ'রে ধ'রে যখন আমি বেশ চ'ল্‌তে পারছি, তখন বেশ মনে আছে, ঠাকুমা মা সকলের চোখে মুখে আনন্দ। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ঠাকুদ্দা এক টাকায় একটা বড়ো রুই মাছ আর দু টাকার সন্দেশ কিনে কেশববাবুর বাড়িতে নিজে গিয়ে দিয়ে এলেন।

এই Infantile Paralysis বা Polio থেকে তো সেরে উঠলুম, কিন্তু সে-যুগে একটা কথা বা বিশ্বাস ছিল, এই শিশুকালের রোগ হ'লে রোগী বেঁচে ওঠে, কিন্তু তার একটা অঙ্গহানি হ'য়ে যায়। এই রোগ নাকি তার চিহ্ন রেখে গেল আমার দৃষ্টিশক্তিকে খর্ব ক'রে— Myopia বা Shortsightedness —আমার চোখ খারাপ হ'ল অসুখ সারার সঙ্গে সঙ্গেই। সেইটাই আমার জীবনের সব-চেয়ে প্রধান ব্যাধি। বাড়িতে পড়াশুনা ক'রছি, ৬। ৭ বছরের ছেলে, Calcutta Academy-তে যাই, ছবি দেখার ও ছবি আঁকার খুব শখ, খড়ি দিয়ে মেঝেতে বড়ো বড়ো ক'রে ঘোড়া হাতি উট মানুষ ঘোড়ার-গাড়ি মন্দির সব আঁকি, চোখ যে খারাপ সে কথা ধরাই পড়ে নি, জানতেই পারি না। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার ক'রলেন এক ডাক্তার—আমার খুব high power myopia—আমাদের পাড়ায় সুকিয়াস্ স্ট্রীটে এক আর্মেনিয়ান বণিক বাস ক'রতেন, তাঁর নাম ছিল Sookias, বোধ হয় Peter Sookias—পয়সাওয়ালা লোক। আমহার্স্ট স্ট্রীট (এখনকার রাজা রামমোহন সরণি) আর আপার সার্কুলার রোড (এখনকার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড)—এই দুইয়ের মাঝে বাদুড়বাগান পল্লীতে তাঁর বিরাট বসতবাড়ি, বাগান, পুখুর সব ছিল—বোধ হয় ১৮০০-১৮৫০ সালের কথা। তিনি খুব দয়ালু পরোপকারী মানুষ ছিলেন, সন্তানাদি ছিল না। তাঁর এই বাড়ি আর জমি তখনকার দিনের ক'লকাতা মিউনিসিপালিটির হাতে দিয়ে যান তাঁর নামে একটি "ধর্মদেয়" বা "দাতব্য চিকিৎসালয়" করবার জন্য। খুব উঁচু উঁচু ছাতওয়ালা বড়ো বড়ো ঘরের এক-তলা বাড়ি, গাড়ি-বারান্দা—প্রত্যেক দিন ৩০।৪০।৫০ জন রোগী, বাঙালী ভদ্রলোক আর বিহারী উড়িয়া আর অন্যজাতীয় শ্রমিক, চিকিৎসার জন্য সকাল ৮॥ থেকে ১১টা ১১॥ পর্য্যন্ত ভীড় ক'রত। একজন ডাক্তার, দুজন কম্পাউণ্ডার আর বেহারা দরওয়ান কেরানি—এ-সবও ছিল। মিউনিসিপালিটি থেকে এদের বেতন দেওয়া হ'ত। কম দামের ওষুধ, জরের মিক্শ্চার, ঘায়ের মলম, বাতের তেল, শারীরিক যন্ত্রণার জন্য মশিনার পুলটিশ, এ-সব বিনা পয়সায় রোগীদের দেওয়া হ'ত। একটা ঘরে, মস্ত এক চুল্লীতে লোহার কড়ায় তৈরি হ'চ্ছে মশিনার পুলটিশ, তার উগ্র গন্ধে ঘর মাত হ'য়ে থাকত। এক পাশে একটি বিছানা, সেখানে রোগীর ফোড়া-কাটা প্রভৃতি ছোটোখাটো অস্ত্রোপচারও হ'ত। কৌতূহলী নয়ন আর মন নিয়ে, সামান্য অসুখের ছুতো ক'রে, বহু দিন এই

দাতব্য চিকিৎসালয়ে গিয়ে, খুব আনন্দ পেয়েছি। ডাক্তারটি তখন ছিলেন প্রবীণ মানুষ—লম্বা ছিপছিপে গড়ন, পরনে চাপকান, পেণ্টুলেন, মাথায় টুপি—নাম ছিল তাঁর, যত দূর মনে প'ড়ছে, ক্ষীরোদ বাবু। তাঁকে দেখে মোটেই ভয় ক'রত না, ছোটো বড়ো সকলেই নিঃসংকোচে তাঁর সঙ্গে কথা কইত। এক দিন সকালে আমি ঠাকুদ্দার সঙ্গে ডিস্‌পেন্সারিতে আমার কী ছোটো অসুখ হ'য়েছে তাই দেখাতে গিয়েছি, ক্ষীরোদবাবু যথারীতি নাড়ি টিপে, জিভ দেখে, পেট টিপে ঠাকুদ্দাকে রোগের বিষয়ে জিগ্‌গেস ক'রে আমার ওষুধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখতে আরম্ভ ক'রেছেন, তিনি এক তক্তপোষের উপরে তাঁর চেয়ারে ব'সে সামনের টেবিলে লিখছেন, আমার খেয়াল হ'ল—আমি একটু উঁচু হ'য়ে তিনি কী লিখছেন দেখবো—অবশ্য কিছুই বুঝবো না। ক্ষীরোদবাবু আমাকে দেখে ব'ললেন, "খোকা, কী দেখতে চাও? ওখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে পারছ না?" আমি ভালো ক'রে দেখতে পারছিলুম না। তখন তিনি ব'ললেন, দূরে দেয়ালে বড়ো ঘড়ি ছিল—"দেখে বলো তো, কটা বেজেছে?" সাধারণ চোখ থাকলে আমার দেখতে পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি পারলুম না। তখন তিনি আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে নিজের হাত একটু উঁচুতে তুলে ব'ল্‌লেন, "দেখতে পাচ্ছ, কটা আঙুল?" ঠিকমতো না পারায় একখানা বই খুলে তাঁর সামনে দূরে কাছে ধ'রে দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা ক'রলেন, তার পরে মুখ গম্ভীর ক'রে ব'ললেন, "খোকা, তোমার বয়স কত?" ঠাকুদ্দাকে ডেকে ব'ললেন, "চাটুজ্জে মশাই, আপনার নাতির দেখছি জোর Myopia, দূরে দেখ্‌বার শক্তি কম, আপনি এখনি কোনও ভালো চোখের ডাক্তারের কাছে ওর চোখ দেখান, আর ইস্কুলে পড়াশুনো বন্ধ ক'রে দিন—চোখ ওর নইলে বড্ড খারাপ হ'য়ে যাবে।" "পড়াশুনো বন্ধ ক'রে দিন—নইলে ওর চোখ বড্ড খারাপ হ'য়ে যাবে"—দুটো কথা তখনি আমার বুকে যেন শেলের মতন বিঁধতে লাগল। পড়াশুনো ছবি-আঁকা সব বন্ধ হ'য়ে যাবে? তবে কি আমি অন্ধ হ'য়ে যাবো? তা হ'লে বেঁচে থেকে কী লাভ? ভয়ানক ভয় হ'ল মনে, কান্না পেতে লাগ্‌ল।[১০]

ঠাকুদ্দা আশ্বাস দিয়ে হাত ধ'রে বাড়ি নিয়ে গেলেন। সব শুনে, ঠাকুমা আর মা বিশেষ ক'রে বিচলিত হ'য়ে প'ড়লেন। সন্ধ্যের পরে বাবা আপিস থেকে আসতে, ঠাকুদ্দার কাছে ক্ষীরোদ ডাক্তারের কথা শুনে বাবা আমাকে অভয় দিয়ে ব'ললেন, স্নেহের সঙ্গে আমাদের "শূয়ার" ব'লে ডাকতেন—"শূয়ার, এর

জন্য কী হ'য়েছে ? ক'লকাতার সব-চেয়ে ভালো ডাক্তারকে দিয়ে দেখাবে:— বড়ো জোর একজোড়া চশমা তোকে প'রতে হবে। এমনি কত ছেলের চোখ ভালো থাকে না। তবে বুড়ো বয়সে না হ'য়ে ছেলে-বয়সে চশমা—এর জন্য তোকে ঠাট্টাঠুট্টি ক'রবে তোর ইস্কুলে—এই যা।” তার পরে ব'ললেন, তখনকার দিনে ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু বাঙালী আর ভারতীয়দের মধ্যে সব-চেয়ে নাম-করা চোখের ডাক্তার হ'য়েছিলেন : খেঙরাপটিতে বটকৃষ্ট পালের বিখ্যাত ওষুধের দোকানে তিনি তখন ব'সতেন, নিজের বাড়িতেও রোগী দেখতেন—ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্রের বাবা প্রসন্নকুমার বসু টারনার মরিসন কোম্পানির আপিসে বাবার সহকর্মী ছিলেন, বিশেষ মিত্র ছিলেন, তাঁর কথায় আমার চিকিৎসার বেশ ভালো ব্যবস্থাই হবে। এ-সব কথা শুনে মনে একটু সাহস হ'ল। তার পরে যথাকালে কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় অতি যত্ন ক'রে চোখ দেখে চশমা দিলেন, একেবারে মাইনাস্ চারের শক্তির চশমা, বয়সের পক্ষে একটু বেশি খারাপ বটে। তখন আমার বয়স আট কি নয়। তখন থেকেই চশমা আমার দেহের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক, বয়সের সঙ্গে, কতকটা নিজের গাফিলতির জন্যও বটে, মাইওপিয়া বা দৃষ্টিক্ষীণতা বেড়েই চলল —সপ্তম শ্রেণী minus 4, পঞ্চম শ্রেণী minus 5·5, এণ্ট্রান্স পাস ক'রে minus 6·5, তার পরে বি-এ ক্লাসে প'ড়তে প'ড়তে প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে ফুটবল খেলতে খেলতে খুব জোরে ফুটবল বাঁ চোখে এসে লাগে—কয় মাস ধ'রে চোখে ভীষণ ব্যথা ছিল, বকুনি খাবার ভয়ে সে বিষয়ে বাবাকে কিছুই বলি নি। তাতে ঐ চোখের power আরও বেড়ে যায়—চোখটাও যেন কেমন একটু ছোটো হ'য়ে যায়—[বাঁ] চোখের power হয় minus 12, আর ডান চোখের minus 9। এম-এ পাস করার সময় দুই চোখের অবস্থা ছিল minus 9 (ডান চোখে) আর minus 12 (বাঁ চোখে)। এ সত্ত্বেও ভালোভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হ'য়ে যাই, আর সব-চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, ভাগ্যের কথা, এর পরে চোখ আরও কিছুটা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও আমি ঐ প্রায় আধ-কানা চোখ নিয়ে ভারত সরকারের কাছ থেকে ইউরোপে গিয়ে দুই বছরের জন্য (পরে তিন বছরের জন্য) সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করবার জন্য বৃত্তি পাই, আর তাতে ক'রে দু বছর লণ্ডনে এক বছর প্যারিসে কাটাতে পারি, ইউরোপের কতকগুলি দেশ দেখতে পারি (যেমন জরমানি, ইটালি, গ্রীস), আর লণ্ডন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর-অভ-লিটারেচার হ'য়ে ফিরে আসতে পারি। এই ব্যাপার অতি সহজ সোজা ভাবেই হ'য়েছিল, এতে কোনও বাঁকা পথ অনুসরণ ক'রতে মিথ্যাচার ক'রতে হয় নি। পরে এ প্রসঙ্গে আবার আসবো। আট বছর বয়সে যখন জানলুম, আমার চোখ এত খারাপ যে পড়াশুনা বন্ধ ক'রতে হ'তে পারে, তখন আত্মহত্যার কথা, ছেলে মনে, ভেবেছিলুম। আর এখন তো এই অর্ধান্ধ অক্ষি নিয়ে জীবনের ৮৬ বৎসর কাটিয়ে দিলুম—নিজের জীবনকে ভালো-মন্দ সু-কু দুই নিয়ে তো কেউ কর্মবিরল ব'লবে না—কিন্তু কী ক'রে সম্ভব হ'ল? আমি তো জানি না— কিছু জান্‌তে পার্‌লুমও না, এ জীবনে জানা যায়-ও না। তৎ সৎ—মৃত্যুর পরে কি এ রহস্যের সমাধান হবে? যাই হোক, সেই অজ্ঞাত যদি কিছু থাকে যার ব্যবস্থায় এই সব হ'চ্ছে—তার প্রতি নিঃশেষ কৃতজ্ঞতা।

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

মোতী শীলের ফ্রী ইস্কুলে ১৮৯৯ সালে ঠন্ঠনের দোয়ারী দত্ত মহাশয়ের ছেলে বাবার বন্ধু প্রিয়লাল দত্তের একটু সুপারিশে আমরা দুই ভাই তো ভর্তি হ'লুম। আমাদের পড়াশুনা ভালোই চ'লত। ক্লাসে আমি প্রথম থেকে "ফার্স্ট বয়" হ'য়ে গেলুম। প্রায় গোড়া থেকেই, অষ্টম কি সপ্তম শ্রেণীতে যখন পড়ি তখন থেকেই, চশমা নিতে হ'ল। ক্লাসে ছেলেরা ঠাট্টা ক'রতো, কেউ বা কাগজের চশমা প'রে আমাকে ভেঙ্‌চাত, যেন আমার চশমা শখের চশমা। মনে মনে ভারি রাগ হ'ত, কিন্তু উপায় ছিল না। এরই মধ্যে জীবনের উপরে প্রথম মৃত্যুর আঘাত এসে প'ড়ল—১৯০২ সালে ১০ই এপ্রিল (২৭ চৈত্র ১৩০৮ সাল, শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া রাত ১১টায়) নিতান্ত অনাশঙ্কিত ভাবে আমাদের বাড়িকে ছন্নছাড়া হতশ্রী ক'রে দিয়ে গেল, বাবা ঠাকুরদা ঠাকুরমা আমরা চার ভাই দুই বোন সকলকেই যেন আশ্রয়হীন ক'রে দিয়ে গেল মায়ের আকস্মিক মৃত্যু। প্লেগ ব্যাধি মহামারী রূপে দেখা না দিলেও, তখন যে চুপিসাড়ে ক'লকাতার শহরে তার নিঃশব্দ পদচারণ শুরু ক'রেছে তা কে জানত? দুই দিনের প্লেগের আক্রমণে মা আমাদের তাঁর নিজের হাতে গড়া বুকের মধ্যে রক্ষা করা সংসার ছেড়ে, সজ্ঞানে চ'লে গেলেন। এক মঙ্গলবারে তাঁর সামান্য জ্বর হয়, বুধবার সেই জ্বর বাড়ে, ডাক্তার ডাকা হয়, ডাক্তার বিশেষ কিছু বলেন না, মুখ ভার ক'রে চ'লে যান। মা যেন বুঝতে পারেন তাঁর ডাক এসেছে, বাড়ির বৌ, ঠাকুমাকে

ডেকে ব'ললেন, "মা, মনে হ'চ্ছে আমি আর উঠবো না। কাল বেস্পতিবার, বাড়িতে লক্ষ্মীপূজো, কী হবে, কোনও দিন তো এই লক্ষ্মীপূজো বন্ধ হয় নি, তার ব্যবস্থা কে ক'রবে?" বাড়িতে প্রত্যেক লক্ষ্মীপূজোর দিন মা নিয়মমতো উপোস ক'রে লক্ষ্মীপূজো করাতেন পুরুত ডেকে। একেবারে শয্যাশায়ী, বুঝতে পারলেন আর উঠতে পারবেন না, পূজা বন্ধ থাকায় বাড়ির অকল্যাণ হবে এই চিন্তা-ই যেন মাকে কাতর ক'রে তুল্‌ল। ঠাকুমা মায়ের শিয়রে ব'সে মাথায় হাত দিয়ে আশ্বাস দিলেন, কিচ্ছু ক্ষতি হবে না, কিন্তু মায়ের চোখে জল থামে না। এদিকে ডাক্তারের কথা শুনে বাবাও বিচলিত হ'য়ে প'ড়েছেন—পাশের ঘরে তক্তপোষের উপরে দাদা উপুড় হ'য়ে শুয়ে কাঁদ্‌ছে।—মাকে আমরা ঠাকুমার দেওয়া ডাকনাম ধ'রে "মা" না ব'লে "বৌমা" ব'লতুম—বাবা জিজ্ঞেস ক'রলেন, "কী হয়েছে রে? কাঁদছিস কেন?" দাদা ফোঁপাতে ফোঁপাতে ব'ললে, "ডাক্তারবাবু ব'লে গেছে বৌমা বাঁচ্‌বে না—চ'লে যাবে—বৌমাকে আর দেখতে পাবো না।" বাবা কখনও আপিস কামাই ক'রতেন না। বুধবার দিনও বোধ হয় আপিস গিয়েছিলেন, সেদিন আশঙ্কার কথা জানেন নি। বৃহস্পতিবার দিনও তিনি আপিস যাবার কথা বোধ হয় ভাবছিলেন—মা বুঝতে পেরে মিনতির সঙ্গে ব'লেছিলেন—"দেখ, আজকের দিনটা ভালো মনে হ'চ্ছে না, হয়তো আজকের মধ্যেই জীবন শেষ হ'য়ে যাবে—আজ আর বাইরে যেও না, আজকের দিনটা তুমি কাছে থাকো।" বাবার আপিসে জরুরি কাজ—বড়ো আপিসের confidential clerk—মনের মধ্যে দোটানা অবস্থা খানিকক্ষণ ছিল, তবে তিনি বাড়িতেই থাকবেন স্থির ক'রলেন। তবে আপিসে কর্তাদের চিঠি লিখে জানাবেন ঠিক হ'ল যে ঐ দিন তিনি আপিসে যাবেন না—বাড়িতে স্ত্রীর অত্যন্ত সঙ্গীন অসুখ। একখানা চিঠি লিখে দিলেন, আমার উপর ভার প'ড়ল, ট্রামে ক'রে আমি লালদীঘীর উত্তরের রাস্তা লায়ন্‌স রেঞ্জ-এ বাবার আপিসে গিয়ে, বড়ো সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে চিঠিখানা দিয়ে আস্‌বো। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা এগারোটা, চিঠি নিয়ে গেলুম। বাবার সহকর্মীরা আপিসের দরওয়ানেরা বাবাকে খুব ভালোবাস্‌ত, আমাকে দেখে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ ক'রতে লাগল, একজন বড়ো কেরানি আমাকে বড়ো সাহেবের সঙ্গে দেখা করাতে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। বড়ো সাহেবের নাম ছিল Mr. Profytt প্রফিট্, তিনি, আর Mr. Price প্রাইস্, দুজনে ব'সে

ছিলেন। আমি গিয়েই চিঠিখানি দিয়ে ব'ললুম, Sir, I am Babu Haridas Chatterji's son. চিঠিখানি নিয়ে প'ড়ে সাহেব স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, What's wrong with your mother, my boy ? একটা অজানা ভয় তখন আমার মনে এসে প'ড়ল, Sir, she is going to die—she has got plague. তার পরে বোধ হয় আমার চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। সাহেব আমার কাঁধে হাত দিয়ে ব'ললেন, Don't cry, my boy ; she will be all right. Tell your father not to come to office now. তার পরে আমি বেরিয়ে এলুম কেরানিবাবুটির সঙ্গে। সিঁড়ি দিয়ে নামবো, এমন সময়ে বেহারা এসে ব'ললে, "খোকা বাবু, এসো, সাহেব তোমায় ডাক্‌চে।" কী ব্যাপার—ঘরে ঢুকলুম—ছুই সাহেবই টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ব'সে। আমায় দেখে বড়ো সাহেব ব'ললেন—Look here, my boy, when you grow up, you will come and work in your father's office, eh ? আমি আর কী ব'লবো—খালি Thank you sir, yes. ব'লে চ'লে এলুম। তার পরে, আপিসের বাবুরা ঘিরে জিজ্ঞেস ক'রতে লাগলেন, বড়ো সাহেব কী ব'ললে ? আমি কোনও রকমে বেরিয়ে প'ড়ে লালদীঘীতে এসে শ্যামবাজারের ট্রামে (দু'ঘোড়ার ট্রামে) উঠে ব'স্‌লুম—বাড়িতে মায়ের কী অবস্থা তা জানবার জন্য মন আনচান ক'রছে। সেদিন বাড়িতে হাঁড়ি না চড়্‌বার মতো অবস্থা। দিদিমা, মামারা, মাসিদের দুই একজন, ছোট পিসি, সব এসে প'ড়্‌লেন। মামার বাড়ি থেকে এক ঠানদিদি, রাঙা দিদি, এলেন, তিনি দাল ভাত চড়িয়ে দিয়ে সকলকে খাইয়ে দিলেন। বাবার মামা, পাড়ায় থাকতেন, তিনি এসে ঠাকুদ্দার সঙ্গে জল্পনা ক'রতে লাগ্‌লেন। ডাক্তারের ওষুধের অত হাঙ্গামা তখনকার দিনে ছিল না। কাপড়ের পুঁটুলি ক'রে বরফ দেওয়া হ'তে লাগল। সন্ধ্যের দিকে মা বাবাকে ডেকে ব'ললেন, "দেখ, আমি যাচ্ছি, এখন লজ্জা ক'রো না গুরুজনেরা র'য়েছেন ব'লে, আমার শিয়রে তুমি ব'সো, আমার গায়ে তোমার হাত রাখো, আমি এই ভাবেই বিদায় নিই।" রাত্রি দশটার দিকে শেষ শ্বাসের লক্ষণ। তখনকার যেমন বিশ্বাস ছিল, খাটের উপরে শুয়ে ম'রতে নাই, মাকে পাঁজা-কোলা ক'রে খাট থেকে নামিয়ে বাইরের বারান্দার মেঝের উপরে কম্বল পেতে শোয়ানো হ'ল। সেইখানেই ধীরে ধীরে সব শেষ।

দুই বোন, বড়ো জীবনচণ্ডী ও ছোটো জীবনতারা, চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। বাবা চুপ ক'রে বোধ হয় মায়ের মাথা কোলে নিয়ে ব'সে রইলেন। দিদিমা, ঠাকুমা, মাসিরা সকলে কলরব ক'রে কেঁদে উঠলেন। এই ভাবে ঘণ্টাখানেক গেল। বাবার মামা ভুবন রাঙা দাদা আর পাড়ার দু চারজন শ্মশান-যাত্রার আয়োজন ক'রলেন। খাট আনা হ'ল। "বলো হরি হরি বোল" ধ্বনি শুনে আমাদের মনে কী রকম আতঙ্কের ভাব এল, ছোটো বোন তিন বছরের মেয়ে তারা চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল—"ও বৌমা, তুমি চ'লে যাচ্ছো, কে আমাকে খাইয়ে দেবে, জামা পরিয়ে দেবে।" ঠিক হ'ল, মুখাগ্নি করবার জন্য বড়ো ছেলে ব'লে দাদা সঙ্গে যাবে, আমায় যেতে বারণ ক'রলে। বাবা গেলেন।

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

ঠাকুমাই বেরুলেন, তারস্বরে কাঁদতে কাঁদতে একটা ঘটিতে গোবর-জল নিয়ে গোবর-জলের ছড়া দিয়ে তাঁর প্রাণসম প্রিয়, কন্যার চেয়েও বেশি পুত্রবধূর মৃত দেহের অপবিত্র স্পর্শ থেকে বাড়ি ঘর দোয়ারকে মুক্ত করার জন্য মৃত্যুর স্থান থেকে সদর রাস্তা পর্য্যন্ত এলেন, শোকে অবসাদে ঠাকুমা যেন চ'লতে পারছেন না, পায়ে পায়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছে, তাঁর কাতর কান্নার আওয়াজ এখনও যেন এই ৭৫ বছর পরেও কানে বাজ্‌ছে, "ওরে আমাদের কী হ'ল রে—এই লক্ষ্মীপূজোয় সোনার লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে কোথায় চ'ল্‌ল রে।" রাত্তিরে সকলেই মুহ্যমান হ'য়ে আধঘুম অবস্থায় রইলুম, ভোরের দিকে দিদিমণি (বড়ো বোন) ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ককিয়ে কেঁদে উঠ্‌লেন—"ও মা, এতক্ষণে তোমার সোনার দেহ ছাই হ'য়ে গেল মা।"

অশৌচের ক' দিন মোহাবিষ্টের মতো কাট্‌ল। দিদিমা, মাসিরা, ছোটো পিসিমা রোজ আস্‌তেন, আমাদের কয় ভাইয়ের হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা ক'র্‌তেন। রাত্রে দশ দিন কেবল ফল আর ছানা খেতে হ'ত। মায়ের বড্ড ভয় ছিল ঋণকে—তিনি নাকি ব'লতেন, টাকা না থাকলে ধার ক'রে শ্রাদ্ধশান্তি করা লোক খাওয়ানোর কোনও দরকার নেই। তিনি ব'লতেন, কারো কাছে হাত পেতে ধার ক'রে খাবো না—যদি চা'লের অভাবে বাড়িতে হাঁড়ি না চড়ে, পড়শীদের জান্‌তে দেবো না—পাতা জেলে খড় কুটো জেলে রান্নাঘরে ধোঁয়া ক'রবো, লোকে জানুক, বাড়িতে রান্না হ'চ্ছে। সামান্য টাকা বাবার হাতে যা ছিল, ঐ

দুই দিনের কালব্যাধিতে সব খরচ হ'য়ে গেল—বাবার হাত খালি। মায়ের মৃত্যুতে যেন একটা সংসার ভাঙ্‌ল, শোকের ব্যাপার, হিন্দুস্থানীতে যাকে বলে "গমী" অর্থাৎ শোকের ছায়া সব কিছু যেন ঢেকে দিয়েছে। যে কয়টি—৮।১০টি আত্মীয় শ্মশানবন্ধু হ'য়েছিলেন, কাঁধ দিয়ে শবদেহ নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদেরই আর বারোটি সদ্ ব্রাহ্মণকে সামান্য "জলপান" করানোও হ'ল না—অর্থাৎ নিরামিষ লুচি তরকারি দাল চাট্‌নি দই মিষ্টি খাওয়ানো হ'ল না, এঁদের সকলকে "ফলার" করানো হ'ল—অর্থাৎ চিঁড়া দই মুড়কি সন্দেশ ফল খাওয়ানো হ'ল—সঙ্গে চার আনা ক'রে দক্ষিণা। গরিবের বা নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘরে ব্রাহ্মণ-ভোজনে এই রকম ফলার তখনও অপ্রচলিত হয় নি। এইভাবে নমোনমঃ ক'রে মা'য়ের শ্রাদ্ধের সমাপন হ'ল। পরে অবস্থা একটু স্বচ্ছল হওয়ায় দাদা যখন মায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধে লুচি তরকারি দই সন্দেশ দিয়ে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতেন, তখন এই পুরাতন দুঃখের দিনের কথা মনে রেখে সঙ্গে সঙ্গে চিঁড়ে মুড়কি দইও খাওয়ানো হ'ত।

মায়ের মৃত্যুর পরে দিদিমা আমাদের ভাইবোনদের কয়েক দিনের জন্য মামার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পরে পিসিমা বাবাকে আর আমাদের গড়পার রোডে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মাস খানেকের জন্য রাখলেন। একটা বড়ো ঘরে আমরা শুতাম। রাত্রে বহুদিন বাবা কাঁদছেন দেখেছি। সকলে আবার বাড়ি ফিরে এলুম। ৫।৬টি ছেলেমেয়ের সংসার—বাবার আপিস, সকাল সাড়ে আটটার সময় ভাত খেয়ে তাঁকে বেরোতে হয়, তাঁর খাওয়ার ব্যবস্থা, আমাদের দেখাশুনো, এ সব করে কে? বুড়ো ঠাকুমা জরাজীর্ণ, শরীরে তাঁর বয় না, তিনিই কোনও ক্রমে সংসারের ভার টেনে নিয়ে চ'লেছেন। রাঁধুনী বামুন রাখ্‌বার, একজন ঝী বা চাকর রাখবার কথা হ'ল। বাবার মাইনেতে কুলোয় না। দিদিমা পরামর্শ দিলেন, মায়ের ২।৪খানি সোনার গয়না যা ছিল সেগুলি বেচে উপরে দোতলায় দু'খানা পাকা ঘর, আর একতলায় পাকা হলঘর বা দালান করা হ'ল। কাশী জেলায় বাড়ি, মুসলমান মিস্ত্রি গৌসী বা গোসী তার নাম ছিল, সে এই উনিশ শ' তিন কি চার সালে ঘর তিনখানা করে। এমন চমৎকার দরদী খাঁটি মানুষ ছিল এই মুসলমান গৌসী মিস্ত্রি, সে যেন বাড়ির মানুষই হ'য়ে গিয়েছিল, সুখে দুঃখে বরাবরই ছিল যেন নিকট-আত্মীয়—তার বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত তার সঙ্গে আমাদের যোগ ছিল। ১৯৩৩ সালে যখন বুড়ো

হ'য়ে গিয়েছে, তাকে ডাকা হ'ল, বালিগঞ্জে হিন্দুস্থান পার্কে আমার নোতুন বাড়ি তৈরি হবে, তার ভিৎ পত্তন তাকে ক'রতে হবে—কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো মানুষ এল, হাতে কর্নিক কাঁপছে—নোতুন ধুতি চাদর প'রে তার কাজ যা করবার তা ক'রলে, আর আমার স্বর্গতা মায়ের কথা ব'লে দু ফোঁটা চোখের জলও ফেললে, তার আল্লার কাছে আমাদের জন্য মোনাজাত ক'রে গেল। মায়ের কথা ভেবে আমারও চোখে জল এল।—যাক্, দোতলার এই ঘর দু'খানা হওয়ায় ঠিক হ'ল, নীচের তলাটা ভাড়া দেওয়া যাক্—নীচের চারখানা ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি। তা থেকে কিছুটা সাশ্রয় হবে। তখন একটি আপিসের কেরানি বাবুদের মেসের জন্য জন ছয় সাত কেরানি বাবু ভাড়া নিলেন। নির্বিরোধ সজ্জন ব্যক্তি, শান্তিতে থাকতেন, আমাদের নিয়মমতো ২৫ না ৩০ টাকা ক'রে ভাড়া দিতেন। এঁদের মধ্যে একটি বি-এ ক্লাসের কলেজের ছাত্রও ছিলেন, তিনি মাঝে মাঝে কালিদাসের মেঘদূতের শ্লোক মুখে মুখে ব্যাখ্যা ক'রে আমাদের শোনাতেন। ইনি ছাড়া আর যাঁরা ছিলেন, সকলেই অতি সজ্জন, সদালাপী, দরদী ব্যক্তি, এঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি—বিশেষতঃ দুই ভাই ছিলেন চণ্ডীচরণ ঘোষ আর ভবানীচরণ ঘোষ, আর একজন ছিলেন বিধুভূষণ রায়। বহু কাল হ'ল এঁরা গত হ'য়েছেন, কিন্তু এঁদের সৌজন্য ভোলবার নয়।

এইভাবেই চ'ল্ল। আমাদের ভাইবোনকে দেখবার জন্য ব্যবস্থা হ'ল, আমার বড়ো পিসিমা—তিনি বহু দিন হ'ল গত হ'য়েছেন, তাঁর এক ছেলে আমাদের ফণী দাদা, যিনি অল্প বয়সেই মারা যান, তাঁর বিধবা স্ত্রী ক'লকাতায় বাপের বাড়িতে থাকতেন, আমাদের এই বৌদিদি আমাদের বাড়িতে এসে থাকবেন। তিনি এসে, ছিলেন-ও মাস দুই—আপন দেওরের, ননদের মতোই আমাদের খুবই যত্ন ক'রতেন। ভালো পরিবারের মেয়ে, তাঁকে আমরা খুবই শ্রদ্ধা ক'রতুম সমীহ ক'রতুম—কিন্তু এই পরিবারের বোঝা তাঁকে দিয়ে বহানো উচিত হয় না—তাঁর নিজের মা আর ভাইদের কাছেই থাকা উচিত—শ্বশুর-বাড়ির প্রতি কর্তব্য মনে ক'রে তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন—তাঁর এই উদারতার উপর উৎপীড়ন ঠিক হয় না, তিনি নিজের বাপের বাড়িতেই চ'লে গেলেন। কিন্তু আমাদের বাড়ি, মা না থাকায়, হ'ল লক্ষ্মীছাড়া বাড়ি। বাড়িতে গৃহলক্ষ্মীর অভাব সবাই অনুভব করে।

এইভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। এণ্ট্রান্স পাস ক'রলুম [১৯০৭]। দাদা

তখন ইস্কুলেই প'ড়ছে। এদিকে, মায়ের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই, বাবার হিতৈষী আত্মীয় বন্ধুরা কেউ-কেউ বাবাকে উপদেশ দিতে লাগল—তোমার এমন কী বয়স হ'য়েছে, তুমি আবার বিবাহ করো। বাবা শুনতেন, মৃদু মৃদু হাসতেন, আর ব'ল্‌তেন, "হাঁ, দরকার মনে হ'লে ক'রবো বই কি। তবে এখন কিছু কাল যাক্।" এতে আমার দিদিমা একটু বিচলিত হ'য়ে প'ড়লেন। বাড়িতে একটি বৌ থাকা চাই। তাঁরই আগ্রহ আর চেষ্টায়, ইস্কুলের উচ্চ শ্রেণীর পড়ুয়া দাদার বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল,—শিবপুরে দিদিমাদেরই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মেয়ে দাক্ষায়ণী দেবীর সঙ্গে দাদার বিয়ে হ'য়ে গেল। আমরাও খুশি হ'লুম। আর একটি কুটুম্বিতার সূত্র দিয়ে দিদিমা শিবপুরের সঙ্গে চালতাবাগানের চাটুজ্যে পরিবারকে বাঁধ্‌লেন।

বাবার কাছে কিন্তু মায়ের স্মৃতি মুছে তো যায়-ই নি, বরং আরও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ছে। মায়ের কথা স্মরণ ক'রে, বিশেষ ক'রে তাঁর শেষ দুদিনের কালব্যাধির সমস্ত খুঁটিনাটি মনে এনে, তিনি গদ্যে পদ্যে মিলিয়ে মায়ের উদ্দেশে একখানি অতি মর্মস্পর্শী স্মরণিকা লেখেন। তাতে আমাদের সংসারের কথাও আছে, আমাদেরও কথা কিছু কিছু আছে, আর মায়ের কথাও আছে। মায়ের প্রতি বাবার মনে কী গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা ছিল, শেষ দুদিনের ব্যাধির কথায় বাবা তা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। হৃদয়ের ভাষা, সরল, সহজবোধ্য, আমাদের কাছে তা অমূল্য। এই ক্ষুদ্র বইখানি ছাপিয়ে তিনি আত্মীয় আর মিত্রদের মধ্যে বিতরণ করেন। এঁদের মধ্যে অনেক নামী লোক, সাহিত্যিকও ছিলেন। অনেকেই তাঁদের মনের ভাব—বইখানির সরল অকপট ভাবসম্পুট যে তাঁদের মুগ্ধ ক'রেছে, বিশেষভাবে বিচলিত ক'রেছে, তা তাঁরা জানান। এইরূপ কতকগুলি চিঠিও বাবা পরে বইখানির শেষে পৃথক ভাবে ছাপিয়ে দেন। তার মধ্যে, অগ্রজকল্প নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বরেণ্য প্রমথ চৌধুরী মহাশয় দু'জনের উক্তি বিশেষভাবে মনে প'ড়ছে।*

---

* এই বইখানি এক খণ্ড আমি অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে দেখেছি, তিনি আমাকে প'ড়তে দিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বইখানি তিনি আবার ছাপবেন। বর্তমানে এ বইখানি আছে "সুধর্মা" ভবনে সুনীতিকুমারের পুত্র শ্রীসুমনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। সহধর্মিণী কমলা দেবীর পরলোকগমনের পরে সুনীতিকুমারও এমনি একখানি বই প্রকাশ করেন—*In Memoriam : Kamala Devi* (*1900-1964*), Calcutta, 1965.—অ।

এইভাবে বাবা বন্ধুদের অনুরোধ বা উপদেশ, যে তুমি আবার বিয়ে করো, পালন ক'রছেন, ওদিকে তখন ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে পড়ি, আমার এক সহপাঠী আমারই মতো বয়স, ১৬।১৭ বছর, তার মা মারা যান। আমার মা চ'লে যান আমি তখন ১২ বছরের। বন্ধুটির আরও চার পাঁচটি ভাই বোন, তার বাবার বয়স ৪০-এর উপর হবে। ছয় মাস যেতে না যেতেই তিনি আবার বিয়ে ক'রে, আমার বন্ধুটি আর তার ভাইবোনদের জন্য প্রায় বন্ধুটিরই বয়সের নোতুন মা নিয়ে এলেন। শুনে, আমাদের মন পিতৃগর্বে ফুলে উঠ্‌ল—এই আমাদের বাবা, মায়ের সম্বন্ধে এক-নিষ্ঠ। আমরা যখন আমাদের বেশি বয়সেও—যখন আমরা ৫০-এর কাছাকাছি—মায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ ক'রতে ব'সতুম, বাবা সেখানে থাকলে তাঁর চোখে জল দেখ্‌তুম। সাধ্বী ভাগ্যবতী মা আমার, আমাদের জন্যও তুমি কী ক'রে গিয়েছ তা ভেবেও কোটি কোটি প্রণাম তোমার উদ্দেশে নিবেদন করি, তাতেও যেন তৃপ্তি হয় না।

২২।৯।৭৬

মানুষের জীবনের পিছনে তার পূর্বে আর তার অবসানে কী আছে কিছুই জানি না—মানুষের পক্ষে এই জীবনে তা জানাও সম্ভব নয়। অজ্ঞেয়-বাদী আমি, নাস্তিক নই।—একটা বিরাট্ সত্তার মধ্যে আমরা সকলেই সব কিছু নিয়ে আছি, এইরকম একটা বোধ মনের মধ্যে দেখা দেয়। কিন্তু মা বাবা ঠাকুদ্দা ঠাকুমার স্মৃতি ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যে একটা বড়ো জিনিস। এই জন্যই Balzac-এর "নাস্তিকের পূজা" গল্পের মতন, আমি তাঁদের কথা ভেবে বছরের মধ্যে চোদ্দদিন পিতৃপক্ষে তাঁদের তর্পণটা ক'রে আস্‌ছি—তাঁরা আছেন কি নেই, থাকলে পরে কোথায় কিভাবে আছেন তা জানি না। এই তর্পণের জলে (আর শ্রাদ্ধের যবের ছাতুর বা ভাতের পিণ্ডিতে) তাঁদের তৃষ্ণা নিবারণ হবে (আর ক্ষুধার শান্তি হবে), এই বিশ্বাস বা কল্পনা আমার নেই। কিন্তু তর্পণ করি, শ্রাদ্ধের দিন তাঁদের কথা একটু ভাবি, তাঁদের উদ্দেশে প্রণাম করি, এইটাই আমার পক্ষে মস্ত বড়ো লাভ, এই তর্পণের সময়ে তাঁদের কথা ভেবে তাঁদের প্রণাম ক'রে চোখ জলে ভ'রে যায়, তাঁদের যেন প্রত্যক্ষ দেখি। এই-ভাবে তাঁদের সঙ্গে বছরে একটা সময়ে যোগ কল্পনা করা—এ থেকে যেটুকু আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায়, তা থেকে কেন নিজেকে বঞ্চিত করি ?

এইভাবে বাল্যকাল কাটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। ইস্কুলের পড়া ভালোই চ'লছে, YMCA Boys' Branch-এর লাইব্রেরি থেকে রুচি মতন নানা রকম বই পড়া যাচ্ছে, আর ছবি দেখা আর ছবি আঁকার আনন্দের উপলব্ধি নোতুন ভাবে হ'য়েছে।

২৭।৯।৭৬

জীবনে তিনটি বড়ো জিনিসের সঙ্গে সংস্পর্শ আর পরিচয় ঘটবার পরম সৌভাগ্য আমার হ'ল—(১) বিবেকানন্দের লেখা আর তাঁর বেদান্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে, (২) রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে, আর (৩) অবনীন্দ্রনাথের, আর রাজ-পুত মোগল আর কাংড়া শৈলীর চিত্রকলার সঙ্গে। তার কিছু পরে, কলেজে পড়বার সময়ে, গ্রীক ইতিহাস পাঠ্য থাকায়, গ্রীক শিল্পের সঙ্গে একটু পরিচয় ক'রে নেবার সৌভাগ্য হয়। প্রথমটির জন্য আমি ঋণী বন্ধুবর প্রভাতকুমার বর্ধনের কাছে, দ্বিতীয়টির জন্য সহপাঠী সুহৃদ্ গোরার (গৌরগোবিন্দ গুপ্তর) কাছে, আর তৃতীয়টি নিতান্তই অপ্রত্যাশিতভাবে আমার চোখের কাছে ধরা দেয় যেদিন YMCA Boys' Branch-এর ছেলেদের নিয়ে সেক্রেটারি Arthur Lefevre সাহেব আমাদের ক'লকাতা গভর্নমেণ্ট আর্ট ইস্কুলের ছবির গ্যালারি দেখিয়ে আনেন—তখন আমি ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, ইংরিজি ১৯০৩ সাল হবে। এই তিনটিকে আশ্রয় ক'রে (আর পরে গ্রীক ভাস্কর্য্য ও অন্য কলা দেখে*), আমার জীবনে সংস্কৃতি আর আধ্যাত্মিকতার সাধনার বোধ হয় সব-চেয়ে বড়ো পথ যেন আমার জন্য খুলে গেল। পড়াশুনো ক'রে যাচ্ছিলুম, এমনি গতানুগতিকভাবে। খুব বেশি "আঠা" বা আকর্ষণ ছিল না, পড়াশুনোর প্রতি; ইস্কুল-পাঠ্য বই সম্বন্ধে মোটেই বই-মুয়ো বা বই-মুখো ছিলুম না। যে রকম যেন প্রাণপাত ক'রে, "আদা-জল খেয়ে" আমার দুই-একজন গুরুস্থানীয় দাদাদের

---

* প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সময়ে ইংরিজি সাহিত্যের অধ্যাপক গ্রীক-প্রেমিক কবি মনোমোহন ঘোষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য শিল্পের প্রতি সুনীতিকুমারের প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে, এই সশ্রদ্ধ অনুরাগ তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এ বিষয়ে অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের প্রতি সুনীতিকুমার তাঁর কৃতজ্ঞতা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার ক'রেছেন (দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট', *Professor Manmohan Ghose*)।—অ।

আর ইস্কুলের অন্য ছাত্রদের প'ড়তে দেখতুম, সেটাতে আমার মন কিছুতে সায় দিত না। রাত জেগে "চোখে সরষের তেল দিয়ে", বা মাথায় টিকি থাকলে টিকিতে দড়ি বেঁধে দেয়ালে উঁচুতে গাঁথা পেরেকে সেই দড়ি আটকে যারা প'ড়ত, তাদের কথা তুলে ঠাট্টা ক'র্তুম। চোখে সরষের তেল দেওয়া মানে রাত্রে চোখ জ্বালা ক'রবে, ঘুম হবে না; আর দেয়ালের গায়ের পেরেকে টিকি বাঁধা থাক্‌লে প'ড়তে প'ড়তে ঘুমে ঢ'লে প'ড়লে মাথা ঢুলে যাবে, দড়ির ঝাঁকানিতে অমনি ঘুমের চট্‌কা ভেঙে যাবে। সারা বছর বাজে বই প'ড়ে সময় নষ্ট করে, পরীক্ষার মাসখানেক আগে একঠেসে পাঠ্য পুস্তকগুলো প'ড়ে ফেল্‌তুম, তাতেই পরীক্ষায় ভালো ক'রতুম। কিন্তু ভালো ফল ক'রবার যত্ন আকাঙ্ক্ষা বা তাগিদ ছিল না। শরীরটা ভালো ছিল, এক চোখ ছাড়া। একটু গুণ্ডা প্রকৃতির ছিলুম, সহপাঠীদের সঙ্গে ধাক্‌কাধুক্‌কি ক'রতুম খুব। ইস্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে আমিও যে একজন "ভালো ছেলের দলে" পৌছে গিয়েছি, সে খেয়াল ছিল না। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় যে ভালো ফল ক'রতে হবে আমায়, সে আগ্রহও ভিতর থেকে ছিল না। তবু মাষ্টার মশায়দের চেষ্টা ছিল, তাঁদের আশা ছিল যে আমি ভালোভাবে পাস ক'রে তাঁদের মুখ রক্ষা ক'রবো। তখন যেন মনে মনে একটু বিব্রত হ'য়ে প'ড়তুম। আমরা যে বছর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিই, সে বছরের সব-চেয়ে ভালো ছেলে ছিল দুর্গাদাস বাঁড়ুজ্জে, এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হয়। সে আর কালীধন চাটুজ্জে প্রভৃতি কতকগুলি, হেয়ার হিন্দু মিত্র ইন্‌ষ্টিট্যুশন প্রভৃতি কতকগুলি নামী ইস্কুলের, ভালো ছেলে পরীক্ষার পর গোলদীঘীতে অনেক দিন বিকালে বেড়াতে আস্‌ত, আমিও যেমন আস্‌তুম—পরীক্ষার ফল বেরোবার পূর্বে সকলে মিলে গোলদীঘীতে জল্পনা-কল্পনা ক'রতুম, কে কেমন লিখেছে, কী রকম ফল আশা করে। আমিও যোগ দিতুম, শুন্‌তুম, ভাব্‌তুম, আমিও কি পরীক্ষায় এদের মতন ভালোভাবে উতরাবার আশা ক'রতে পারি? পরে যখন ফল বা'র হ'ল, আমার পক্ষে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আমি প্রথম দশের মধ্যে যষ্ঠ স্থান পেয়ে আর ২০ টাকা মাসিক বৃত্তি পেয়ে ইস্কুল-জীবন সমাধা ক'রলুম। আমার মনে কিন্তু পরীক্ষার এই ভালো ফল হওয়ায় আনন্দ হ'য়েছিল, বাবা ঠাকুমা এঁদের আর ইস্কুলের মাষ্টার মশাইদের আনন্দ দেখে। ঠাকুদ্দা তার আগেই গত হ'য়েছেন। আত্মীয় হিতৈষীরা সকলেই ব'ললেন, "এ ছেলে নিশ্চয়ই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবে—যদি আইনের দিকে যায়, তা হ'লে হয়তো

হাইকোর্টের জজও হ'তে পারবে।" তখনকার দিনে ইংরেজের অধীন বাঙালী কেরানির ছেলের পক্ষে এর চেয়ে বেশি আর কী হওয়ার কথা ভাবা যায়? আমার মনে কিন্তু হ'ল, ভালো কলেজে এইবার প'ড়বো, যেখানে লাইব্রেরিতে অনেক বই আছে—মনের সুখে প'ড়বো। ইতিহাস, সংস্কৃত প'ড়বো, অন্য ভাষা শিখবো। আর সব-চেয়ে ভালো হ'ল, মাসে যে ২০ টাকা ক'রে স্কলারশিপ বা ছাত্রবৃত্তি পাবো, তাতে, বাবার কম মাইনের সংসার আমাদের, বাড়ির কিছু সাশ্রয় হ'বে, আমাকে কলেজে পড়াবার জন্য বাবাকে খরচের জন্য চিন্তা ক'রতে হবে না। সে সময়ে কলেজে ভর্তি হওয়া সহজ ছিল, যে পরীক্ষায় ভালো ক'রেছে, সে অক্লেশেই নানা সুযোগ পেত। আমাদের সুকিয়াস্ স্ট্রীটের বাড়ির খুব কাছেই হেদুয়া পুখুরের (কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের, বা আজাদ হিন্দ বাগের) সামনেই General Assembly's Institution জেনেরাল অ্যাসেম্‌ব্লিজ্ ইন্‌স্টিট্যুশন ব'লে স্কটলাণ্ডের মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত বেশ নামী কলেজ ছিল। পরে স্কচ মিশনারিদের আর একটি কলেজ Duff College, যেটি নিমতলা ঘাটের কাছে ছিল (পরে এই বাড়িটিতে এক সরকারি আদালত স্থাপিত হয়), আমাদের কলেজের সঙ্গে মিলে যায়, আমরা থাকতে থাকতেই এই দুই মিলিত কলেজের নাম হয় Scottish Churches College—তখন স্কটলাণ্ডের ধর্ম-সংস্থা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, সে দুটি পরে আবার মিলে এক হ'য়ে যায়, ক'লকাতায় তখন কলেজের নাম হয় Scottish Church College. সেখানে গিয়ে, আমার পরীক্ষার ফল বা'র হ'য়েছে, প্রথম বিভাগে পাস ক'রেছি, কিন্তু তখনও যে ষষ্ঠ হ'য়ে ২০ টাকার বৃত্তি পেয়েছি এ খবর বা'র হয় নি—আমি দরখাস্ত দিই, আমি প্রথম বিভাগে পাস ক'রে First Arts ক্লাসে ভর্তি হ'তে চাই, আমার মাইনে কিছু কম ক'রে দেওয়া হোক্, এই আমার প্রার্থনা। সঙ্গে-সঙ্গেই তা মঞ্জুর হয়, হাফ-ফ্রী হ'য়ে ভর্তি হই। পরে, কয় সপ্তাহ পরে যখন স্কলারশিপের খবর বেরুল, তখন প্রিন্সিপাল Lamb সাহেবের সঙ্গে গিয়ে দেখা ক'রতেই পূরো অবৈতনিক ছাত্র আমায় ক'রে দেওয়া হ'ল।

৪।২।৭৭

বহুত দিন পরে আবার জীবন-কথায় হাত দিচ্ছি—শেষ লেখার তারিখ ছিল দেখছি ২৭।৯।৭৬—সেপ্টেম্বর ১৯৭৬-এর শেষ সপ্তাহ—তার চার মাস পরে



Fig. 1

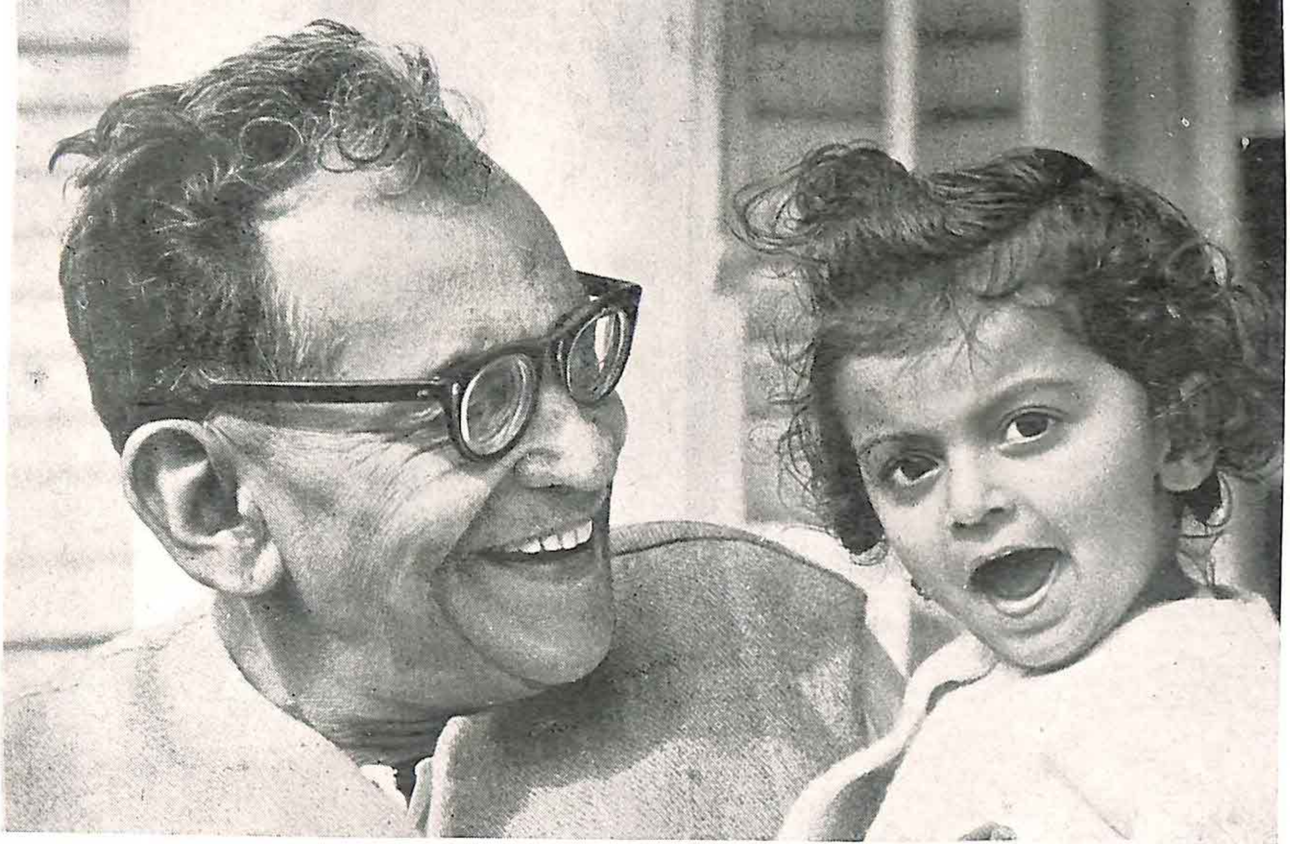


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 5



Fig. 4



Fig. 6



Fig. 7

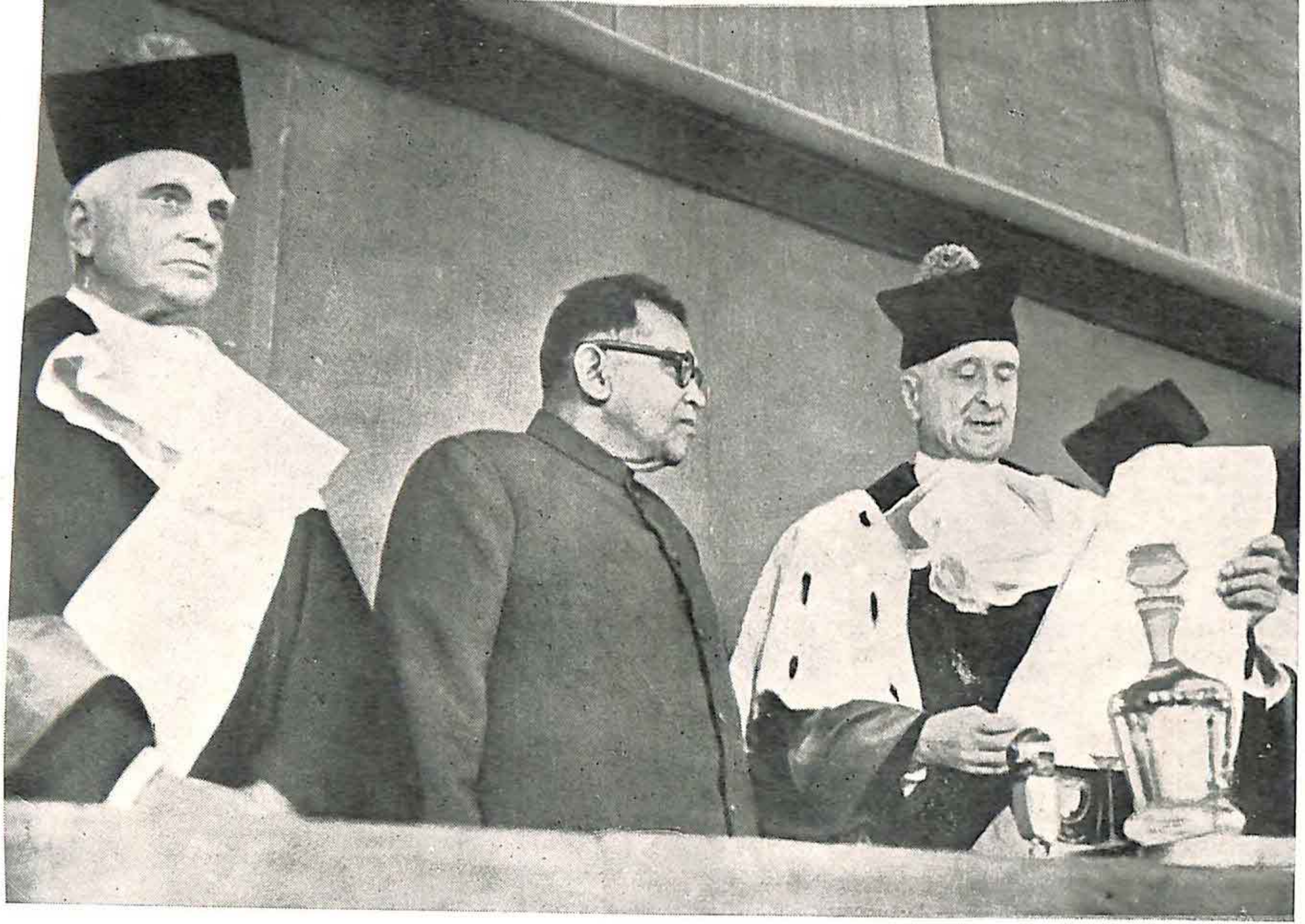


Fig. 8

ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭-এর চার তারিখে আবার ধ'রলুম। এর মধ্যে দু চোখের জ্যোতি ক'মেছে, বোধ হয় উত্তরোত্তর আরও ক'মে যাচ্ছে—ছানি প'ড়ছে—বিশ বছর ধ'রে প্রায় তাতে ডাক্তার পূর্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর দেওয়া eye-drops রাত্রে লাগিয়ে আসছি, তাতে সুশীল দে'র* উপকার হ'য়েছিল, সুশীলবাবুর কথায় পূর্ণেন্দুবাবুর চিকিৎসা গ্রহণ করি—উঠ্‌তি ছানি (হিন্দীতে বলে "মোতিয়া বিন্দ্"—সংস্কৃতে "তিমির-রোগ") আর প্রসার লাভ ক'রতে পারে নি—চোখের মধ্যেই মিলিয়ে যাচ্ছিল। এখন নূতন উপসর্গ—খুব ছোটো অক্ষরও খালি চোখে প'ড়তে পারি, কিন্তু সব যে ঝাপসা হ'য়ে আস্‌ছে। বেশিক্ষণ পড়তে পারি না, যদিও লিখে যেতে তেমন কষ্ট হয় না, হাত আন্দাজি আন্দাজি বেশ চলে—কিন্তু সব বিষয়ে এই স্বচ্ছন্দ পাঠের শক্তির অভাবে আর কিছু ভালো লাগে না, চেষ্টা ক'রেও স্থির লেখা পড়ার কাজে মন বসাতে পারা যাচ্ছে না। তবুও আব্‌ছা আব্‌ছা যা পারি পড়াশুনা, উপর-উপর ক'রে আস্‌ছি, নোতুন বই লাইব্রেরি থেকে নিচ্ছি, কিন্‌ছিও—যে Sacred Books of the East-এর ১২ খণ্ড†, গ্রীক লেখকদের ভারতবর্ণন‡ প্রায় ৩৫০ টাকার বই কিন্‌লুম, সেগুলি নিয়ে নাড়াচাড়াও ক'রছি, ছবি সংগ্রহও চ'লেছে—কবে যে, ডাক আসবে জানি না, তবে মনে প্রাণে চোখের এই অবস্থায় তার কামনা ক'রছি, এদিকে Indology, Vedic Studies, রবীন্দ্র-সাহিত্য, অন্য আলোচনা নিয়ে আনন্দ, ছবি দেখাও চ'লেছে, বৈদিক-হিন্দু "শ্রাদ্ধপদ্ধতি"[১২], রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা" নিয়ে বই লেখার কথাও ভাবছি—রামায়ণ-কথা নিয়ে লেখাটা কবে পূরো ক'রতে পারবো সে চিন্তাও আছে[১৩]—নোতুন কত

* স্বনামধন্য পণ্ডিত অধ্যাপক সুশীলকুমার দে সুনীতিকুমারের চেয়ে বয়সে কয়েক মাসের বড়ো ছিলেন, দু' শ্রেণী উপরে প্রেসিডেন্সি কলেজে প'ড়তেন। সুশীলকুমার আর সুনীতিকুমার, উভয়েই ইংরিজিতে এম-এ, উভয়েই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট—সুশীলকুমার সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে আর সুনীতিকুমার ভারতীয়-আর্য্য ভাষাতত্ত্বে। সুশীলকুমার ইং ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গত হ'য়েছেন।—অ।

† বিদেশে প্রকাশিত মূল সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ (ফোটোষ্টাট), প্রকাশক মোতীলাল বনারসী দাস, দিল্লী।—অ।

‡ *Classical Accounts of India*, Ed. by R. C. Majumdar. Firma K. L. Mukhopadhyay. Calcutta-12, 1960.—অ।

গবেষণা হচ্ছে, লোকে এগিয়ে যাচ্ছে, তা দেখে একটু ক্ষোভও হয়—কিন্তু উপায় তো নেই। চোখের ছানির অস্ত্রোপচারের কথা সব সময়েই মনকে আতঙ্কগ্রস্ত ক'রে রেখেছে—ডক্টর পূর্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীকে, অধ্যাপক সুরেশ সেনগুপ্তের ভাই ডক্টর মুরলীধর সেনগুপ্তকে, ডক্টর অমল সেনকে দেখালুম। ডক্টর ইন্দ্রশেখর রায়ও দেখ্‌লেন, তিনি আশ্বাস দিলেন ফেব্রুয়ারি মাসে (১৯৭৭-এ) ছানি কাটতে পারেন বাঁ চোখের—পূর্ণেন্দুবাবুর পরামর্শ মতো Barcelona—Spain-এ তার জন্য ডক্টর Baraquerre-এর শরণাপন্ন হ'তে হবে না। কী হবে জানি না—বাদলের* কাজের ফাঁকে সময় হ'লেই তবে ব্যবস্থা হবে।

।

জেনেরাল অ্যাসেম্ব্লিজ ইন্‌স্টিট্যুশনে বেশ পড়াশুনো হ'চ্ছিল। কতকগুলি সহপাঠী বন্ধু পেলুম—সারা জীবন প্রায় এদের সঙ্গে কাট্‌ল। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বরিশাল ব্রজমোহন কলেজিয়েট ইস্কুল থেকে পাস ক'রে আসেন—পরে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হন, প্রেসিডেন্সি কলেজে একসঙ্গে পড়ি, তিনি ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহকর্মী হন—শেষে দুরারোগ্য ব্যাধিতে অকর্মণ্য হ'য়ে বহু বৎসর শয্যাশায়ী ছিলেন। অনেক কষ্ট পেয়ে অত বড়ো একজন পণ্ডিত সজ্জন অকালে দেহরক্ষা করেন [১৯৫৭ খ্রীঃ অঃ]। প্রমথনাথ মিত্র বোধ হয়, East Bengal and Assam ব'লে লর্ড কার্জনের দ্বারায় বঙ্গভঙ্গের পরে যে নূতন প্রদেশ হয়, সেখানকার এন্ট্রান্স পাস ছেলেদের মধ্যে প্রথম হ'য়ে আসেন—প্রেসিডেন্সি কলেজে আমরা একসঙ্গে ইংরিজিতে বি-এ অনর্স্‌ ও এম-এ পড়ি, পরে প্রমথ আইন-ব্যবসায় গ্রহণ করেন, হাইকোর্টের জজও হন, এখন অবসর গ্রহণ ক'রে আমার মতন বৃদ্ধ বয়সে জোরের সঙ্গে ওকালতি চালাচ্ছেন। ইস্কুলের সহপাঠীদের মধ্যে ২।৩ জন এই একই কলেজেও আমার সহপাঠী থাকেন, তার মধ্যে গোরা (গৌরগোবিন্দ গুপ্ত) অন্যতম—গোরার কথা আগে ব'লেছি, দর্শনে এম-এ পাস ক'রে পরে বহু দিন ধ'রে কুচবিহার কলেজের অধ্যাপক হ'য়ে ছিল। ক্লাসভরা ছাত্রদের সকলের সঙ্গেই আমার বেশ মেলামেশা ছিল। আনন্দকৃষ্ণ সিংহ, ভোলানাথ চক্রবর্তী—এরা পরে আমার মতো অধ্যাপক হয়। শচীন্দ্রনাথ বসু—মধ্য-প্রদেশে Gadarwara-তে আর রায়পুরে ওকালতি করে। সকলের নাম এখন আর মনে আসছে না, কিন্তু

* সুনীতিকুমারের একমাত্র পুত্র শ্রীসুমনকুমারের ডাক-নাম 'বাদল'।—অ।

অনেকের চেহারা, তাদের নিয়ে ছোটোখাটো ঘটনা সব ভুলি নি, এখনও চোখের সামনে যেন জল্ জল্ ক'রছে। আমাদের এক ক্লাস উপরে ছিল শিশির ভাদুড়ী। আমাদের দু বছর আগে সে এণ্ট্রান্স পাস করে, কিন্তু ইংরিজিতে এম-এ পরীক্ষা দেয় আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই, ১৯১৩ সালে—শিশিরের কথা কিছু কিছু অন্যত্র লিখেছি* —এক কথায়, তাঁকে আমাদের যুগে সব-চেয়ে ধীশক্তিসম্পন্ন উদারহৃদয় ছাত্র বলা যায়—the most brilliant student of his time—সাহিত্যে নাট্যশিল্পে তাঁর কৃতিত্ব বাঙ্গালীর আর ভারতবাসীর গৌরবের বস্তু—রবীন্দ্রনাথের স্নেহ পেয়ে, শরৎচন্দ্রের বন্ধুত্ব পেয়ে সে ধন্য হ'য়েছিল।

স্কটলাণ্ডের Presbyterian সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানরা ইংলণ্ডের Church of England সম্প্রদায়কে মানতেন না—তাঁদের খ্রীষ্টধর্ম ব্যাখ্যা একটু অন্য ধরনের। যদিও এই দুই-ই Roman Catholic সম্প্রদায়ের বাইরে, এবং বিপক্ষে। আবার স্কটলাণ্ডে যে Presbyterian Church, বা Church of Scotland ছিল তার মধ্যেও ভাঙ্গন ধ'রে দুটি দল হয়। ক'লকাতায় শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় তরুণদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রচারের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন খ্রীষ্টান [সম্প্রদায়] নানা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলে—যেমন রোমান কাথলিকদের St. Xavier's College, Church of England-এর নানা বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান, নরওয়ে ও সুইডেন-এর Lutheran Mission, তেমনি ক'লকাতায় স্কটলাণ্ডের Presbyterian Church-এর দুটি দল আলাদা আলাদা দুই কলেজ চালাচ্ছিলেন—Duff College আর General Assembly's Institution. পরে এই দুই দলের নেতারা ঠিক করেন ক'লকাতায় ব্যয়সাধ্য আলাদা দুটো কলেজ আর না রেখে দুটো কলেজকে মিলিয়ে এক কলেজ করা হবে। আমরা তখন General Assembly's Institution-এর প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র—হেদুয়া পুখুরের পূবে আমাদের কলেজের বাড়ি, আর Duff College চ'লত নিমতলা ঘাট স্ট্রীটে এক বিরাট বাড়িতে। দুই কলেজ মিলিয়ে নূতন কলেজ হ'ল—Scottish Churches College—তখনও ধর্মমতে দুইয়ের মিল হ'য় নি ব'লে Churches—বহু-বচনে। Duff College-এর শিক্ষকরা, ছাত্রেরা হেদুয়ার বাড়িতে এল। বিলাত থেকে পুরাতন প্রিন্সিপাল Dr. A. B. Wann এই যোড় কলেজ

* দ্রষ্টব্য 'মনীষী স্মরণে', জিজ্ঞাসা, ১৯৭২, পৃঃ ১৭৬-২০০ ।—অ।

কায়েমী করবার জন্য এলেন—আমরা Scottish Churches College-এর দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে Dr. A. B. Wann-এর ছাত্র হ'লুম। Duff College-এর পুরানো বাড়ি সরকার থেকে এক আদালতে রূপান্তরিত করা হ'ল।

এই ভাবে Scottish Churches College তার নোতুন এক গৌরবময় যুগে প্রবেশ ক'রলে। আগে General Assembly's Institution-এ যেমন Dr Hastie প্রমুখ বড়ো বড়ো অধ্যাপক ছিলেন, এখন Scottish Churches College-এ Dr. Wann-এর পরে বড়ো বড়ো অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ এলেন—Dr. Urquhart, Dr. Stephen, Mr. Scrimgeour, Mr. Tomory, Mr. Cameron.[১৩] ক'লকাতায় Presidency College আর St Xavier's College-এর সঙ্গে এক পর্য্যায়ের হ'য়ে উঠ্‌ল Scottish Churches College. কিছু পরে, Presbyterian Church-এর মধ্যে যে খ্রীষ্টান শাস্ত্রীয় ব্যাপারে মতভেদ ছিল সেটা যখন মিটে গেল, তখন আর দুই Church র'ইল না, কলেজের নামও হ'য়ে গেল Scottish Church College.

Scottish Churches College-এ Duff College-এরও ভালো ভালো অধ্যাপক আর ছাত্ররা যোগ দিলেন। আমাদের সময়ে আমরা প'ড়েছিলুম Dr. Wann, Mr. D. Evelyn Evans, অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বরুণচন্দ্র দত্ত (রসায়ন), অধ্যাপক মন্মথনাথ বসু (বাঙলা), অধ্যাপক বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ[১৪] (সংস্কৃত)—এঁদের কাছে। গৌরীশঙ্কর দে তখন ছিলেন বিখ্যাত গণিতের অধ্যাপক।*

---

*[এখানে পাণ্ডুলিপির ৭৯-র পৃষ্ঠা শেষ হ'য়েছে। পরের পৃষ্ঠার মাথায় কেবল, ৮০, এই সংখ্যাটি লেখা আছে—গোটা পাতা সাদা। ১৯৭৭-এর ফেব্রুয়ারির চার তারিখের পরে সুনীতিকুমার তাঁর 'জীবন-কথা' আর লিখতে পারেন নি।—অ।]

টীকা

১। পৃঃ ১ ॥ দ্রষ্টব্য 'নবজাতক'-এর "কেন" কবিতা। সুনীতিকুমারের প্রিয় রবীন্দ্র-কবিতাবলীর মধ্যে এইটি ছিল অন্যতম। বিশেষভাবে ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি থেকে সুনীতিকুমার এই কবিতাটির কথা প্রায়ই ব'লতেন। নিজে বার বার প'ড়ে, অন্যের মুখে বার বার শুনেও যেন তাঁর তৃপ্তি হ'ত না। যাঁদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল, সাক্ষাতে, এমন কি ফোনে ডেকেও, তাঁদের ব'লতেন এই কবিতাটি নোতুন ক'রে প'ড়তে। প'ড়তে প'ড়তে কবিতাটির কতগুলি পংক্তি তাঁর মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিল। বিশেষ ক'রে—"নিরর্থক হরণে ভরণে / মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা / মহাকাল করিতেছে দ্যূতখেলা / বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন,—/ কিন্তু কেন।"—এই কয়টি পংক্তি তিনি মাঝে-মাঝেই আপন মনে আবৃত্তি ক'রতেন।

২। পৃঃ ৬ ॥ বাঙ্‌লা ১৩৭০ সালের 'উদ্বোধন' পত্রের বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশিত "যুগাবতার শ্রীবিবেকানন্দ"-শীর্ষক প্রবন্ধে সুনীতিকুমার এই প্রসঙ্গে বলেন : "...উত্তরকালে, ভাব- ও কর্ম-জগতে নিজের কৈশোর ও যৌবনের মুখ্য প্রেরণা বিচার করিয়া দেখি, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ—উঁহাদের দুইজনের রচনা ও ব্যক্তিত্ব আমার জীবনে সর্বাপেক্ষা কার্য্যকর হইয়াছে।...এই দুই মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষা ও আশীর্বাদ আমার জীবনকে অর্থপূর্ণ করিয়াছে, ধন্য করিয়াছে,—আমার কাছে আত্ম-চেতনা আনিয়া দিয়াছে, অপূর্ব চিত্ত-প্রসাদ আনিয়া দিয়াছে।" ('মনীষী স্মরণে', জিজ্ঞাসা, ১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯, ১৯৭২, পৃঃ ১২৩)। তবে, তাঁর পরিণত জীবনে, বিশেষভাবে জীবনের পরিপূর্ণতার পর্বে, রবীন্দ্রনাথ-ই সুনীতিকুমারের ভাবলোকে একচ্ছত্র সম্রাটের মতো বিরাজ ক'রেছেন। ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে সুনীতিকুমারের সংকলিত *A Shortened Arya Hindu Vedic Wedding and Initiation Ritual* পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকার দ্বিতীয় অংশ ('সংক্ষিপ্ত আর্য হিন্দু বৈদিক উপনয়ন-পদ্ধতি') রবীন্দ্রনাথের "পুণ্য স্মৃতি"-র উদ্দেশে উৎসর্গ করেন "তৎপাদানুধ্যাত সদাপ্রণত সুনীতিকুমার।" ঐ বছরই ২৯ ডিসেম্বর

অধ্যাপক শ্রীজয়লাল কৌল-কে তিনি একখানি চিঠিতে লেখেন : I am not an atheist, but I am an agnostic with imagination—being a follower of Rabindranath Tagore. রবীন্দ্রনাথ agnostic ছিলেন কি না সে-বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু সুনীতিকুমার যে তাঁর সুদীর্ঘজীবনব্যাপী আত্মসমীক্ষার শেষে নিজেকে a follower of Rabindranath Tagore ব'লেই জেনেছিলেন, সে-বিষয়ে তিনি মতদ্বৈধের অবকাশ রাখেন নি। "শিল্প ও জ্ঞান দীর্ঘকালপ্রসারী", কিন্তু "জীবন ক্ষণিকের—তাহা হইলেও এই ক্ষণিকের জীবনের জন্য" সুনীতিকুমারের কোনও ক্ষোভ ছিল না, "তাহার মুখ্য কারণ, রবীন্দ্রনাথের বিরাট শিল্পময় প্রতিভার, দর্শনময় ব্যক্তিত্বের তাঁহার মতো সত্যদ্রষ্টা ঋষির বাণীর ও জীবনের স্পর্শ—এবং আশীর্বাদও আমি আমার জীবনে কিঞ্চিৎ পরিমাণে পাইয়া গেলাম।"*

৩। পৃঃ ৭॥ দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট', "আমার ছেলেবেলার কথা"। এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার তাঁর "যুগাবতার শ্রীবিবেকানন্দ" প্রবন্ধটিতে আরও লিখেছেন : "...চতুর্থ শ্রেণীতে সহপাঠী রূপে পাইলাম বন্ধুবর প্রভাতকুমার বর্ধনকে [মৃত্যু ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯]।...ইস্কুলে এক-ই ক্লাসে চারি বৎসর ধরিয়া একসঙ্গে আমরা পাঠ করি। পরে প্রভাত সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ও মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়, আমি স্কটিশ চার্চেস কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে আই-এ, বি-এ ও এম-এ পড়ি।...প্রভাতের পিতৃদেব চণ্ডীচরণ বর্ধন মহাশয় কলিকাতা বহুবাজারে সার্পেণ্টাইন লেনে উঁহাদের বাসভবনে Hindu Boys' School নাম দিয়া একটি বিদ্যালয় চালাইতেন—...প্রভাতের সঙ্গে তাহাদের বাড়িতে গিয়া তাহার পিতৃদেবের সঙ্গে পরিচিত হই। প্রভাতের পিতৃদেব ছিলেন পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য। ইস্কুলের সংশ্লিষ্ট একটি ছোটো গ্রন্থালয় তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাতে স্বামীজীর ইংরেজি ও বাঙ্গালা বই, লেখা ও বক্তৃতাদির সংগ্রহ ছিল, পরমহংসদেব সম্বন্ধে এবং হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি বই ছিল।...এই গ্রন্থালয় হইতে অনেকগুলি বই আমি প্রভাতের পিতার অনুগ্রহে বাড়িতে লইয়া গিয়া পাঠ করিতে পারি।...স্বামীজীর বাঙ্গালা ও ইংরেজি পুস্তক—'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'চিকাগো বক্তৃতা', 'My Master', 'From Colombo to Almora',

* দ্রষ্টব্য এই বইয়ের শেষে 'সংযোজন' অংশে "রবীন্দ্র-জীবনদেবতা"।

প্রভৃতি পাঠ করিয়া অপার আনন্দ পাই। প্রভাতের উৎসাহে ইস্কুলে, আমাদের ক্লাসের ছেলেদের জনকয়েককে লইয়া আমরা একটি পাঠচক্র গঠন করিয়াছিলাম। সেখানে আমরা টিফিনের ছুটির সময়ে আধ ঘণ্টা বিশ মিনিট ধরিয়া কোনও ইংরেজি বই পড়িতাম বা বই লইয়া আলোচনা করিতাম—একজনের পাঠফল আর পাঁচজনেও উপভোগ করিতাম। প্রভাত এই পাঠচক্রে আমাদের কাছে From Colombo to Almora, Chicago Address প্রভৃতি চেঁচাইয়া পাঠ করিত, আমরা শুনিতাম।" ('মনীষী স্মরণে', পৃঃ ১২০-২১)।

৪। পৃঃ ১০ ॥ সুনীতিকুমার 'যুগাবতার শ্রীবিবেকানন্দ' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন : "১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আমার···সহপাঠী শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ গুপ্তের আগ্রহে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। গৌরগোবিন্দ গুপ্ত বা গোরা শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিল, সেখান হইতে সে মোতী শীলের ইস্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভরতি হয়। তাহার কাছে রবীন্দ্র-সাহিত্য-চর্চার আমার হাতে-খড়ি হইয়াছিল। পরবর্তী কালে, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, রবীন্দ্রনাথকে সভা-সমিতিতে দূর হইতে দেখিবার এবং তাঁহার ভাষণ শুনিবার সুযোগ ঘটে, এবং বি-এ পাস করিবার কিছু পরে, সম্ভবতঃ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে, শান্তিনিকেতনে গিয়া প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথের স্নেহলাভে সমর্থ হই, এবং রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আমার জীবনের অন্যতম প্রধান সার্থকতা আমি লাভ করি।" ('মনীষী স্মরণে', পৃঃ ১২২-২৩)। সুনীতিকুমার ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পাস করেন। এর কিছু পরে, এম-এ পড়বার সময়ে, তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এই সাক্ষাৎ পরিচয় প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার তাঁর একটি ইংরিজি প্রবন্ধে (*Rabindranath Tagore : What I received from him—what he gave to India—how he served humanity*) লিখেছেন : ···I had never any occasion to exchange any word with him [Rabindranath] before, I believe, the year 1911. At that time I was a student of the M. A. class, preparing for my M. A Degree Examination in English Language and Literature, with a lot of Old and Middle English and Germanic

Linguistics as my special subject. This linguistic study of English was preparing my mind for a study of the history of my own mother-tongue, Bengali, and of the sister Aryan languages of India. I was eager to get guidance in this matter wherever I could receive it from. Naturally, whatever was written in Bengali and in English I read, as and when I could lay my hands on it, and I discovered that Rabindranath himself, in some of his remarkable essays, had made some very pertinent suggestions about the nature of the Bengali language in some of its salient characteristics. ...Rabindranath at that time was running his school of Santiniketan at Bolpur, where his father Maharshi Devendranath Tagore founded an *Āśrama* or retreat...When I went to Santinikaten I went with recommendations from some friends, including one from Sri Gaur Govinda Gupta··· I was given a very cordial reception....I have not kept any record of my first interview with Rabindranath, but I have a vague idea that I broached before him my interest in Linguistics, and I wondered how he was himself interested in the subject. Later on, I found from the library of the school that Rabindranath had read carefully, with occasional notes and markings in pencil in his own hand, the English translation in four [?] volumes of Karl Brugmann's Comparative Grammar of the Indo-Germanic Languages. This was, of course, a very heavy book to read, but it showed Rabindranath's single-minded devotion to scholarship and the pains he took to know in detail about things which interested him. (সুনীতিকুমারের এই ইংরিজি রচনাটি অদ্যাবধি কোথাও প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু এর রুষ অনুবাদ প্রচারিত হয় ১৯৬১ সালে

মস্কো থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক সংকলন-গ্রন্থে—*Rabindranat Tagor : K Stoletiyu so dnya Rozhdeniya 1861-1961*, পৃঃ ১২-৫০।)।

৫। পৃঃ ১৩॥ সুনীতিকুমার তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে (দেশ, ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬) লিখেছেন: "ইস্কুলে পড়্‌বার সময়ে ১৪ বৎসর বয়সে রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে—'চিত্রা'র আর 'কথা ও কাহিনী'র কতকগুলি কবিতার মাধ্যমে তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার একটি ঝলক চোখের সামনে আসে—অনির্বচনীয় এক সৌন্দর্য্যময় স্বপ্নরাজ্যের দ্বার যেন আমার জন্যে উন্মুক্ত হ'য়ে যায়। যার পাত্র যতটুকু, সে ততটুকু-ই নিতে পারে—আমার মতো সাহিত্যিক-রসবোধ-বর্জিত নীরস ভাষাতত্ত্বের আলোচকের মন যতটা আপ্লুত হবার তা হ'য়েছে, জীবনে এক নোতুন অমৃত রসের আস্বাদ রবীন্দ্র-রচনা আমার কাছে এনে দিয়েছে। ভাষাতত্ত্বের আলোচক হিসাবে আমার পক্ষে একটা বিশেষ আত্মপ্রসাদের কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটা দিক আমাদেরই পর্য্যায়ে পড়ে—ব্যাকরণিয়া রবীন্দ্রনাথকে আমাদের আলোচ্য বিদ্যার একজন পথিকৃৎ ব'লে আমরা মেনে নিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য্য, সেটা জীবনে এক অপূর্ব সৌভাগ্য রূপে আমি পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে কথা কওয়াটাই ছিল এক শ্রেষ্ঠ মানসিক রসায়ন। তাঁর স্নেহ পেয়েও ধন্য হ'য়েছি।...তানসেন তাঁর এক ধ্রুপদের বাণীতে তাঁর আরাধ্য দেবতার সম্বন্ধে ব'লেছেন যে, তুমি বহুবল্লভ, কিন্তু তানসেনের কাছে তুমি একবল্লভ। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমি এমন একটা দিক পেয়েছি, যেখানে কেবল তিনি আছেন আর আমি আছি—আর কারো স্থান সেখানে নেই। একথা আমার মতো আরও অনেকে নিশ্চয়ই ব'ল্‌তে পারবেন। মহাপুরুষের সর্বন্ধরত্বের এই একটা প্রমাণ।" ('মনীষী স্মরণে', পৃঃ ৭২-৭৩)।

৬। পৃঃ ২৫॥ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' প্রথম পুস্তকের 'চতুর্থ আপত্তি'-শীর্ষক অধ্যায়ে প্রথমে হুগলী জেলার "কতকগুলি বর্তমান কুলীনের নাম, বয়স, বাসস্থান ও বিবাহ-সংখ্যার পরিচয়" দিয়েছেন। এই তালিকায় প্রথম নাম "ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়", তাঁর বিয়ের সংখ্যা "৮০", বয়স "৫৫", বাসস্থান "বসো", আর শেষ নাম "মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়", তাঁর বিয়ের সংখ্যা "৫", বয়স "১৮",

বাসস্থান "দণ্ডিপুর"। তালিকাটি দিয়ে লিখেছেন : "অনুসন্ধান দ্বারা যত দূর ও যেরূপ জানিতে পারিয়াছি, তদনুসারে কুলীনদিগের বিবাহসংখ্যা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, আরও অনেক বহুবিবাহকারীর নাম পাওয়া যাইতে পারে। ৪, ৩, ২ বিবাহ করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি অনেক ; বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাঁহাদের নাম নির্দিষ্ট হইল না। হুগলী জিলাতে বহুবিবাহকারী কুলীনের যত সংখ্যা, বর্ধমান, নবদ্বীপ, যশর, বরিসাল, ঢাকা প্রভৃতি জিলাতে তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে ; বরং কোনও জিলায় তাদৃশ কুলীনের সংখ্যা অধিক। কুলীনদিগের বিবাহের যে সংখ্যা প্রদর্শিত হইল, তাহা ন্যূনাধিক হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা অধিকসংখ্যক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেই স্বকৃত বিবাহের প্রকৃত সংখ্যা অবধারিত বলিতে পারেন না।" হুগলী জেলার বহুবিবাহকারীদের তালিকা দিয়ে, বিদ্যাসাগর মহাশয় "কলিকাতার ৫, ৬ ক্রোশ মাত্র অন্তরে অবস্থিত" "প্রসিদ্ধ জনাই" "গ্রামের যে সকল ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের" তালিকা দিয়েছেন। জনাই গ্রামের তালিকাতে প্রথম নাম "মহানন্দ মুখোপাধ্যায়", তাঁর বিয়ের সংখ্যা "১০", বয়স "৩৫", আর শেষ নাম "যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়", বিয়ের সংখ্যা "২", বয়স "২০"।

৭। পৃঃ ৩২ ॥ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও কাত্যায়নী দেবীর দ্বিতীয় পুত্র সুনীতিকুমারের সহিত বিহার প্রদেশের গয়া জেলার রৈতর গ্রামের বিষ্ণুশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও বনলতা দেবীর প্রথম সন্তান কমলা দেবীর (জন্ম জানুয়ারি ১৯০০) বিবাহ হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল তারিখে। সুনীতিকুমার তাঁর বিবাহে বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানান স্বরচিত একটি সংস্কৃত শ্লোকে। মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত সেই শ্লোকটি হ'চ্ছে—

স্বস্তি স্বীয়ে পরিণয়বিধাবুৎসবং সংবিধাতুং
সম্পূর্ণাঙ্গং সকলসুহৃদাং স্বাগতৈঃ প্রেমধাম্নাম্।
প্রীতিস্নিগ্ধাং প্রমুদিতমনা যচ্ছতীমাং লিপিং তে
জায়াং নাম্নাঙ্কৃতকমলাম্ আপ্তুকামঃ সুনীতিঃ ॥

সংস্কৃতে নানা ছন্দে শ্লোক রচনা করা সুনীতিকুমারের একটি প্রিয় ব্যসন ছিল বলা চলে। নানা উপলক্ষ্যে নানা প্রসঙ্গে তিনি প্রায় ৩০০ সংস্কৃত শ্লোক রচনা ক'রেছেন ; কয়েকটি বাদে এগুলি প্রকাশিতও হ'য়েছে।

৮। পৃঃ ৩৭ পাদটীকা* ॥ 'যুগাবতার শ্রীবিবেকানন্দ' প্রবন্ধে সুনীতিকুমার লিখেছেন : "আমার পিতৃদেব স্বর্গত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (১৮৬২-১৯৪৫) স্বামীজীর কৈশোরে ও তাঁহার প্রথম যৌবনে তাঁহাকে জানিতেন। আমাদের তিন পুরুষের পৈতৃক ভিটা সুকিয়াস্ স্ট্রীট (নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় গলি, অধুনা সুকিয়াস্ রো)—বাহির সিমুলিয়া চালতা-বাগান পল্লীতে স্থিত, স্বামীজীর পৈতৃক ভিটা গৌরমোহন মুখুজ্যে স্ট্রীটের বাড়ির খুব কাছেই। প্রতিবেশী সমবয়স্ক বালক বিধায় ছেলেবেলায় আমার পিতা ও স্বামীজী ও অন্যান্য কতকগুলি সঙ্গী বিকালে হেদুয়া পুখুরের পাড়ে (কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে) মিলিত হইতেন। আমার বাবার মুখে কখনও 'বিবেকানন্দ' এই নাম শুনি নাই—তিনি 'নরেন দত্ত' বা 'নরেন' বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করিতেন। তাঁহারা নানা গভীর বিষয়ে, মুখ্যতঃ ধর্ম বিষয়ে, এবং খ্রীষ্টান মিশনারিদের অজ্ঞতা ও গোঁড়ামির বিষয়ে আলোচনা করিতেন। স্বামীজী ইংরেজি বাইবেল লইয়া আসিতেন, এবং তাহা হইতে আপত্তিকর এবং যুক্তি-বিরোধী কথা বাহির করিয়া, হেদুয়ার পাশে খ্রীষ্টানদের প্রচার-স্থান একটি ছিল (এখনও আছে), সেইখানে গিয়া উঁহাদের কথা, বিশেষ করিয়া হিন্দুধর্মের বিরোধী কথার খণ্ডন করিবার প্রয়াস করিতেন।...বাবার সঙ্গে স্বামীজীর এই সংযোগটুকুও ছিল, অথচ আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তবে ছাত্রাবস্থায় তাঁহার ভাব-শিষ্যা তাপসী ভগিনী নিবেদিতাকে কয়েক বার দেখিয়াছিলাম, তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, ভারতের লুপ্ত আত্ম-চেতনার পুনরুদ্ধারে তাঁহার গুরুদেবের অনুপ্রেরণায় নিবেদিতার কৃতিত্বের কথা কিছু কিছু শুনিতে ও বুঝিতে পারিয়াছিলাম।" ('মনীষী স্মরণে', পৃঃ ১২২)।

৯। পৃঃ ৪৬॥ দ্রষ্টব্য 'ভারতীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথ'। এই মূল্যবান্ প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় বাঙলা ১৩৫০ সালে 'গীতবিতান বার্ষিকী'তে; পরে, বাঙলা ১৩৭২ সালে, সামান্য সংশোধন আর সংযোজন সহ, সুনীতিকুমারের 'সাংস্কৃতিকী'র দ্বিতীয় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয় (বাক্-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯); তার কয়েক বছর পরে, বাঙলা ১৩৭৮ সালের চৈত্রে, প্রবন্ধটি সুনীতিকুমারের 'মনীষী স্মরণে' বইয়ে পুনরায় মুদ্রিত হ'য়েছে (পৃঃ ৭৯-৯৪)। এই প্রবন্ধটিতে প্রাচীন ভারতীয় মার্গসংগীত আর রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে সুনীতিকুমারের নিজস্ব গবেষণা আর ভাবনার কথা কিছু আছে। "স্বদেশের

ও বিদেশের Classical Music উচ্চকোটির মার্গসংগীতের" প্রতি সুনীতিকুমারের প্রগাঢ় অনুরাগ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল—রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি প্রবল আসক্তির কথা বলাই বাহুল্য। এ সম্পর্কে সুনীতিকুমারের পুত্রবধূ শ্রীমতী ছায়া চট্টোপাধ্যায়ের উপাদেয় রচনা "সুনীতিকুমার—পুত্রবধূর বন্দনায়" দ্রষ্টব্য (দৈনিক বসুমতী, রবিবার ১১ আষাঢ়, ১৩৮৪)।

১০। পৃঃ ৬৮॥ ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার শখ ছিল সুনীতিকুমারের, আর ছবি দেখার নেশা ছিল তাঁর দুর্মর—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। পরিচিত অপরিচিত অনেকেই সুনীতিকুমারের অটোগ্রাফ চাইতেন। অনেককেই তিনি অটোগ্রাফের সঙ্গে ব্রাহ্মী বা গ্রীক বা প্রাচীন আরবী লিপিতে কোনো সদুক্তি লিখে কিংবা চটপট কলমের টানে ছোটো একটা স্কেচ এঁকে দিতেন। এরকম বহু স্কেচ নানা জনের কাছে ছড়িয়ে আছে। শিল্পচর্চা অভ্যাস না ক'রলেও, সুনীতিকুমার ছবি আঁকতেন—মনের খুশিতে, একান্তই স্বান্তঃসুখায়। তিনি একবার আমাকে ব'লেছিলেন : 'ছেলেবেলায় মাইয়োপিয়া না হ'লে আমি হয়তো আর্টিস্ট হ'তুম।' তিনি আর্টিস্ট হন নি, কিন্তু তাঁর কলমের টানে আঁকা রেখাচিত্রগুলি দেখে বুঝতে পারা যায়, ছবি আঁকার হাত তাঁর ছিল, যেমন চোখ ছিল তাঁর ছবি দেখার। শিল্পরসিক সুনীতিকুমারকে অনেকেই জানতেন, কিন্তু সুনীতিকুমারের শিল্পি-পরিচয় জানতেন অল্প লোকেই। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম ক'রতে হয় সাহিত্যশিল্পী পরিমল গোস্বামী মশায়ের। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে 'কথাসাহিত্য' পত্রের সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংবর্ধনা সংখ্যায় তিনি "শিল্পী ও শিল্পরসিক সুনীতিকুমার"-এর কথা বলেন, বিশেষ ক'রে শিল্পী সুনীতিকুমারের কথা—তাঁর কথার যাথার্থ্য হিসাবে তিনি সুনীতিকুমারের আঁকা তিনখানি ছবিও ছাপিয়ে দেন (এর মধ্যে একখানি ছবি ইতিপূর্বে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, দক্ষিণ ভারত থেকে প্রকাশিত *Tamil Culture* পত্রের অক্টোবর সংখ্যায় ছাপা হয়)। পরিমলবাবু সুনীতিকুমারকে ঠিকই চিনেছিলেন : "…বিজ্ঞানী হ'লেও অন্তরে অন্তরে তিনি শিল্পী এবং শিল্পলোভী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর যত আকর্ষণ থাক, তাতে কৃতিত্বের যত আনন্দ থাক, তাঁর জীবনের প্রধান আকর্ষণ এবং আসক্তি শিল্পে।" স্বধর্মে সুনীতিকুমার ছিলেন প্রকৃত শিল্পী, শিল্পীর দৃষ্টিতেই তিনি সব কিছু দেখেছেন—জীবন, প্রকৃতি, মায় ভাষা পর্যন্ত। আকাশবাণীর এক বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে

এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি ব'লেছিলেন : "ছবির প্রতি আকর্ষণই আমাকে ভাষার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।" (বেতার জগৎ, শারদীয় বিশেষ সংখ্যা, ১৯৬৪, পৃঃ ৫৩)। সুনীতিকুমারের শিল্পরুচি আর ছবি-আঁকার প্রসঙ্গে তাঁর তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী নীলা মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'আমার বাবার ছবি আঁকা' নামে চমৎকার প্রবন্ধটির অবশ্যই উল্লেখ ক'রতে হয় (দৈনিক বসুমতী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃঃ ৬৭-৭১)। এই প্রবন্ধটিতে সুনীতিকুমার সম্পর্কে কিছু নোতুন কথা জানতে পারি, জানতে পারি শিল্পানুরাগী আর জীবনশিল্পী সুনীতিকুমারকে। শিল্পী আর শিল্পরসিক সুনীতিকুমারের কথা খ্যাতিমান্ শিল্পী শ্রীরথীন মৈত্রও লিখেছেন 'পরিচয়'-এর সুনীতিকুমার স্মরণ-সংখ্যায় ('সুনীতিকুমার ও শিল্পকলা', পৃঃ ২১২-২১৭)। এ প্রবন্ধটিতেও অনেক জানবার কথা আছে। রথীনবাবু তাঁর প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে ব'লেছেন : "শিল্পবিচার এবং শিল্পকলার আলোচনার মধ্যেই অবশ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর শিল্পপ্রীতি সীমাবদ্ধ রাখেন নি।—শিল্পী হিসেবেও তাঁর বিশেষ একটি পরিচয় ছিল যা হয়তো আজও অনেকে জানেন না। সুনীতিবাবু অবসর সময়ে ছবি আঁকতেন—বিশেষত বিভিন্ন ধরনের স্কেচ তিনি ক'রেছেন।" তাঁর আঁকা কয়েকটি স্কেচ এই বইতে ছাপা হ'ল। এর মধ্যে তাঁর ছাত্রজীবনের আঁকা স্কেচও আছে।

১১। পৃঃ ৮১॥ ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে সুনীতিকুমার আর্য্য হিন্দু বৈদিক বিবাহ আর উপনয়নের একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি সংকলন ক'রে একখানি ছোটো পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেন (*A Shortened Arya Hindu Vedic Wedding and Initiation Ritual*, Compiled, Arranged, Translated, Annotated by Suniti Kumar Chatterji, Jijñāsā, 1A College Row, Calcutta-9)। এর পরে তিনি, জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে আধুনিক যুক্তিনিষ্ঠ সমস্ত হিন্দুর পক্ষে গ্রহণযোগ্য, এক সহজ সরল শ্রাদ্ধপদ্ধতি সংকলনের কথা ভাবেন। এ বিষয়ে তিনি প্রাচীন হিন্দু ধর্মশাস্ত্র নোতুন ক'রে পড়াশুনো করেন, ভারতের নানা অঞ্চলে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের খুঁটিনাটির নানা খবর সংগ্রহ করেন, ব্রাহ্ম-সমাজে যে-পদ্ধতিতে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হয় সে-পদ্ধতিও বিচার-বিবেচনা করেন, নানা জনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। আধুনিক বুদ্ধিজীবী হিন্দুদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য

হ'তে পারে, হিন্দুদের শ্রাদ্ধক্রিয়ার এমন একটি যুক্তিসংগত দার্শনিক ব্যাখ্যা উপস্থিত ক'রে তার ভিত্তিতে একটি অনাড়ম্বর, নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠানের জটিলতা থেকে মুক্ত, একটি সহজ সরল শ্রাদ্ধপদ্ধতি প্রণয়ন করবার জন্যে তিনি অনেক চিন্তাভাবনা করেন। কিন্তু মনে হয়, শেষ পর্যন্ত এ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ অনেকটা মিইয়ে যায়। গোড়া থেকেই প্রচলিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তাঁর সংশয় ছিল। ১৯৭৭-এর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে, একদিন আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে কাজের কথা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার পরে, এই প্রসঙ্গ তুললে তিনি বলেন, 'ওটা মনে হ'চ্ছে, করা যাবে না। সমস্ত ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে, যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাও ঠিক মেলে না।'

১২। পৃঃ ৮১॥ ১৯৭৫ সালের "ডিসেম্বর মাসের ৮।৯।১০।১১।১২ তারিখে দিল্লীতে, ভারত সরকারের শিক্ষা-জনকল্যাণ-সংস্কৃতি-মন্ত্রক এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় সাহিত্য একাডেমির সম্মিলিত প্রযত্নে ও ভারত সরকারের পূরা অর্থানুকূল্যে, একটি অভিনব 'আন্তর্জাতিক রামায়ণ-বিচার সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হইল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের আদিকবি বাল্মীকির রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণ সম্বন্ধে আলোচনা,—কে, বা কাহারা, কবে, কি-ভাবে, কোথায়, মূল রামায়ণের রচনার পত্তন করিলেন। কি-ভাবে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন উপাদান বা কথাবস্তুর Synthesis অর্থাৎ সংশ্লেষ বা সংযোজনের ফলে, বাল্মীকির হাতে একটি সম্পূর্ণাঙ্গ 'রামকথা' মহাকাব্যের রূপ পাইল ;…প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে রামায়ণের স্থান ও ইতিহাস, রামায়ণের বিকাশ, রামকথার প্রসার, রাম-কাহিনীর উৎস ; প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রামকথা ; ভারতের বাহিরে—ভারত-চীনে ও দ্বীপময় ভারতে এবং বহির্ভারতের অন্যান্য দেশে—রামকথার শাখা ও পল্লবিত বিকাশ ; বিশ্বসাহিত্যে বাল্মীকির রামায়ণের প্রভাব, এই প্রভাবের কারণ নির্দেশ ; বিভিন্ন ভাষায় রামকথার নানা সংস্করণ ;—প্রভৃতি বিষয় লইয়া, গবেষকদের আলোচনার জন্য এই সভা আহূত হয়। বিদেশ হইতে ১৫।১৬ জন প্রখ্যাত নামী রামকথাবিদ্ লেখক ও পণ্ডিত ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন, ভারতের নানা অঞ্চল হইতে প্রায় ৪০ জন পণ্ডিত আসেন। ইংরেজিতে অনেকগুলি মূল্যবান্ প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়…।" (১৯৭৬, ১১ জানুয়ারি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি সুনীতিকুমারের অভিভাষণ থেকে উদ্ধৃত ; দ্রষ্টব্য

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৮২তম বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, ক্রোড়পত্র, পৃঃ ১২-১৩)। এই আন্তর্জাতিক রামায়ণ-বিচার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সাহিত্য একাডেমির সভাপতি সুনীতিকুমার। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে তিনি সম্মেলনে সমাগত পণ্ডিতবর্গকে অভ্যর্থনা জানিয়ে একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। এই ভাষণটির মুদ্রিত কপি সভায় উপস্থিত বিদ্বজ্জনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই লিখিত অভিভাষণটি পড়া ছাড়াও, সম্মেলনে সুনীতিকুমার রামকথার উৎপত্তি চরিত্র বিকাশ বিস্তার বহির্গমন বিষয়ে মুখে-মুখে কিছু বলেনও। তাঁর বক্তব্যের প্রধান পয়েণ্টগুলি তিনি নিজেই আগে থেকে নোট ক'রে দেন; তাঁর লেখা এই নোটটি সাইক্লোস্টাইল ক'রে তার কপি সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করা হয়। রামায়ণ প্রসঙ্গে মৌখিক আলোচনায় সুনীতিকুমার নোতুন কথা কিছু বলেন না, নোতুন কোনো প্রশ্নেরও অবতারণ করেন না—পুরানো প্রশ্নই সমবেত বিশেষজ্ঞদের সামনে তুলে ধরেন পুনর্বিচার আর বিশদ আলোচনার উদ্দেশ্যে। এর পরে, ১৯৭৬ সালের ১৫ জানুয়ারি, ক'লকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভাতে তিনি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রামায়ণ-বিচার সম্মেলন সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করেন—কোনো লিখিত প্রবন্ধ পড়েন না। এই বক্তৃতাতেও তিনি নোতুন কথা কিছু বলেন না—একশ বছর ধ'রে 'রামায়ণ' নিয়ে দেশবিদেশের পণ্ডিত-সমাজে যে-আলোচনা চ'লে আসছে তারই একটি চুম্বক দেন। বক্তৃতায় প্রসঙ্গত তিনি পালিতে লিপিবদ্ধ দশরথ-জাতকের গাথাগুলির উল্লেখ করেন (এই গাথাগুলিতে রাম আর সীতা হ'লেন ভাই বোন), আর বলেন যে, 'রামায়ণ'-এর রাম-চরিত্র কবি-কল্পনার এক মহনীয় সৃষ্টি, সে-যুগের কবি-কল্পিত আদর্শ মনুষ্য-চরিত্র—রামচন্দ্র ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার নন, রামচন্দ্রের অবতারত্বলাভ পরবর্তী কালের ব্যাপার। খবরের কাগজে সুনীতিকুমারের এই বক্তৃতার যে-মর্ম প্রকাশিত হয়, তাই প'ড়ে অবতারবিশ্বাসী ভক্তজনেরা ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠেন, খবরের কাগজে তাঁকে গালাগাল ক'রে চিঠি ছাপা হ'তে থাকে। সুনীতিকুমারের বিরুদ্ধে এঁদের নালিশ—তিনি নাকি রাম-সীতাকে ভাই-বোন ব'লে দেখাতে চেয়েছেন (পালি সাহিত্যে যে-কথা আছে, তা পাষণ্ডী বৌদ্ধদের স্বকপোল-কল্পিত কুৎসা ছাড়া কিছু নয়!); তাঁর আরও অপরাধ, তিনি রামচন্দ্রকে অবতার ব'লে মানেন না। তাঁকে সবংশে খতম করবার ভয় দেখিয়ে বেনামী

চিঠিপত্রও আসতে থাকে তাঁর কাছে। তিনি কিন্তু এই-সব আক্রমণে টলেন না একটুও। উপরন্তু, তাঁরই নির্দেশে, সাহিত্য একাডেমির আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, ১৩ ফেব্রুয়ারি বিকালে, ক'লকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে 'রামায়ণ' বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি সভার আয়োজন করেন। এই সভাতেও সুনীতিকুমার একটি ভাষণ দেন। ভাষণের শুরুতেই তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে এই তিনটি উদ্ধৃতি প'ড়ে শোনান :

(১) রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে রামচরিত-সম্বন্ধে যে-সমস্ত আদিম পুরাণকথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্বসূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

... ...

আদিকবি যখন রামায়ণ লিখিয়াছিলেন তখন যদিচ রামের চরিতে অতিপ্রাকৃত মিশিয়াছিল তবু তিনি মানুষেরই আদর্শরূপে চিত্রিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু অতিপ্রাকৃতকে এক জায়গায় স্থান দিলে তাহাকে আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, সে ক্রমেই বাড়িয়া চলে। এমনি করিয়া রাম ক্রমে দেবতার পদবী অধিকার করিলেন। ('সাহিত্যসৃষ্টি', সাহিত্য)

(২) দেবতার অবতারলীলা লইয়াই যে এ কাব্য ['রামায়ণ'] রচিত তাহাও নহে। কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন, পণ্ডিতেরা ইহার প্রমাণ করিবেন।... কবি যদি রামায়ণে নরচরিত্র বর্ণনা না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণনা করিতেন তবে তাহাতে রামায়ণের গৌরব হ্রাস হইত, সুতরাং তাহা কাব্যাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়াই রামচরিত্র মহিমান্বিত।

আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বাল্মীকি তাঁহার কাব্যের উপযুক্ত নায়ক সন্ধান করিয়া যখন বহু গুণের উল্লেখ করিয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

সমগ্ররূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতাং নরম্।

কোন্ একটিমাত্র নর'কে আশ্রয় করিয়া সমগ্রা লক্ষ্মী রূপ গ্রহণ করিয়াছেন? তখন নারদ কহিলেন—

দেবেষপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভির্গুণৈর্যুতম্।

শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্ যো যুক্তো নরচন্দ্রমাঃ॥

এত গুণযুক্ত পুরুষ তো দেবতাদের মধ্যেও দেখি না, তবে যে নরচন্দ্রমার মধ্যে এই সকল গুণ আছে তাঁহার কথা শুন।

রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন। ('রামায়ণ', প্রাচীন সাহিত্য)

(৩) নারদ কহিলা হাসি, "সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"
('ভাষা ও ছন্দ', কাহিনী)

সুনীতিকুমার প্রথমে ঠিক ক'রেছিলেন, সভাতে তিনি নিজের কথা কিছু ব'লবেন না, কেবল রবীন্দ্রনাথের কথাগুলিই প'ড়ে শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু, অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকারের ভাষণ আর অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেনের প্রবন্ধ পাঠের পরে, তিনি নিজেও কিছু বলেন। ('পরিচয়'-এর সুনীতিকুমার-স্মরণ-সংখ্যায় প্রকাশিত "রামায়ণ-বিতর্ক ও আচার্য সুনীতিকুমার"-শীর্ষক প্রবন্ধটির স্বল্প পরিসরে শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় এই সভার কথা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বেশ গুছিয়ে ব'লেছেন।) সুনীতিকুমার নিশ্চিত বুঝেছিলেন, রাম-কথার উৎস সন্ধানে সঠিক পথের নির্দেশ, রাম-কথার বিকাশ ও বিস্তার বিশ্লেষণে আর 'রামায়ণ' কাহিনীর ঐতিহাসিকতা বিচারে সঠিক পদ্ধতির ইঙ্গিত, আর সেই-সঙ্গে রামচন্দ্রের দেবত্বলাভের ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের এই কয়টি উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়, আর তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের উক্তি দিয়েই তাঁর ভাষণ শুরু ক'রেছিলেন। সুনীতিকুমার এই সভাতে (দিল্লী সম্মেলনে আর ক'লকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভাতেও) দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই ঘোষণা ক'রেছিলেন যে, একাধিক (তিনটি কি চারটি) বিচ্ছিন্ন কথাবস্তুর, প্রাচীন লোকগাথার, সংযোজনে পূর্ণাঙ্গ রামকথা, 'রামায়ণ' মহাকাব্য গ'ড়ে

উঠেছে।* এ কথাও তিনি বিশেষ জোর দিয়েই বলেন যে, এই প্রাচীন লোকগাথাগুলির মধ্যে একটির, 'রামায়ণ'-কাহিনীর প্রথমাংশের, প্রাচীনতর রূপটি আমরা পাই পালি খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত জাতক-গ্রন্থের একটি জাতকের কয়েকটি গাথাতে ('রামায়ণ' মহাকাব্য গ'ড়ে ওঠবার আগে); রাম-কথার উৎস আর বিকাশের ইতিহাস আলোচনায় এই গাথাগুলিকে আদবেই উপেক্ষা করা যায় না। সুনীতিকুমার এই সভাতে উপস্থিত সজ্জনদের উদ্দেশে বলেন, খবরের কাগজে তাঁর নামে এমন সব কথা প্রচার হ'চ্ছে যা তিনি বলেন নি, আর যা ব'লেছেন তাও ঠিক বুঝতে না পারায় তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চ'লেছে; তিনি আরো জানান যে, রাম-কথা নিয়ে তিনি ইংরিজিতে একখানি বই লিখতে শুরু ক'রেছেন (এ কথা তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সভাতেও বলেন), এই বইতে তিনি রাম-কথার উদ্ভব, বিস্তার ইত্যাদি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা ক'রবেন; তিনি অনুরোধ করেন, জিজ্ঞাসু সজ্জনেরা বইখানি বেরোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, তাঁর বক্তব্য না জেনে যেন হৈ-চৈ না করেন। তিনি আদবেই একথা বলেন না যে, বাল্মীকি সীতা-হরণ আর সীতা-উদ্ধারের কাহিনী হোমারের মহাকাব্য থেকে ধার ক'রেছেন; তিনি কেবল বলেন যে, বাল্মীকির 'রামায়ণ' মহাকাব্যে রাবণের যে-রূপের বর্ণনা আছে (দশ মুণ্ড বিশ হাত), এমন বিকটরূপ দেবতা বা অসুরের বর্ণনা আমাদের বৈদিক পুরাণ-কথায় মেলে না, কিন্তু প্রাচীন গ্রীক পুরাণে (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব নবম / অষ্টম শতকের কবি হেসীওদ্-এর 'থেওগোনিআ' বইতে) ব্রিয়ারেওস্, গুগেস্ আর কোত্তস নামে তিন দানব (Giant) ভাইয়ের কথা আছে যাদের প্রত্যেকের পঞ্চাশটি ক'রে মাথা আর পঞ্চাশ জোড়া ক'রে হাত—গ্রীক পুরাণের এই ব্রিয়ারেওস্ ভাইদের রূপ-কল্পনার সঙ্গে রাবণের রূপ-কল্পনার মিল দেখতে পাওয়া যায়। যদিও হেসীওদ্-এর 'থেওগোনিআ' কাব্য 'রামায়ণ' মহাকাব্যের বহু পূর্বে রচিত, আর গ্রীসের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগও ঘটে রাম-কথা পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্য রূপে গ'ড়ে ওঠবার আগেই, তবুও, সুনীতিকুমার স্পষ্টই বলেন, ব্রিয়ারেওস্ ভাইদের আর রাবণের রূপ-সাদৃশ্য থেকে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার পূর্বে অনেক কিছু

* এ কথা সুনীতিকুমার ৫০ বছর আগেও ব'লেছেন (দ্রষ্টব্য "প্রাম্বানান্ শৈব-মন্দিরে প্রস্তর-খোদিত রামায়ণী চিত্রাবলী", প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৩৫)।

ভাববার আছে। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য তিনি তাঁর ইংরিজি বইতে বিস্তারিতভাবে ব'লবেন ব'লে জানান। কিন্তু, এ কথা জানানো সত্ত্বেও, প্রচার হ'তে থাকে যে, স্নীতি চাটুজ্যে ব'লেছেন, বাল্মীকি হোমার থেকে রাম-কথা ধার ক'রেছেন!

সুনীতিকুমার রামায়ণ প্রসঙ্গে ইংরিজিতে একখানি পূর্ণাঙ্গ বই লেখাতে হাত দেন ১৯৭৬ সালের প্রথম দিকে (এর কিছু আগে তিনি তাঁর 'জীবন-কথা' আরম্ভ করেন), কয়েক পৃষ্ঠা লেখেনও নিজের হাতে। কিন্তু ছানির কারণে চোখের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হওয়াতে, লেখা তখনকার মতো বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। ভেবেছিলেন, ছানি কাটার প'রে "চোখ ফিরে পেলে" বইখানি লিখে শেষ ক'রবেন। কিন্তু ছানি কাটার কয়েক দিন পরে অকস্মাৎ তাঁকে চ'লে যেতে হ'ল। বই আর লেখা হ'ল না।

দিল্লী সম্মেলনে সুনীতিকুমার রামায়ণ প্রসঙ্গে কোনো লিখিত প্রবন্ধ পড়েন না, মুখে-মুখেই কিছু আলোচনা করেন। কিন্তু দিল্লী সম্মেলনের জন্যে তিনি একটি ছোটো প্রবন্ধ তৈরি ক'রেছিলেন, সেটি টাইপ করাও হ'য়েছিল, টাইপ-করা কপিতে তিনি নিজের হাতে কিছু সংশোধন আর সংযোজনও ক'রেছিলেন। এই প্রবন্ধের ভিত্তিতেই তিনি দিল্লীতে আর ক'লকাতায় বক্তৃতা ক'রেছিলেন। 'রামায়ণ-সমস্যা' বিশদভাবে আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটিতে সুনীতিকুমার 'রামায়ণ-সমস্যা' তুলে ধ'রেছিলেন মাত্র, সমস্যার বিশদ বিচার বা আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নি। নোতুন বই লিখবেন স্থির করবার পর তিনি এই প্রবন্ধটি ফেলে রেখেছিলেন। তাঁর প্রয়াণের পরে তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে এই খসড়া প্রবন্ধটির টাইপ-করা কপি আর যে-বই লিখতে শুরু ক'রেছিলেন তার কয়েক পৃষ্ঠা পাণ্ডুলিপি খুঁজতে থাকি। কিন্তু অনেক দিনের চেষ্টাতেও পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা কটির সন্ধান মেলে না (আজও মেলে নি), তবে খসড়া প্রবন্ধটির দুটি টাইপ-কপি কাগজপত্রের স্তূপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে। দুই কপিতেই লেখকের নিজের হাতে সংশোধন সংযোজন আছে, শেষে আছে লেখকের নাম-সই, তারিখ ৮ ডিসেম্বর ১৯৭৫। নোতুন বই লেখা হ'ল না, যতটুকু লিখেছিলেন তার পাণ্ডুলিপিও পাওয়া গেল না—এই অবস্থায় যা মিলেছে, অর্থাৎ দিল্লী সম্মেলনের জন্যে প্রস্তুত প্রবন্ধটি, তা-ই ছাপিয়ে দেওয়া উচিত ব'লে অনেকেই পরামর্শ দেন। তাঁদের পরামর্শ মতো,

এই প্রবন্ধটি, স্থনীতিকুমারের রামায়ণ-সম্পর্কিত অন্য একটি লেখা সমেত (অন্য লেখকের একখানি বইয়ের ভূমিকা), একত্রে একখানি পুস্তিকার আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। অনেকের শুভেচ্ছায় আর সহযোগিতায়, এই পুস্তিকা স্থনীতিকুমারের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে, গত ২৯ মে, প্রকাশিত হ'য়েছে (*The Rāmāyaṇa : Its Character, Genesis, History, Expansion and Exodus : A Résumé* by Suniti Kumar Chatterji, Prajñā, 77/1, M. G. Road, Calcutta-9, 29 May 1978, Price Rs. 30/-)। পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি প'ড়লেই পাঠকেরা বুঝতে পারবেন, রামায়ণ প্রসঙ্গে স্থনীতিকুমার সত্যই কী ব'লেছিলেন, আর তাঁর বক্তব্য ব'লে তাঁর বিরুদ্ধে কী মিথ্যার প্রচার চ'লেছিল।

১৩। পৃঃ ৮৪॥ Reverend Cameron স্কটিশ চার্চেস কলেজে অধ্যাপক হ'য়ে আসেন ১৯০৯ সালে—যেবারে স্থনীতিকুমার ঐ কলেজ থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেন। অধ্যাপক Cameron-এর কাছে স্থনীতিকুমার অল্পদিন প'ড়ে থাকতেও পারেন।

১৪। পৃঃ ৮৪॥ পাণ্ডুলিপিতে আছে—"অধ্যাপক সারদা ও অধ্যাপক নন্দলাল (সংস্কৃত)"। স্থনীতিকুমার ইণ্টারমিডিয়েট পড়বার সময়ে, ১৯০৭-১৯০৯ সালে, জেনেরাল অ্যাসেম্ব্লিজ্ ইন্‌স্টিট্যুশনে বা স্কটিশ চার্চেস কলেজে, 'সারদা' নামে সংস্কৃতের কোনও অধ্যাপক ছিলেন ব'লে জানা যায় না—ঐ সময়ে, পুরানো নামের আর নোতুন নামের কলেজে, সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আর নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ। ডফ কলেজ থেকে অধ্যাপক কালীপদ মুখোপাধ্যায়ও নোতুন কলেজে আসেন। 'বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়' নামটি ঠিক স্মরণ না হওয়াতেই সম্ভবত স্থনীতিকুমার 'সারদা' লিখে থাকবেন।

'জীবন-কথা' প্রসঙ্গে

ইংরিজি ১৯৬৮ সালের ১৫ আগস্ট সকাল দশটা নাগাদ অধ্যাপক মশাইয়ের "সুধর্মা" ভবনে গিয়েছি, দোতলায় উঠে কাউকে দেখতে না পেয়ে ইতস্ততঃ ক'রছি, এমন সময় অধ্যাপক মশাই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখতে পেয়েই ব'ললেন, 'এই যে, আপনি এসেছেন। বাদলের একটি ছেলে হ'য়েছে।' আজ, ভারতের স্বাধীনতা-দিবসে, জন্মাষ্টমীতে, অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র শ্রীসুমনকুমারের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ ক'রেছে। এই শুভ সংবাদটি আমাকে জানিয়ে তিনি নিজে যেমন খুশি, শুভ সংবাদটি শুনে আমিও তেমনি খুশি। কিছু ব'লতে যাচ্ছিলাম, আমাকে ব'ললেন, 'সুকুমারবাবুকে একবার ফোন ক'রে খবরটা জানাবেন?' আমি তখনই ফোনে অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন মশাইকে শুভ সংবাদটি জানালাম, সুনীতিকুমার নিজেও তাঁর সঙ্গে কথা কইলেন। তারপর, তিনি বারান্দায় একখানি চেয়ারে ব'সলেন, আমিও আর একখানি চেয়ারে ব'সলাম। মিনিট খানেক পরে, অধ্যাপক মশাই যেন স্বগতোক্তির মতো, আস্তে আস্তে ব'ললেন, 'উনি দেখে যেতে পারলেন না।' নবজাতকের পিতামহী, সুনীতিকুমারের সহধর্মিণী, কমলা দেবী প্রায় চার বছর আগে, ইংরিজি ১৯৬৪ সালের ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় দেহরক্ষা করেন। তাঁর সংসারে অবশেষে তাঁর একান্ত-বাঞ্ছিতের আবির্ভাব হ'ল, কিন্তু তিনি নেই। আজকের আনন্দের সংবাদটি শুনে অধ্যাপক মশাইয়ের স্বভাবতই তাঁর সহধর্মিণীর কথা মনে হ'য়েছে, আনন্দের সঙ্গে একটু বেদনাও হয়তো মিশে ছিল।

মিনিট পাঁচেক বাদে আমি ব'ললাম, "স্যর, আপনার ঘরে একটি নোতুন মানুষ এল, আপনার বংশের সন্তান, যার জন্যে আপনারা সাগ্রহে প্রতীক্ষা ক'রেছেন দীর্ঘকাল, আপনার নিজেরই কথায়—'অনাগতায় তস্মৈ বাঞ্ছিতায়'। আপনাদের মনস্কামনা পূর্ণ হ'য়েছে। আজ কথা দিন, আমাদের ইচ্ছাও আপনি পূরণ ক'রবেন?"

'কী, বলুন।'

'কথা দিন, আপনি এবারে আত্মজীবনী লেখায় হাত দেবেন?'

অধ্যাপক মশাই চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দায় পারচারি ক'রতে ক'রতে ব'ললেন, 'আত্মজীবনী লেখবার ইচ্ছা তো অনেক দিন থেকেই আছে, কিন্তু সময় ক'রে উঠতে পারছি না যে।'

'সময়, স্যর, ক'রে নিতে হবে। আর দেরি না ক'রে শুরু ক'রে দিন।'

এ প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা হ'ল। তার পরে চেয়ারে বসে ব'ললেন, 'আমার জন্ম থেকে আরম্ভ ক'রে নাতির জন্ম পর্যন্ত, আটাত্তর বছরের জীবন-কথা—কেমন হবে?'

'ভালোই হবে। কিন্তু আপনি আরম্ভ করুন।'

'দেখা যাক', ব'লতে ব'লতে আবার উঠে পায়চারি ক'রতে লাগলেন।

সেদিনকার মতো আমি বিদায় নিলাম।

অনেক আগে থেকেই অনেকেই তাঁকে আত্মজীবনী লেখবার অনুরোধ ক'রে আসছিলেন। লেখবার আগ্রহও তাঁর ছিল, আর এর জন্যে তাঁকে মাথা খাটাতেও হ'ত না, বিস্মৃতির অন্ধকারে হাতড়াতে হ'ত না। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ আর সর্বন্ধর। যৌবনকাল থেকেই যিনি নিয়মিত রোজনামচা রেখে এসেছেন, তাঁর পক্ষে, দৈনন্দিন জীবনের কথাগুলি সামনে ধ'রে সমগ্র জীবনের কথা লেখা অনেকটা সহজই ছিল—দরকার ছিল কেবল অবসরের, প্রচুর সময়ের। কিন্তু সময় তাঁর হ'চ্ছিল না, এদিকে সময়ও তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রে ছিল না।

অনেকেই আশঙ্কা ক'রেছিলেন, পত্নী-বিয়োগের পরে সুনীতিকুমারের মন হয়তো ভেঙ্গে প'ড়বে, সংসারে বিতৃষ্ণা এসে যাবে। কিন্তু জীবনকে যেমন, জীবনের ধর্ম যে-মৃত্যু, তাকেও তিনি গ্রহণ ক'রেছিলেন অপ্রমত্ত চিত্তে। পত্নী-বিয়োগে বেদনা তিনি পেয়েছিলেন ঠিক-ই, পত্নীর স্মৃতি তিনি অন্তরে লালনও ক'রেছিলেন একান্তে জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত, কিন্তু শোকে তিনি বিকল হন নি, কর্মে তাঁর বিরক্তি দেখা দেয় নি।

> It has been a big wrench to find her taken away from me after 50 years at my age of 75. I have no particular religio-philosophical convictions, although the Upanishadic Vedanta has the

greatest appeal for me. The question of personal survival is something which makes me wistful and eager to believe in the survival of human relationships even beyond death, but about this I have no conviction or realisation. But somehow I have come to believe that we are all within One Great Reality which is a single, all-inclusive Unity. This line from the *Īśa Upaniṣad* has been bringing to me a great sense of peace and solace :

তত্র কো মোহঃ, কঃ শোকঃ—
একত্বম্ অনুপশ্যতঃ।

("What delusion and what sorrow can be there, if one sees the Oneness of All ?")

In Memoriam : Kamalā Dēvī (1900-1964), pp. 12-13.

তবে, আমি নিশ্চয় ক'রে ব'লতে পারি, পত্নীবিয়োগের পরে পৌত্রের জন্ম সুনীতিকুমারের জীবনে এমন একটি ঘটনা যা তাঁর অনুদ্বিগ্ন মনে এক অনাস্বাদিত আনন্দের রসানুভূতি সৃষ্টি করে, তাঁর দৃষ্টিকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করে। পৌত্রের জন্মে তিনি নিজেই যেন নবজন্ম লাভ করেন। এটা আমি কবিতা ক'রে ব'লছি নে—এমনটি যথার্থই ঘ'টেছে। সুনীতিকুমারের জীবন-কথার ভূমিকায় এই ঘটনাটির উল্লেখ তাই অপরিহার্য্য।

কিন্তু ১৯৬৮ সালের আগস্টের পরে মাসের পর মাস কেটে গেল, পেরিয়ে গেল পূরো দুটো বছর ১৯৬৯ আর ১৯৭০। সুনীতিকুমারের সময় হ'ল না, অবসর পেলেন না তিনি নিজের জীবন-কথা লেখায় হাত দেবার।

১৯৭১ সালে, মাস দেড়েক ঘরে রোগশয্যায় কাটিয়ে, এপ্রিলের মাঝামাঝি আপিসে গিয়েছি। অধ্যাপক মশাইয়ের ঘরে ঢুকতেই তিনি নিজের হাতে লেখা কয়েক শীট কাগজ আমার হাতে দিয়ে ব'ললেন, 'দেখুন তো কেমন হ'চ্ছে।'

রুল-টানা ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজের আটটি পাতা—পাতার এক দিকে ঠাসা কিন্তু পরিষ্কার বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা পূরো সাতটি পৃষ্ঠা, আটের পৃষ্ঠায় একটি মাত্র পংক্তি। প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারি : 'এত দিনে ধ'রেছেন, how glad I am.'

আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। অধ্যাপক মশাই একটু হেসে ব'ললেন, 'ঐ চেয়ারটায় ব'সে জোরে জোরে পড়ুন।'

প্রথম পৃষ্ঠার শিরোদেশে একেবারে বাঁ দিকে "॥ ওঁ তৎ তৎ ॥", তার ডাইনে উপর-নীচে কয়েক পংক্তিতে রচনার একাধিক শিরোনাম—"সদসদ্দর্শ", "জীবন-সংপশ্যা", "জীবন-লোচনা", "জীবন-সমীক্ষা", "জীবন-লোচনী", "জীবন-রোচনা", "জীবনায়ন", ইত্যাদি। লিখেছেন পাঁচ দিন—জানুয়ারিতে দু দিন (১।১।৭১, ২।২।৭১), আর মার্চে তিন দিন (৪।৩।৭১, ১০।৩।৭১, ১৪।৩।৭১)। এই লেখাটি থেকে, জীবন-কথার ভূমিকার প্রথম খসড়া থেকে, কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদ—

> আজ ইংরেজী ১লা জানুয়ারি ১৯৭১, বাঙলা ১৬ই পৌষ ১৩৭৭, শকাব্দ ১১ পৌষ ১৮৯২, সংবৎ ৪ পৌষ সুদি ২০২৭॥ গত নভেম্বর মাসে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৩ নভেম্বর রাসপূর্ণিমা বা কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন, ৮০ বছর পূরো ক'রে ৮১তে পা দিয়েছি—ঐ তিথি ভারতীয় মতে আমার জন্মতিথি, গুরু শ্রীনানকদেবেরও জন্মতিথি ঐ দিন; ইংরেজী মতে ৮১ বছরের জন্মদিন হ'য়ে গেল গত ২৬শে নভেম্বর ১৯৭০। বিদায় নেবার দিন ঘনিয়ে আসছে। আশী বছরের সুদীর্ঘ জীবন, এই জীবনে spectacular অর্থাৎ ঘটার ব্যাপার তেমন কিছু হয় নি, যা সাধারণ মানুষের চোখে চমক লাগিয়ে দিতে পারে। সাধারণ বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্ত কেরানী ঘরের ছেলে, ফ্রী বা বিনা-মাইনের ইস্কুলে প'ড়ে মানুষ, গুরুবলে প্রায় বরাবরই পড়াশুনোয় পরীক্ষায় ভালো ভাবে উতরে যাই, অধ্যয়নের পরে অধ্যাপনার কাজই সহজ ভাবে নিতে হয়। তবে কতকগুলি আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ সুবিধা জুটে যায়, বিদেশে যাই, অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হয়, নানা অভিজ্ঞতা জীবনে হয়, সব দেশের সব

জাতের সব ভাষার মানুষের সম্বন্ধে একটা সহজ কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা, আকর্ষণ আর ভালোবাসা মনের মধ্যে অনুভব করি, আর তা থেকে একটা বিশেষ রস বা আনন্দও পাই—বাইরে থেকে দেখলে সংক্ষেপে এই-ই হ'ল আমার এই দীর্ঘ জীবনের মোটামুটি কথা।

... ...

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় অনুচ্ছেদের আরম্ভ—

যেটুকু ধ'রতে পারছি তা হ'চ্ছে এই—বিশ্বন্ধর একটা শাশ্বত সত্তা আছে ব'লে মনে হয়, অথবা ব'লতে পারি, এই রকম একটা সত্তা থাকলে যেন ভালো হয়—তৎ সৎ—মন আর বাক্যের অতীত সেই সত্তার সম্বন্ধে যত কিছু কথা বলা হয়, তার মধ্যে এইটুকুতেই মন সায় দেয়—সেই সত্তা হ'চ্ছে জ্ঞানময়—বেদান্তে যাকে ব'লেছে "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"।...

১০।৩।৭১ তারিখে লেখা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ অর্ধাংশ আর তৃতীয় অনুচ্ছেদ (পঞ্চম-ষষ্ঠ পৃষ্ঠা)—

[পৃষ্ঠা ৫] ...কবিতায় গল্পে গভীর কিছু বড়ো কিছু প'ড়লে আমার মনের মধ্যে এক অপূর্ব ব্যথার সঙ্গে আনন্দের যেন বন্যা বইত, এখনও এই বৃদ্ধ বয়সেও তা ব'য়ে থাকে—তা থেকে আমি মুক্ত নই—তাতে চোখের জল চাপতে পারতুম না, এখনও পারি না। এই যে মনকে এই ভাবে নাড়া দিয়ে আমাকে যেন কিছু কালের জন্য আত্মহারা সংবিৎহীন আর বিমূঢ় ক'রে দেয়, চশমা ফেলে দিয়ে প্রায়ই চোখের জল মুছতে হয়, সেটা সুহৃজ্জনের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। এই দৌর্বল্যের সঙ্গে সঙ্গে কি জানি কেন শাশ্বত-সত্তা সম্বন্ধেও একটা আকুতি বা আকুল আবেগ, এমন কি আত্মনিবেদন এসে যায়। এটা অজ্ঞেয়বাদীর পক্ষে অমার্জনীয় দৌর্বল্য বা অপরাধ। কিন্তু আমি এই দৌর্বল্য—emotional weakness-কে চাপা দেবার চেষ্টা করি না। বরঞ্চ এই আনন্দময় ব্যথা বা ব্যথা-পূর্ণ আনন্দানুভূতির জন্যও মনের মধ্যে একটা কৃতজ্ঞতা এসে যায়, কেন, কার প্রতি, তা জানি না।

* * *

জীবন-কথা ব'লতে গিয়ে প্রথমেই খানিকটা আজে বাজে কথা এসে গেল। যা ভাবি তা প্রকাশ হবেই। এইবারে এই গৌরচন্দ্রিকার

পরে*, [পৃঃ ৬] আমার জীবনস্মৃতির দ্বার উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা ক'রবো। মনে হয়, অনেক কথা বলতে পারা যায়—কিন্তু সব গুছিয়ে ব'লে উঠতে পারবো কি জানি না। তবে একটা কথা মনে লাগে—জীবন মোটের উপর আমার প্রতি সদয় হ'য়েছে, জীবনে আমি সু-কু আলো-আঁধার দুইই যথাযোগ্য পেলেও, আমার কাছে জীবন ভালোই লেগেছে, জীবন রোচক রূপেই দেখা দিয়েছে, ছায়ার অন্ধকার থাকলেও জীবন জ্যোতির্ময়, জীবন রোচনী, দীপ্তিপূর্ণ, জীবনের ট্রাজেডীর আর দুঃখ যন্ত্রণার অন্তরালেও বোধ হয় একটা রুচি বা জ্যোতি বা আনন্দের উৎস আছে; এ প্রমাণিত কথা নয়, এ হ'চ্ছে আকুল আকাঙ্ক্ষা-জাত কামনা-জাত আত্মতৃপ্তির আভাস। এইজন্যই আমার এই প্রস্তাবিত আত্মজীবন-দর্শন বা আত্মজীবন-সমীক্ষাকে এক কথায় "জীবন-রোচনী" ব'লে তার বিশিষ্ট নাম-করণ ক'রতে চাই।

* * *

১০।৩।৭১ তারিখে লেখা শেষ অনুচ্ছেদ—

[পৃঃ ৬] আমার জন্ম হ'য়েছিল, ভারতীয় কাল-গণনা মতে, শকাব্দ ১৮১২, অগ্রহায়ণ মাস একাদশ দিনাঙ্কে, সন্ধ্যা সাতটার দিকে, পূর্ণিমার রাত্রে পূর্ণগ্রহণের আরম্ভকালে। [পৃঃ ৭] বাঙলা মতে সন ১২৯৭ সাল, আর সংবৎ ১৯৪৭ সুদি কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, ইংরেজী বা ইউরোপীয় মতে ২৬ নভেম্বর ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ।

সপ্তম পৃষ্ঠায় এর পরে সুনীতিকুমার নিজের "জীবনের কতকগুলি মুখ্য ঘটনার দিনাঙ্কপঞ্জী" দিয়েছেন—তাঁর পিতামহ, পিতামহী, পিতা, মাতা, প্রভৃতির জন্ম বিবাহ মৃত্যু ইত্যাদির সন তারিখ, "জ্যেষ্ঠা কন্যা—সুধা (পুঁটু)"-র জন্ম-মৃত্যুর তারিখ, একমাত্র পুত্র শ্রীসুমনকুমারের জন্ম উপনয়ন বিবাহের তারিখ। এখানেই সাতের পৃষ্ঠা শেষ। আটের পৃষ্ঠায় একটিমাত্র পংক্তি—"জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—অনাদিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—মৃত্যু—"।

* এই "গৌরচন্দ্রিকা"র সবটাই—নোতুন ক'রে লেখা আর আরও বিস্তারিত—র'য়েছে মুদ্রিত 'জীবন-কথা'র প্রথম অধ্যায়ে। সুতরাং আগেকার লেখা এই খসড়াটি সবটাই এখানে উদ্ধার করা হ'ল না।

সুনীতিকুমারের মুখোমুখি টেবিলের ধারে চেয়ারে ব'সে আমি ধীরে ধীরে একটু জোরে জোরে লেখাটা সবটা পড়লাম।

জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'কেমন দাঁড়াবে?'

'ভালোই। কিন্তু শেষ না ক'রে থামবেন না।'

'দেখা যাক। যেমন যেমন লিখবো, আপনাকে প'ড়তে দেবো। কাউকে ব'লবেন না কিন্তু। বাদলকে আগে থেকে কিছু ব'লবো না।'

কিন্তু ১৯৭১ সালের এপ্রিলের পরে মাসের পর মাস বছরের পর বছর কেটে যায়, সুনীতিকুমার সময় ক'রে উঠতে পারেন না। কাজ কমার বদলে দিনে দিনে কাজ বেড়েই যায়, নানা দিক থেকে নানান রকমের কাজের ফরমাশ আসতে থাকে। অবসর সত্যিই তাঁর হয় না। অনেক কাজ-ই তাঁকে ক'রতে হয়, একটা দিনও তাঁর বিনা কাজে কাটে না। কিন্তু অনেক কাজের ভারে একটি কাজ চাপাই প'ড়ে যায়। অনেকের অনেক রকম কাজ ক'রতে গিয়ে তিনি নিজের বিশেষ একটি কাজে হাত দিতে পারেন না—আত্মজীবনী লেখবার অবসর তিনি পান না। মাঝে-মাঝেই জিজ্ঞাসা করি, আর তিনি এক-ই কথা বলেন, 'হবে, হবে'।

পাঁচ বছর শেষ হ'তে চ'ল্‌ল। এল ১৯৭৬ সাল। জানুয়ারির বোধ হয় ৯ তারিখ হবে, সুনীতিকুমার আপিসে এসে নিজের ঘরে ঢুকেই আমাকে ডাকেন। আমি গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই নিজের হাতে লেখা কয়েকটি পাতা আমার হাতে তুলে দিয়ে ব'ললেন, 'আমার সামনে ব'সে জোরে জোরে পড়ুন তো। কোথাও কোনো শব্দ প'ড়ে গিয়ে থাকলে বসিয়ে দেবেন, আর একটা কাগজে নোট ক'রে রাখুন কোথাও কিছু সংশোধনের কিংবা কিছু যোগ-বিয়োগের দরকার মনে করেন যদি, পরে প্রুফে ঠিক ক'রে দেবো।'

ভাঁজ-করা ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজের দু' পিঠে লেখা মোট ৬ পৃষ্ঠা। আমি তাঁর মুখোমুখি চেয়ারে ব'সে প্রথম পৃষ্ঠা চোখের সামনে মেলে ধ'রেই বুঝতে পারি—এ নোতুন লেখা, পাঁচ বছর আগেরকার লেখার continuation নয়। এই লেখার তারিখ ২।১।১৯৭৬, শিরোনাম —'জীবন-কথা'।

ব'ললাম, 'নোতুন ক'রে শুরু ক'রলেন নাকি?'

'হ্যাঁ।' একটু থেমে, 'গোড়াতেই শেষ-কথাটা ব'লে রাখলু ম। শেষ কথা দিয়ে

মুখপাত ব'লতে পারেন। জীবনের শেষ দৃশ্যে এসে আমি কোন্ দৃষ্টিতে অতীতের সমগ্র জীবনটাকে দেখ্‌ছি তা পাঠককে আগেভাগে জানিয়ে রাখা ভালো। আমার জীবনের শেষ কথাটা জেনে তারা আমার আদ্যন্ত জীবন-কথা প'ড়বে। সেটাই ভালো না কি ?'

আমি কিছু না ব'লে প'ড়তে আরম্ভ ক'রলাম। প'ড়তে প'ড়তে কোথাও ঠেকে যাচ্ছি। তিনি ধরিয়ে দিচ্ছেন, দু-একটা প্রশ্নও ক'রছি, তিনি জবাব দিচ্ছেন, নোট ক'রে রাখতে ব'লছেন—এইভাবে ৬ পৃষ্ঠা প'ড়ে ফেললাম।

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'আগের লেখাটা কী ক'রলেন ?'

'ওটা এর মধ্যেই এসে গিয়েছে—একটু নোতুন হ'য়ে।'

'মুখপাত এখানেই শেষ, না, আরও কিছু ব'লবেন ?'

'হ্যাঁ, আরও কিছু লিখবো। কেমন লাগলো বলুন।'

'অয়ম্ আরম্ভঃ শুভায় ভবতু।'

একটু হাসলেন। তারপর একটু বিস্তারিতভাবেই বইয়ের প্ল্যানটা খুলে ব'ললেন (আগেও এ নিয়ে কথা হ'য়েছে) : বইতে থাকবে ৭৮ বছরের জীবন-কথা—নিজের জন্ম থেকে পৌত্র শ্রীমান্ সুচিৎকুমারের (কানু) জন্ম পর্য্যন্ত ; বইয়ের কলেবর দাঁড়াবে, তাঁর অনুমান, তাঁরই শ্রেষ্ঠ বাঙলা বই 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ'-এর চেয়েও বড়ো ; এতে কথা ছাড়াও কথার পরিপূরক হিসাবে থাকবে নানা জায়গার মানচিত্র, যে-সব জায়গায় তিনি গিয়েছেন, কারণ তাঁর ধারণা, বইতে যে-জায়গার কথা বলা হয় সে-জায়গার একটা মানচিত্র সঙ্গে থাকলে পাঠকের কাছে কথা-বস্তু অর্থবহ হয় ; সেই-সঙ্গে থাকবে বিভিন্ন দেশের নরনারীর আর তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ আহার-বিহার রীতি-নীতির পরিচায়ক চিত্র আর বিশিষ্ট শিল্প-নিদর্শনের ছবি ; স্বদেশে বিদেশে যে-সমস্ত জ্ঞানী গুণী জনের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের অনেকের ছবি, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির চিঠিপত্র থেকে উদ্ধৃতি ; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বীপময় ভারত আর শ্যাম-দেশ ভ্রমণের কথা থাকবে অল্পই (এ-প্রসঙ্গ তিনি সবিস্তারে বর্ণনা ক'রেছেন তাঁর 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ' বইতে), তবে স্বদেশে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আর আলাপ-আলোচনার কথা সবটাই থাকবে ; দেশ-ভ্রমণের কথা তো থাকবেই, তবে 'পশ্চিমের যাত্রী' আর 'ইউরোপ ১৯৩৮'

বই দুখানিতে যে-সমস্ত কথা আছে তার পুনরাবৃত্তি বড়ো একটা থাকবে না এ বইতে।

সব শুনে ব'ললাম, 'এত বড়ো বই হবে, লিখতে হবে অনেক, সময়ও লাগবে অনেক। রোজ সকালে যেমন ব্যায়াম করেন, তেমন-ই রোজ-ই নিয়মিত আপনাকে লিখতে হবে, কামাই দিতে পারবেন না, থামলে চ'লবে না।'

ব'ললেন, 'ঠিক ক'রেছি, রোজ-ই একটু-না-একটু লিখবো, ধ'রেছি যখন ফেলে রাখবো না। যেমন-যেমন লিখবো, আপনাকে প'ড়তে দেবো। কোনো ত্রুটি চোখে প'ড়লে, কোনো প্রশ্ন থাকলে, কিছু বাদ প'ড়েছে মনে হ'লে নোট ক'রে রাখবেন, প্রুফে সব ঠিক ক'রে দেবো। কাউকে ব'লবেন না কিন্তু।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, একটা চিঠি প'ড়তে প'ড়তে ব'ললেন, 'আরম্ভ তো করা গেল, এখন শেষ রক্ষা ক'রতে পারলে হয়।'

কিন্তু কথা রাখতে পারেন নি। নানা দিক থেকে নানা রকমের বাধা এসেছে। লেখাতে ব্যাঘাত ঘ'টেছে নিত্যই। হয়তো সকালে কলম ধ'রেছেন, অমনি কেউ এসে উপস্থিত। এমনি কোনো-না-কোনো রকমের অন্তরায় দেখা দিয়েছে, লেখায় হাত দিতে পারেন নি। জানুয়ারি মাসে লিখেছেন ৯ দিন, ফেব্রুয়ারিতে ৮ দিন, মার্চে ২ দিন মাত্র, এপ্রিল-মে-জুন-জুলাই চার মাসে একদিনও না, আগস্টে ৬ দিন, সেপ্টেম্বরে ৬ দিন, অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বরে আর ১৯৭৭ সালের জানুয়ারিতে একদিনও না, শেষ লিখেছেন ৪ ফেব্রুয়ারি—১৩ মাস ৩ দিনে সর্বসাকুল্যে ৩২ দিন মাত্র। ৪ ফেব্রুয়ারির পরে আর হাত দিতে পারেন নি। তখন থেকে চোখের অপারেশনের জন্যে প্রস্তুত হ'তে হ'য়েছে। মাঝে ডেঙ্গু জরেও ভুগেছেন। অপারেশনের আগেকার প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চ'লেছে। চিকিৎসকের নির্দেশে বাড়িতে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হ'য়েছে, লেখাপড়ার কাজ বন্ধ রাখতে হ'য়েছে। চিকিৎসকের নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন না ক'রলেও, বিপত্তি ঘ'টতে পারে এমন কিছু তিনি করেন নি।

জীবন-কথায় হাত দিয়েছিলেন অনেক দেরিতে, জীবন যখন শেষ হ'য়ে এসেছে, হাতে সময় বেশি নেই। লিখেছেন তাড়াতাড়ি, নিয়মিত নয়, অনেক

দিন অন্তর অন্তর। যে কয়দিন লিখেছেন, লেখাতে হাত দেবার আগে পাণ্ডু-লিপির পিছনের দিকে চোখ বোলাবার সময় পান নি—হয়তো কেউ এসে প'ড়বে, লেখা হবে না। লিখে যেতে হবে, তাড়াতাড়ি এগুতে হবে। যা কিছু মেরামতি দরকার, পরে প্রেস-কপিতে কিংবা প্রুফে করা যাবে। এই ভেবে কতটা লিখেছেন আর কী লিখেছেন না দেখেই লিখে গিয়েছেন। নিজেই ব'লেছেন, "ভেবে-চিন্তে গুছিয়ে লেখা হ'য়ে উঠল না।" ফলে, কোথাও কোথাও এক-ই প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি এসে গিয়েছে। সর্বসাকুল্যে ৩২ দিন লিখে ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত পৌঁছেছেন—স্কটিশ চার্চেস্ কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠেছেন। তখন ১৮ বছরও পূর্ণ হয় নি। ১৯৬৮ সাল তখনও অনেক দূরে। (১৯৭৭-এর) এপ্রিল মাসের ১৮ তারিখে, আমি তখন দিল্লীতে, আমাকে লেখেন: "চোখ ফিরে পেলে উৎসাহের সঙ্গে লাগতে পারবো।" (এই চিঠি-ই তাঁর নিজের হাতে লেখা শেষ বাঙলা চিঠি)। চোখ ফিরে পাবার অপেক্ষায় ছিলেন।*

---

* ১৯৭৬ সালে সুনীতিকুমার তিনখানি বইতে হাত দেন—প্রথম 'জীবন-কথা' জানুয়ারির প্রথমে, দ্বিতীয় রামায়ণ প্রসঙ্গে ইংরিজিতে monograph জানুয়ারির মাঝামাঝি, তৃতীয় 'রবীন্দ্র-জীবনদেবতা' ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। চোখের ছানির জন্যে লেখা বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। আশা ক'রেছিলেন, অস্ত্রোপচারের পর চোখ ফিরে পেলে তিনখানি বই-ই লিখে শেষ ক'রতে পারবেন। ১৯৭৭-এর ফেব্রুয়ারিতে International Association of Sanskrit Studies-এর পক্ষ থেকে পরবর্তী জুন মাসে (২০-২৫ জুন, ১৯৭৭) প্যারিসে তৃতীয় বিশ্ব-সংস্কৃত-সম্মেলনে যোগ দেবার নিমন্ত্রণ আসে তাঁর কাছে। এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে, তিনি ২৩ ফেব্রুয়ারি তাঁর বন্ধু, International Association of Sanskrit Studies-এর Secretary General, Dr Ludwik Sternbach-কে লেখেন, ঐ সম্মেলনের জন্য তিনি একটি সন্দর্ভ লেখার কথা ভাবছেন (যখন তাঁর চোখের অবস্থা খুবই খারাপ): I am thinking of preparing a paper on the subject of "Sanskrit and its peer languages during the Axial Millennium" in which I want to discuss in what way the Sanskrit world contributed to bring philosophy of abiding value and to give enduring values of life to humanity during the period 1000 B. C. to the age of Christ (which Toynbee and others have called "The Axial Millennium"). Side by side with Sanskrit in this great service to man, we have to mention three other languages as original contributors—Ancient Greek, Ancient Chinese and Old Hebrew. Or I might

১৭ মে বিকালে সুনীতিকুমার নার্সিং হোমে ভর্তি হন। ১৮ মে দুপুরে কৃতী চক্ষু-চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বলাইকুমার মিত্র তাঁর বাঁ চোখের ছানি কাটেন। অস্ত্রোপচার নির্বিঘ্নে সমাধা হয়, চিকিৎসক মশাই নিশ্চিন্ত হন। সুনীতিকুমার "বিশেষ উদ্বেগের অশান্তির মধ্যে" ছিলেন, "চোখের ছানির অস্ত্রোপচারের কথা সব সময়েই মনকে আতঙ্কগ্রস্ত ক'রে" রেখেছিল। অস্ত্রোপচার সফল হওয়াতে, তাঁর আতঙ্ক কেটে যায়, তিনি স্বস্তি বোধ করেন। ডান চোখের ছানিও আর দেরি না ক'রে কাটিয়ে ফেলবেন স্থির করেন।

২৪ মে সকালে সুস্থ শরীরে প্রফুল্ল চিত্তে তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। বাড়িতে এসেও ভালোই থাকেন। প্রিয়জনদের সঙ্গে গল্পসল্প ক'রে স্বচ্ছন্দে আনন্দে দিনকাটান, আর মনে-মনে কাজের কথা ভাবেন। ২৬ মে বৃহস্পতিবার বিকালে আপিস থেকে তাঁর বাড়িতে যাই—সঙ্গে তাঁর একান্ত সচিব শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সুনীতিকুমার নার্সকে নিরস্ত ক'রে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে স্বচ্ছন্দে লম্বা বারান্দা অতিক্রম ক'রে বাইরের ঘরে এসে বসেন। মুখে-মুখে দু'খানা চিঠির জবাব ব'লে যান, শিশিরবাবু শর্টহ্যাণ্ডে লিখে নেন। একখানি গ্রীক মহিলা Mrs Eliki Zannas-এর চিঠির জবাব—আমার জবানিতে। সোমবারই অবশ্য-অবশ্যই চিঠি দু'খানি পোস্ট ক'রতে বলেন। আমার সঙ্গে কিছু কাজের কথাও হয়। চশমা পেলে "উৎসাহের সঙ্গে" আবার কাজে লাগতে পারবেন আশা করেন। দেহে মনে সুস্থ সতেজ স্ববশ সবল—'বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা'। চশমা না পেলে কাজে হাত দিতে পারছেন না—কেবল এই অস্বাস্ত। আর কোনো উদ্বেগ নেই, কোনো দুর্ভাবনা নেই। কিন্তু মনে-মনে কাজের জাল যখন ছড়িয়ে ফেলেছেন ভবিষ্যৎকালে—তখনই একেবারে অতর্কিতে "ধাবমান কাল জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল।"

---

write on another topic—"Sanskrit and Greek—Veda. to Kalidasa and Homer to Julian—Parallels in life and thought. তাঁর প্রয়াণের পরে খবরের কাগজে এই মর্মে খবর বেরোয় যে, সুনীতিকুমার কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গ নিয়ে লেখবার কথা ভাবছিলেন। খবরটি ঠিক নয়। সুনীতিকুমার কৃষ্ণলীলা নিয়ে কিছু লেখার কথা আদৌ ভাবেন নি। হাতের কাজগুলো শেষ করবার পর যদি তিনি বেঁচে থাকেন, ব'লেছিলেন, সব ছেড়ে কেবল মহাভারত আর রবীন্দ্র-সাহিত্য আশ্রয় ক'রে থাকবেন—living in tune with the Infinite.

সুদীর্ঘ জীবনে যিনি একটি দিনের তরেও অবসর পান নি, তিনি চিরতরে একটিবার মাত্র অবসর পেলেন জীবনের অন্তে—১৯৭৭ সালের ২৯ মে অপরাহ্ণে।

মৃত্যু তার দূত পাঠায় নি, সে এল নিজেই—"চুপি চুপি" চোরের মতন, অপরাধীর মতো। এসে দাঁড়াল একেবারে নিগূঢ় মর্মস্থলে, "করি হৃদিতলে অবতরণ"। কিন্তু সুনীতিকুমার মর্মস্পর্শী মৃত্যুকে আশ্বস্ত ক'রলেন অভয় দিয়ে।

কর্মব্যস্ত সুনীতিকুমারকে কখনো-কখনো আপন মনে সকৌতুকে আবৃত্তি ক'রতে শুনেছি :

"তুমি কারে করিয়ো না দৃক্‌পাত
আমি নিজে লব তব শরণ
যদি গৌরবে মোরে ল'য়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।"

"ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।
তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি।"

জীবনরসিক সুনীতিকুমার জীবনের প্রতি বীতরাগ হ'য়ে মরণের শরণ চান নি। তিনি জেনেছিলেন—মৃত্যু প্রাণেরই ধর্ম, "মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্।" জানতেন, "মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে" হবে। প্রসন্ন মনে তিনি অন্তরে গ্রহণ ক'রলেন "মৃত্যু-অমৃত"। জীবন-মৃত্যুর এই মহামিলন ঘ'টে গেল চকিতে, সহজে, বিনা আড়ম্বরে। এই "মিলনের এ কি রীতি এই", "তার সমারোহভার কিছু নেই?" তা-ই, নেই।

৩১ মে সকালে তাঁর মরদেহের পাশে দাঁড়িয়ে আছি, দূর থেকে ভেসে এল মহাকবির ধ্রুববাণী।

Men must endure
Their going hence, even as their coming hither :
Ripeness is all :

'জীবন-কথা' যখন লিখতে আরম্ভ করেন, তার আগে থেকেই ছানির

কারণে চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হ'য়ে আসছিল। ক্রমশই আরো খারাপ হ'তে থাকে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়, দেখেন আবছা-আবছা, "হাত আন্দাজি আন্দাজি বেশ চলে", কিন্তু "চেষ্টা ক'রেও স্থির লেখাপড়ার কাজে মন বসাতে" পারেন না। 'জীবন-কথা'র পাণ্ডুলিপির কোথাও-কোথাও লেখা বেশ স্পষ্ট স্বচ্ছ, প'ড়তে অসুবিধা হয় না, আবার কোথাও-কোথাও 'আন্দাজি আন্দাজি' হাত চলার আর দ্রুত লেখনের নিদর্শনও চোখে প'ড়বে—লেখা জড়িয়ে গিয়েছে, কাগজে স্পষ্ট দাগ পড়ে নি, কোনও শব্দ বা বর্ণ প'ড়ে গিয়েছে। বেশির ভাগ-ই আমার আগেই পড়া ছিল, আর তাঁর হাতের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয়ও দীর্ঘকালের। তাই পাঠোদ্ধারে আমাকে বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু শেষের দিকে কিছুটা, অন্য কাজে ব্যস্ত থাকবার জন্যে, তাঁর সামনে ব'সে পড়বার সুযোগ আমার হয় নি। এখানটাতে আমাকে একটু অসুবিধায় প'ড়তে হ'য়েছিল। যতটা তাঁর সামনে ব'সে প'ড়েছিলাম তার কোথায় কোথায় কী কী সংশোধন দরকার, তাঁর নির্দেশ মতো আমি আমার নোটবুকে তার একটা তালিকা ক'রে রেখেছিলাম। সম্পাদনার সময়ে সেই তালিকা আমার কাজে লেগেছে। পাণ্ডুলিপির প্রথম দিকে কয়েকটি জায়গায় আমার হস্তাক্ষর দেখা যাবে। কোনো একটা কথা হয়তো প'ড়ে গিয়েছিল, সন তারিখে হয়তো ত্রুটি ছিল, অধ্যাপক মশায়ের নির্দেশে আমি নিজের হাতে যোগ বা সংশোধন ক'রে দিয়েছিলাম।

'জীবন-কথা' প্রথম ছাপা হয় গত বৎসর (১৩৮৪ / ১৯৭৭) যুগান্তর শারদীয়া সংখ্যায়। প্রথম মুদ্রণে, পাণ্ডুলিপিতে বাঙলা আর বিদেশি শব্দের যে রকম বানান আছে, মোটামুটি সেই বানান-ই বহাল রাখা হ'য়েছিল। কোনো কোনো বাঙলা শব্দের বেলাতে দু-রকম বানান দেখা যায়—যেমন 'ভালো' / 'ভাল', 'বড়ো' / 'বড়', 'ছোটো' / 'ছোট', 'বাড়ী' / 'বাড়ি', 'বেশী' / 'বেশি', 'গাঙ্গুলী' / 'গাঙ্গুলি', 'বাকি' / 'বাকী', ইত্যাদি। এসব শব্দের বেলায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যে-বানান দেখা গিয়েছে, সেই বানান-ই অনুসরণ করা হ'য়েছিল। সুনীতিকুমার খাঁটি বাঙলা শব্দের বানানে, বিশেষ কারণ না থাকলে, সাধারণতঃ ই-কার(ি)-এর পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু লিখতেন ঈ-কার (ী), জিজ্ঞেস ক'রলে ব'লতেন, 'ী'-কার সহজেই এসে যায়, 'ি'-কার লিখতে গেলে পিছু হ'টতে হয়। প্রুফে অবশ্য সংশোধন ক'রে দিতেন। তিনি সর্বনাম

আর বিশেষণ রূপে 'কী' আর অব্যয় রূপে 'কি' ব্যবহার পছন্দ ক'রতেন ('তুমি কী খাবে ?' আর 'তুমি কি খাবে ?'), কিন্তু লিখতেন উভয় ক্ষেত্রেই 'কি', ব'লতেন "অভ্যাস"। 'জীবনকথা'-র পাণ্ডুলিপিতে সর্বনাম রূপে 'কি' লিখেছেন, কেবল একটি কি ছুটি স্থলে ছাড়া। বর্তমান মুদ্রণে, অ-সংস্কৃত শব্দের বানানের ব্যাপারে সর্বত্র সুনীতিকুমারের নির্দেশ আর রুচি মেনে চলা হ'য়েছে।

যে-পাণ্ডুলিপি সুনীতিকুমার রেখে গিয়েছেন, তাকে ব'লতে পারি তাঁর 'জীবন-কথার'-র প্রথম পর্বের প্রথম অংশের খসড়া। 'জীবন-কথা' সম্পূর্ণ লিখে শেষ ক'রতে পারলে, সেই পাণ্ডুলিপি থেকে প্রেস-কপি তৈরি করা হ'ত, আর তখনই তাতে বিস্তর পরিমার্জন সংযোজন হ'ত। তারপর প্রুফেও হ'ত অনেক অদল-বদল। সুনীতিকুমারের রচনার প্রকাশক আর মুদ্রাকরেরা জানেন, তিনি প্রুফে কী পরিমাণ সংশোধন আর সংযোজন ক'রতেন। তাঁর কোনো রচনার মুদ্রিত পাঠের সঙ্গে তাঁর প্রেস-কপির পাঠ মিলতো না, পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠ তো নয়-ই। তাই ব'লছি, 'জীবন-কথা'-র (যতটুকু লিখেছিলেন তার) বর্তমান মুদ্রিত পাঠ তার চরম পাঠের, তার স্বরূপের খসড়া মাত্র।

রবীন্দ্র-শিষ্য আর ভাষার কারবারী হ'য়েও সুনীতিকুমার ভাষা-যোজনায় রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণের চেষ্টা করেন নি। তিনি জানতেন, 'বাক্‌পতি' রবীন্দ্র-নাথের ভাষা অননুকরণীয়। তিনি নিজের কথা লিখেছেন নিজের ভাষায়, যে-ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন—"এ কলের জল নয়, ঝরনার জল।" এ-ভাষা কিন্তু সুনীতিকুমারের সাধু-ভাষা নয়, এ তাঁর নিজস্ব ভঙ্গির চলিত-ভাষা—যদিও সাধু-ভাষাতেও তিনি অনেক উপাদেয় প্রবন্ধ লিখেছেন। সুনীতিকুমারের সাধু-ভাষা, সব ক্ষেত্রে না হ'লেও, কোনও-কোনও লেখাতে যেন কিছুটা আড়ষ্ট, গুরুভারে ক্লিষ্ট, জটিল। কিন্তু চলিত-ভাষায় সুনীতিকুমার স্বচ্ছন্দ, স্বস্থ, সহজ—তিনি চলিত-ভাষা ব্যবহার ক'রেছেন নিপুণ চিত্রশিল্পীর মতো। সুনীতিকুমারের এই চলিত-ভাষার নিজস্ব একটি স্টাইল ছিল। বাঙলা চলিত-ভাষার colloquial diction-এর যাঁরা মাষ্টার, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। ব'লতে পারি, চলিত-ভাষায় তিনি ঠিক 'লিখতেন' না, 'কথা কইতেন'। সেই কথার লিখিত রূপকেই তাঁর 'রচনা' নাম দিতে পারি। যিনি লিখিত প্রবন্ধ ব'লে ধ'রে নিয়ে বাঁধা গতে তাঁর 'জীবন-কথা' প'ড়বেন, তিনি পদে-পদে

হোঁচটা খাবেন। কেউ যদি এই 'জীবন-কথা' কথা বলার ঢঙে প'ড়ে যান, আর পাঠকেরা শ্রোতা হ'য়ে সেই পাঠ শোনেন, তবেই তাঁরা এর diction-এর বৈশিষ্ট্য আর সাবলীলতা ধ'রতে পারবেন। সুনীতিকুমারের চলিত-ভাষার রচনাভঙ্গি—সে হ'চ্ছে তাঁর বিশিষ্ট বাচনভঙ্গি।

'জীবন-কথা'-র প্রথম অধ্যায়ে সুনীতিকুমার যে-কথা ব'লেছেন, তাকে তাঁর জীবনের শেষ কথা, অন্তিম উপলব্ধি বা 'ফিলসফি' ব'লে গ্রহণ ক'রবো কি ?

এই প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং সুনীতিকুমারই হয়তো ব'লতেন: 'শেষ কথা' ব'লে যদি কিছু থাকেও, তা কেউ জানে না, জানা যায় না। প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন—কো অদ্ধা বেদ।

সুনীতিকুমার কোনো সাম্প্রদায়িক-শাস্ত্র-নিবদ্ধ ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন না, দেবতাবাদে অবতারতত্ত্বে তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি ব'লতেন, ঈশ্বর দেবতা মানুষের সৃষ্টি, স্বর্গ নরক মানুষের কল্পনা। পাপ-পুণ্যের প্রচলিত শাস্ত্রীয় ধারণা তিনি মানতেন না। কিন্তু প্রচলিত ধ্যানধারণায় তাঁর রুচি না থাকলেও, তিনি ব'লতেন, তিনি নাস্তিক নন। 'নাস্তিক'-এর একটি নিজস্ব সংজ্ঞা ছিল তাঁর। যাঁরা বলেন কিছু-ই নেই, তাঁরা নাস্তিক। সুনীতিকুমার এই অর্থে নাস্তিক ছিলেন না। তিান "যেটুকু ধ'রতে" পেরেছিলেন, "তা হ'চ্ছে এই" যে "বিশ্বের একটা শাশ্বত সত্তা আছে ব'লে মনে হয়, অথবা ব'লতে পারি, এই রকম একটা সত্তা থাকলে যেন ভালো হয়—তৎ সৎ"—যার লীলা চ'লেছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে, মানবজীবনেও। 'খেলতি অণ্ডে, খেলতি পিণ্ডে।' কিন্তু, এই 'সৎ'-এর স্বরূপ সম্ভবতঃ অজ্ঞেয়। পরম সত্য যদি কিছু থাকে, তার চরম জ্ঞান, তাঁর বিশ্বাস, মানুষের আয়ত্তের বাইরে। মানুষ যা জেনেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি তার অজানা। তাই প্রকৃতই যিনি জ্ঞানী, তাঁর জ্ঞানের দম্ভ নেই, আছে নিরভিমান বিনয়, আছে (রবীন্দ্রনাথের কথায়) "অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।" জিজ্ঞাসা মানুষের থাকবেই, সংশয়ও থাকবে। জানার সাধনা চ'লবে নিরবধি কাল।

সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা আর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সুনীতিকুমার উপনীত হ'য়েছিলেন এই অজ্ঞেয়বাদে। তিনি ছিলেন জ্ঞানমার্গের সাধক, আর তাই তাঁর মধ্যে দ্বন্দ্ব সন্দেহ সংশয় দুর্বলতা অসংগতি স্ববিরোধিতা ছিল। 'ভক্ত' না হ'লেও, একটা emotional weakness তাঁর ছিল, যাকে তিনি নিজেই

ব'লেছেন "অজ্ঞেয়বাদীর পক্ষে অমার্জনীয় দৌর্বল্য বা অপরাধ।" তিনি সারা জীবন কেবল শিখেছেন, গ্রহণ ক'রেছেন যেমন, বর্জনও ক'রেছেন—এ-ব্যাপারে তাঁর কোনো গোঁড়ামি ছিল না। 'ভদ্রলোকের এক কথা' মেনে নিয়ে তিনি কোনো একটি অনড় মত বা বিশ্বাস আঁকড়ে স্থানুর মতো এক জায়গায় প'ড়ে থাকেন নি। তিনি ক্রমাগত চ'লেছেন। তাঁর বয়স যত বেড়েছে, তাঁর মন তত এগিয়ে চ'লেছে। আরো কিছুকাল বেঁচে থাকলে তিনি অজ্ঞেয়বাদেই সুস্থির থাকতেন কি আরো এগিয়ে যেতেন, বলা যায় না। 'জীবন-কথা' রচনার সমকালে লেখা তাঁর একখানি পত্রের প্রথম অংশ আর দুইখানি পত্র পূরো এখানে তুলে দিচ্ছি। এই চিঠি তিনখানি থেকে তাঁর বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে।

১৯৭৬ সালের ৯ জানুয়ারি তারিখে শ্রীযুক্ত মুরলীধর সরকারের এক চিঠির উত্তরে সুনীতিকুমার তাঁকে লেখেন—

> …এই সব "আধ্যাত্মিক" বিষয়ের শাস্ত্র ও সেই শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যাতা আচার্য্যগণের উক্তি সম্পর্কে আমি উদাসীন। নাস্তিক না হইলেও আমি মোটামুটিভাবে এই সব বিষয়ে অজ্ঞেয়বাদী। "অপৌরুষেয় শাস্ত্র"—এই কথা শুনিলে আমার হাসি পায়।…আমার এই মতকে আপনি নিতান্ত পাষণ্ডীর মত বলিতে পারেন, কিন্তু ইহাতেই আমি ধীরে ধীরে উপনীত হইতেছি।*

খবরের কাগজে সুনীতিকুমারের রামায়ণ-বিষয়ক বক্তৃতার রিপোর্ট প'ড়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে জনৈক ভদ্রলোক সুনীতিকুমারের 'ব্যাজ-স্তুতি' ক'রে তাঁকে পত্রাঘাত করেন। সুনীতিকুমার সেই পত্রের উত্তরে (৬।২।৭৬) তাঁকে লেখেন:

> সবিনয় নিবেদন,
>
> আপনার ২২ মাঘ ১৩৮২ তারিখের পত্র পাইলাম।

---

* আমার অনুরোধে শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় চিঠিখানির এই অংশটুকু নকল ক'রে আমাকে পাঠান। এ জন্যে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। মূল চিঠিখানি উইপোকায় আক্রান্ত হওয়ায় তিনি পূরো চিঠির নকল পাঠাতে পারেন নি। যতটুকু উদ্ধার ক'রতে পেরেছেন, নকল ক'রে পাঠিয়েছেন। চিঠিতে এর পরে যে বিষয়ের কথা ছিল, উপস্থিত ক্ষেত্রে তা অপ্রাসঙ্গিক।

কোনও মতবাদে পহুঁছিবার দুই প্রকার পথ আছে—(১) বিশ্বাস (অনেক সময়ে অন্ধ বিশ্বাস), ও (২) যুক্তি ও বিচার। বিচারের পথই ভারতের চিন্তানেতাদের কাম্য। আমি সেই পথের পথিক। দেবতা, অবতার, অপৌরুষেয় বা অলৌকিক শাস্ত্র, যজ্ঞ, পূজা, প্রকৃতির শক্তি, এ সমস্তই কল্পনার সৃষ্টি।

বিশ্বাস ও বিচার, দুইয়ের সমন্বয় উচ্চ ক্ষেত্রে যেখানে জ্ঞান ও ভক্তি দুই মিলিয়া যায় সেই ক্ষেত্রেই সম্ভব।

যাঁহারা বিশ্বাস লইয়া আনন্দে আছেন, তাঁহারা বিচারের পথে আসিলে বিপদে পড়িলে [পড়িবেন]। কোন্ পথে কে যাইবেন, তাহা তাঁহার শিক্ষা, রুচি ও মানসিক প্রবণতার উপর নির্ভর করিবে। মানসিক প্রস্তুতির অভাবে ভিতরের কথা তাঁহাদের অগম্য। এই প্রস্তুতি যেখানে নাই, সেখানে এই বিচারের আহ্বান তাঁহাদের জন্য নহে।

আপনার পত্রে মানসিক প্রস্তুতির নিদর্শন পাইলাম না। সুতরাং আপনার ব্যাজস্তুতি ও শ্লেষ পাঠ করিয়া কৌতুক অনুভব করিলাম। তাহা অজ্ঞতাপ্রসূত, সুতরাং তাহাতে আমার কোনও হানি নাই।

আপনার মানসিক কুশল কামনা করি। ইতি। ভবদীয়*

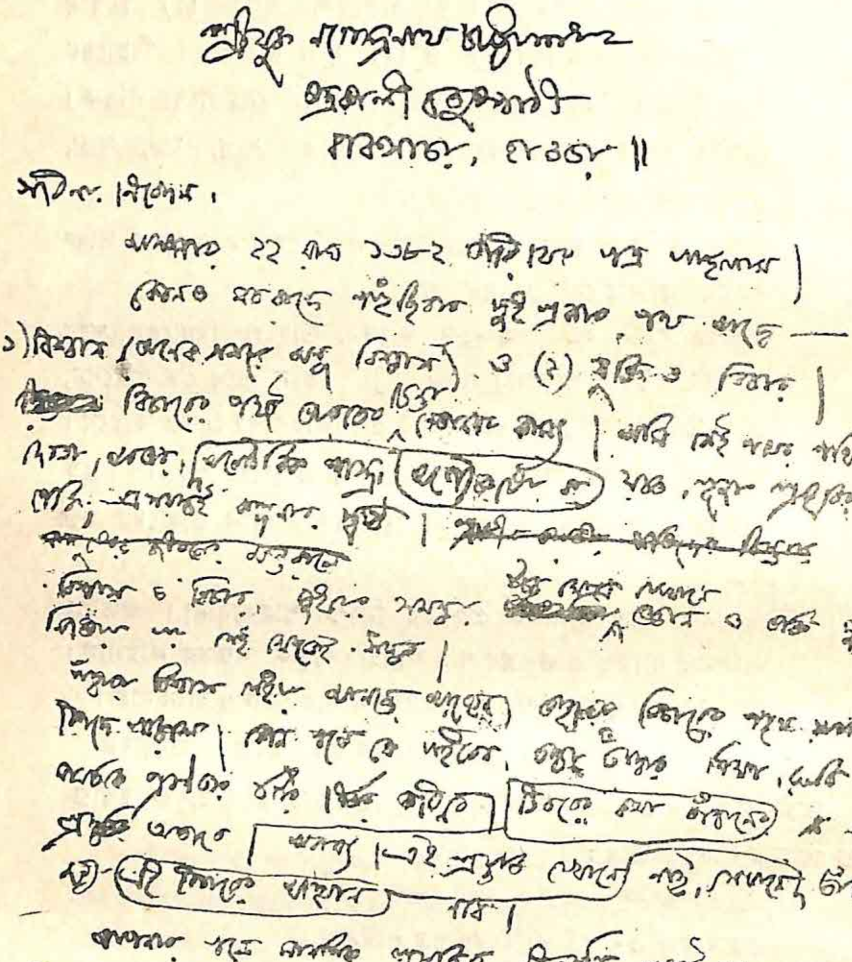
তৃতীয় পত্রখানি লেখা ১৯৭৬ সালের ১১ অক্টোবর তারিখে, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রচন্দ্র ঘোষের পত্রের উত্তরে :

প্রীতিভাজনেষু

তোমার ৬. ১০. ৭৬ তারিখের পত্র পাইলাম।

---

* সুনীতিকুমার সকালে বাড়িতে ব'সে একখানি বাজে কাগজে নিজের হাতে এই চিঠিখানি লেখেন, নীচে নাম সই করেন না। দুপুরে আপিসে এসে চিঠিখানি আমার হাতে দিয়ে বলেন : 'দেখুন তো চ'লবে কিনা। তা হ'লে আমার প্যাডে ভালো ক'রে নকল ক'রে দিন, আমি সই ক'রে দিচ্ছি।' চিঠিখানি প'ড়ে আমি সুনীতিকুমারের চিঠির-কাগজে নকল করি। নকল করবার সময়ে চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের 'প্রকৃতির শক্তি'-র স্থলে তিনি আমাকে 'প্রভৃতির শক্তি ও সার্থকতা' লিখতে বলেন, কারণ তাঁর সন্দেহ হয়, ভদ্রলোক হয়তো 'প্রকৃতির শক্তি' কথা দুটির ভুল অর্থ ক'রবেন। আমি চিঠিটি নকল ক'রে তাঁকে প'ড়তে দিই। তিনি প'ড়ে নীচে নিজের নাম সই ক'রে দেন। মূল চিঠিখানির প্রতিলিপি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।



সবিনয় নিবেদন।
(১) বিশ্বাস … ও (২) যুক্তি ও বিচার।

আমি রামায়ণ বিষয়ে যে বই লিখিতেছি তাহা কবে সম্পূর্ণ হইবে বলিতে পারি না। দুই চোখে ছানি পড়িয়াছে। বয়স ৮৭ হইতে চলিল—লেখাপড়ার কাজে তেমন প্রবৃত্তি নাই, যদিও জাতীয় অধ্যাপকের কাজ যথারীতি করিয়া যাইতেছি।

বিষ্ণু, শিব, দুর্গা প্রভৃতি দেবতা মানুষের কল্পনা-প্রসূত। এক 'তৎ সৎ' বা নির্গুণ ব্রহ্ম ভিন্ন কোনও সগুণ দেবতায় আমার আস্থা নাই, সুতরাং অবতারবাদেও কোনও প্রত্যয় ও কৌতূহল নাই। তুমি গীতার শ্লোকাদির ব্যাখ্যা কোনও ভালো অনুবাদ হইতে বুঝিয়া লইও।

তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। ইতি*

মানুষ সুনীতিকুমার সম্পর্কে শেষ কথা, আর সবার উপরে যে-কথাটি সত্য, সে হ'চ্ছে এই যে, তিনি "আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ"-কে প্রাণ ভ'রে ভালোবেসেছিলেন, আর সেই ভালোবাসাতেই তাঁর জীবন হ'য়েছিল সার্থক ; আর তাই তিনি ব'লতে পেরেছিলেন (৩।১২।৭৬) : "...জীবনে আমি ধন্য হইয়াছি। এবং এখন এই সাতাশি বৎসর বয়সে, জীবনের অবসানের সময়ে জীবনে ভালো এবং মন্দ উভয়ের মধ্যে যাহা পাইয়া বিদায় গ্রহণ করিব, তাহার জন্য জীবনের পরিচালক অজ্ঞাত অদৃশ্য শক্তির নিকট শেষ কৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি, শিল্প সাহিত্য ও সঙ্গীত এই তিন রস-বস্তুর দ্বারা জীবনকে মধুময় করার জন্য।"

অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

১৪।৭।৭৭

পরিমার্জন-সংযোজন ১৪।১০।৭৮

---

* শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, তিনি পূরো চিঠিখানি নকল ক'রে আমাকে পাঠিয়েছেন।

প রি শি ষ্ট ১

আমার ছেলেবেলার কথা

শৈশব-স্মৃতি

মানি-কাকা

হেড-পণ্ডিত মশায়

প্যারিসে ছাত্রজীবন

Student Life in Calcutta

Hostel Life in Calcutta

Professor Manmohan Ghose

জীবনের পঁচাশি বছর পেরিয়ে, পরিপূর্ণ জীবনের প্রায় অন্তিম লগ্নে পৌছে, সুনীতিকুমার নিজের জন্ম থেকে শুরু ক'রে পৌত্রের জন্ম পর্য্যন্ত তাঁর আটাত্তর বছরের জীবনের কথা (১৮৯০-১৯৬৮) লেখবার ইচ্ছা নিয়ে 'জীবন-কথা'য় হাত দেন। কেবল শৈশব বাল্য আর কৈশোরের স্মৃতিকথা, ছাত্রজীবনের প্রথম অধ্যায়ের (ইস্কুল-জীবনের) কথা—আঠারো বছরেরও কম সময়ের কথা—লিখেই অকস্মাৎ তাঁকে বিদায় নিতে হ'ল। ছেলেবেলাকার কথা তিনি আগেও লিখেছেন 'আমার ছেলেবেলার কথা' (১৩৫৭) আর 'শৈশব-স্মৃতি' (১৩৫৮) প্রবন্ধ দুটিতে। এই প্রবন্ধ দুটি তাঁর জীবন-কথারই অংশ। 'জীবন-কথা'য় তিনি মানি-কাকা আর ইস্কুলের হেড-পণ্ডিত মশায়ের স্মরণে লেখা তাঁর দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ ক'রেছেন। এই দুটি প্রবন্ধ—'মানি-কাকা' (১৩৬৩) আর 'হেড-পণ্ডিত মশায়' (১৩৬৪)—তাঁর 'জীবন-কথা'র সঙ্গেই পাঠ্য। সুনীতিকুমার তাঁর ছাত্রজীবনের পরবর্তী দুই অধ্যায়ের—ক'লকাতার কলেজে আর বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভের—কথা বিস্তারিতভাবে কোথাও লেখেন নি। 'জীবন-কথা'য় কলেজে পাঠের কথা কেবল শুরু ক'রেছিলেন—কয়েকটি মাত্র বাক্যে ঝটিতি প্রথম বার্ষিক শ্রেণী পেরিয়ে আর এগুতে পারেন নি। কিন্তু, ক'লকাতার কলেজে একান্তভাবে নিজের ছয় বছরের ছাত্রজীবনের কথা কোথাও না লিখলেও, ছাত্রাবস্থাতেই (১৯১৩ সালে) তিনি ইংরিজিতে দুটি উপাদেয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন (*Student Life in Calcutta* আর *Hostel Life in Calcutta*), যাতে সাধারণভাবে তাঁর সময়কার ক'লকাতার কলেজে আর ছাত্রাবাসে ছাত্রজীবনের বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ চিত্র চমৎকার ফুটে উঠেছে। এই প্রবন্ধ দুটি সুনীতিকুমারের সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা। দ্বিতীয় প্রবন্ধটির সঙ্গে মুদ্রিত চারখানি রেখাচিত্রের শিল্পীও স্বয়ং সুনীতিকুমার। সুনীতিকুমারের জীবন-কথা থেকে এই ইংরিজি প্রবন্ধ দুটিকে আলাদা ক'রে দেখা চলে না। ক'লকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে (১৯০৯-১৩) তিনি যাঁদের কাছে প'ড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক পার্সিভালের কথা একটু, আর বিশেষ ক'রে অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের কথা কিছুটা, তিনি লিখেছেন ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি ইংরিজি প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধটি সুনীতিকুমারের একান্তভাবে নিজের ছাত্রজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটুকরো কথা, ছাত্রজীবনের তৃতীয় অধ্যায়ের একটুকরো কথা যেমন তাঁর 'প্যারিসে ছাত্রজীবন' প্রবন্ধটি (১৯৬৯)। এই ইংরিজি বাঙলা প্রবন্ধ দুটিও তাঁর জীবন-কথারই অন্তর্গত। পূর্বপ্রকাশিত মোট আটটি প্রবন্ধ—বাঙলা পাঁচটি আর ইংরিজি তিনটি—সুনীতিকুমারের সমগ্র জীবন-কথার অন্তর্গত বিবেচনা ক'রে, বর্তমান সংকলনে তাঁর 'জীবন-কথা'-শীর্ষক অসম্পূর্ণ রচনার পরিশিষ্ট রূপে যোগ করা হ'ল॥

অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

আমার ছেলেবেলার কথা

এমন কে প্রৌঢ় বা বুড়ো লোক আছেন, ছেলেবেলার কথা স্মরণ ক'রে যিনি আনন্দ না পান? অতীতের প্রতি সিংহাবলোকন ক'রে দেখ্‌লে, অনেক কিছুর অর্থ আমরা এই পরিণত বয়সে বুঝ্‌তে পারি, অতীত এখন আমাদের কাছে নোতুন রূপ, নবীন সার্থকতা নিয়ে দেখা দেয়।

আজ থেকে বছর পঞ্চাশেক আগেকার কথা ব'ল্‌ছি—যখন ইস্কুলের ছাত্র ছিলুম, তখনকার দিনের কথা। এত বছর হ'য়ে গিয়েছে, অনেক কথা ভুলে গিয়েছি, অনেক কথা আবছা-আবছা মনে আছে, আবার অনেক কথা এখনও চোখের সামনে যেন জল্‌জল্‌ ক'র্‌ছে।

বারো বছর বয়সে মা মারা যান—আমরা চার ভাই আর দুই বোন ছিলুম। আমার ছেলেবেলার সব-চেয়ে পুরানো স্মৃতি আমার মায়ের কথা নিয়ে। মাথায় চূড়াকরা চুলের মধ্যে একটি গোল সোনার পুঁটে বাঁধা, চোখে কাজল, পায়ে রূপোর মল—আমার এ-হেন বেশের কথা আবছা-আবছা মনে আছে। আর মনে আছে, মায়ের মুখের গান, আর অবাক্‌ হয়ে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে আমার সেই গান শোনা—"রাঙা পায়ে রাঙা জবা কে দিলে মা মুঠো মুঠো—দে-না মা পরিয়ে দুটো—ঘুরে ফিরে নাচ্‌বো আমি, দেখে মা তুই হাস্‌বি কত"—এখন মনে হয়, এ গান শুনে বুঝি-বা আমিও নাচ্‌তুম। মা চ'লে গেলেন, ইংরিজি ১৯০২ সালে, ক'লকাতায় প্লেগ হ'চ্ছিল, সেই প্লেগে। আমাদের ছয় ভাই বোনকে নিয়ে বাবা আমাদের মা আর বাবা দুইয়ের কাজ ক'র্‌তে লাগ্‌-লেন। বাবার স্নেহের, আর আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষার আর চেষ্টার অবধি ছিল না, কিন্তু তবুও তাঁকে ভয় ক'র্‌তুম, আমরা ভাই বোন সকলেই। তবে তাঁর স্নেহ যত্নের কদর ক'র্‌তুম, সেজন্য মনে প্রাণে তাঁকে শ্রদ্ধা ক'রতুম, ভালো-বাসতুম। আমাদের ঠাকুরমা ছিলেন, তিনি-ই মায়ের অভাব অনেকটা পূরণ করেন, তাঁর হাতেই আমরা মানুষ হই। আর বাড়িতে ছিলেন ঠাকুরদাদা—পিতামহ। ছেলেবেলার কথা কিন্তু মনে হ'লেই, সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেবেলায় যাঁকে হারিয়েছি সেই মায়ের কথা মনে হয়-ই। বারো বছরের বালক-জীবনের মধ্যে তাঁর যে স্নেহের স্পর্শ পেয়েছি, যে আদর-যত্নের

নিদর্শন দেখেছি, তার জন্য একটা আকুলতা এসে এখনও মনকে অভিভূত করে। যেদিন ইস্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার খবর তাঁকে জানালুম, তখন আমার বয়স নয় বৎসর হবে, মায়ের চোখে মুখে সে কী আনন্দ দেখেছিলুম—সে আনন্দ আমার শিশু-মনকেও ভ'রে দিয়েছিল—মা খুশি হ'য়েছেন, এইতেই আমার পরীক্ষায় প্রথম হওয়া যেন সার্থক হ'য়েছিল।

আমাদের ছিল গরিব মধ্যবিত্ত সংসার। বাবা তখন মাত্র ৪০ টাকা মাইনেতে এক ইংরিজি সদাগরি-আপিসে চাকুরি ক'র্‌তেন—উদয়-অস্ত ছিল তাঁর খাটুনি। অল্প আয়ে বড়ো সংসার চালানোর ঝক্‌কি সব-ই আমার মায়ের উপরেই প'ড়্‌ত। কত রকম ফিকিরফন্দি ক'রে তিনি খরচ কমাতে আর আয় বাড়াতে চেষ্টা ক'র্‌তেন। বাড়িতে গোরু রেখেছিলেন ; নিজের হাতে ঘুঁটে আর গুল দিতেন ; ক্ষারে কাপড়-চোপড় বিছানার চাদর বালিসের ওয়াড় সব সিদ্ধ ক'রে পরিষ্কার ক'র্‌তেন ; ঘর-দোর সব পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে' ক'রে রাখ্‌তেন ; রাঁধ্‌তেন ; ঠাকুরমাকে একটুও বেশি খাট্‌তে দিতেন না ;—এই ধরনের সংসার-ধর্ম করার পিছনে যে কতটা মনের বল, কতটা সাধনা, কতটা স্বার্থহীনতা আছে, আমরা তখন-ই অস্পষ্ট ভাবে তা অনুভব ক'র্‌তে পার্‌তুম। মায়ের স্মৃতি বাবার কাছেও যে মস্ত বড়ো একটা জিনিস ছিল, তার বহু প্রমাণ আমরা পেয়েছি—আর সে জিনিসটা আমাদের কাছেও গর্বের বিষয় হ'য়ে আছে। মায়ের হাতের লেখা একটি গান—আমার মায়ের নিজের রচনা—বাবা বাঁধিয়ে' বরাবর তাঁর বিছানার শিয়রে রেখেছিলেন। বেশি বয়সে যখন আমরা মায়ের মৃত্যু-তিথিতে তাঁর বার্ষিক শ্রাদ্ধ ক'র্‌তে ব'স্‌তুম, তখনও বাবার চোখে জল দেখ্‌তুম।

ছেলেবেলার স্মৃতির কথা উঠ্‌লেই, প্রথমটায় মায়ের আর বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমাদের চোখে জল আসে। জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে মনে হয় যে বরাবর-ই মায়ের আশীর্বাদ পেয়ে এসেছি।

মা আর বাবার পরেই, ঠাকুরমা ঠাকুরদাদার কথা মনে হয়। আমার যখন পনেরো বছর বয়স, তখন অষ্টআশি বছর বয়সে ঠাকুরদাদা গত হন। দীর্ঘকায় সুগৌর সুন্দর পুরুষ ছিলেন তিনি। প্রথম জীবনে ফারসী পড়েন, পরে ইংরিজি। বই প'ড়ে প'ড়ে একটু সংস্কৃতও শেখেন। খুব ভোরে তুলে দিতেন আমাদের, শুয়ে শুয়ে তাঁর মুখে পুরাণের গল্প, চাণক্যের শ্লোক কত শুনেছি। তিনি

আমাদের বাল্য-জীবনে পড়াশুনার তদারক ক'র্‌তেন, নানা গল্প শুন্‌তুম তাঁর কাছে। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তিনি পশ্চিমে ছিলেন শুনেছি—তবে কোথায় কি ভাবে ছিলেন, সে-সব কথা তাঁর কাছে শোনা হয় নি। তিনি অত্যন্ত দরাজ ভাবে খরচ ক'র্‌তেন্, অভাবগ্রস্ত কেউ এসে হাত পেতে দাঁড়ালে নিজের কথা না ভেবে শেষ পাই-পয়সাটিও তিনি দিয়ে ফেল্‌তেন। তাঁর মুখে ফারসী বই গোলেস্তান পন্দনামার বয়েৎ শুনেছি, দু-একটি এখনও মনে আছে। আমাদের জ্ঞানগোচর মতন কখনও তাঁকে চাকুরি ক'র্‌তে দেখি নি, বাবা দেবতার আদরে তাঁকে যত্ন ক'রে রেখেছিলেন।

ঠাকুরমা মারা যান প্রায় ৯২ বছর বয়সে, তখন আমার বয়স বছর ২৭।২৮ হবে। কোমর ভেঙ্গে দীর্ঘকাল তিনি শয্যাশায়ী হ'য়ে থাকেন, তাঁর সেবা ক'রে আমরা ধন্য হ'য়েছিলুম। বাবার বয়স যখন নয়-দশ, অর্থাৎ ইংরিজি ১৮৭০।৭১ সালে, ঠাকুরমা পায়ে হেঁটে শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথ-ধাম দেখে আসেন। ক'লকাতা থেকে চাঁদবালী পর্য্যন্ত ইষ্টিমারে কালাপানি পেরিয়ে যান, তারপর হাঁটাপথ। তখন ছিল ভারী বিপৎসঙ্কুল। এমন চমৎকার ক'রে সে-সবের গল্প ঠাকুরমা ক'র্‌তেন, ছেলেবেলায় মনে হ'ত তাঁর সঙ্গে আমরাও শ্রীক্ষেত্র দেখে এসেছি। সে-গল্পের ছাপ মনের মধ্যে এখনও গভীর-ভাবে আছে। মাঝে-মাঝে ইচ্ছে হয়, তাঁর-ই কথায় যতটা মনে আছে লিখে ফেলি—যদি কখনও ফুরসৎ পাই তো লিখে বা'র ক'র্‌বো আশা করি।

অতি শিশুকালে, বোধ হয় তখন আমার বয়স ছ' বছর হবে, সুকিয়াস্ স্ট্রীটে আমাদের পাড়ার এক পাঠশালাতে প্রথম প'ড়্‌তে যাই। আজকাল শহরে, বিশেষতঃ ক'লকাতায়, সাবেক ধরনের পাঠাশালা আর নেই। ক'লকাতার শহরের প্রায় সব রাস্তাতেই খোলার চালের বাড়ি ছিল; অনেক জায়গায় আবার পোড়া মাটির খোলার বদলে চালে গোলপাতার ছাউনি হ'ত। আগুন লাগার ভয়ে শহরের ভিতরে গোলপাতার ঘর করা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বন্ধ ক'রে দেয়—কিন্তু আমি যখনকার কথা ব'লছি, তখন সব রাস্তাতেই দু'চার খানা গোলপাতার ঘর ছিল। সুকিয়াস্ স্ট্রীটে, আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ের কাছে, মহেশ ঘোষের শিবের মন্দিরের সামনে, এই রকম এক গোল-পাতার ছোটো একটি কুঁড়ের সামনে খোলা উঠানে আমাদের পাঠশালা হ'ত। এখানে অল্প কয়দিন মাত্র আমি যাই—এখানকার কথা সব পূরো মনে নেই।

তার পরে, আমহার্স্ট স্ট্রীটে "ক্যালকাটা একাডেমি" ব'লে একটি উচ্চ-ইংরিজি ইস্কুলে ভর্তি হই—এই ইস্কুলটি এখনও আছে—এখানে বোধ হয় বছর দুই পড়ি—বাঙালা দ্বিতীয় ভাগ, আর ইংরিজি First Book।

১৮৯৮ সালে ক'লকাতায় খুব প্লেগের মড়ক দেখা দেয়, তখন আমরা ক'লকাতা ছেড়ে গঙ্গার ওপারে মামার-বাড়ি হাওড়ার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে গিয়ে মামাদের একটি বাড়িতে এক বছর থাকি। বাবা শিবপুর থেকে খেয়া নৌকা ক'রে গঙ্গা পেরিয়ে রোজ ক'লকাতায় আসতেন আপিস ক'র্তে। শিবপুরে আমরা কোনও ইস্কুলে ভর্তি হই নি—দাদাকে আর আমাকে বাবা আর ঠাকুরদাদা ঘরেই পড়াতেন। এইভাবে একটা বছর আমার নষ্ট হয়, ১৫ বছরের বদলে ১৬ বছর বয়সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিই। ১৮৯৯ সালে প্লেগের প্রকোপ ক'মতে, আবার ক'লকাতাতেই আমাদের আপন বাড়িতে ফিরে আসি। একটা বৎসর আমাদের ক'লকাতার বাড়িতে অন্য লোক ভাড়া ছিল। তখন আমাদের দুই ভাইকে, দাদাকে আর আমাকে, মোতীলাল শীলের ফ্রী অর্থাৎ বিনা বেতনের ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়।

এই ১৮৯৯ সালে আমার ইস্কুল-জীবনের ঠিক-মতো সূত্রপাত হয়। ১৯০৭ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিই—১৮৯৯ থেকে ১৯০৭ এই দীর্ঘ আট বছর এই ইস্কুলের ছাত্র হ'য়ে কাটাই। আমরা চার ভাই প্রত্যেকেই ৮ বছর বা ৭ বছর ক'রে মোতীলাল শীলের দাক্ষিণ্যে তাঁর-ই স্থাপিত ইস্কুলে বিনা বেতনে প'ড়ে মানুষ হই। তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নত মস্তকে তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এই ইস্কুলটি স্বনামধন্য ব্যবসায়ী সুবর্ণ-বণিক্ সমাজের অন্যতম রত্ন ক'লকাতার গৌরব-স্থল মোতীলাল শীল মহাশয় ইংরিজি ১৮৪২ সালে স্থাপিত করেন। একশ' বছরের উপর হ'য়ে গেল, তাঁর টাকায় স্থাপিত এই ইস্কুলটি তাঁর বংশধরদের বদান্যতায় এখনও চ'ল্‌ছে, শত শত গরিব ছেলেকে বিনা বেতনে প্রতিবৎসর শিক্ষা দান ক'র্‌ছে। এক ইস্কুলে একাদিক্রমে আট বছর পড়ার একটা মস্ত দিক্ আছে। মাষ্টার মশায়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এর একটা প্রধান লাভ। তা ছাড়া ইস্কুলের সম্বন্ধে একটা আত্মীয়তাবোধ, একটা মমতা-বোধ ঘটে, যেটা জীবনে এক বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। এখনও মোতীলাল শীলের ইস্কুল চিত্তরঞ্জন আভেনিউতে নিজের পুরানো বাড়িতে চ'ল্‌ছে। বাড়িখানিকে তখনকার

দিনের ইস্কুলের পক্ষে বেশ বড়োই ব'ল্‌তে হবে—এ রকম নিজ বাড়ি থাকা যে-কোনও ইস্কুলের পক্ষে কাম্য ছিল, আর এখনও আছে ব'ল্‌তে হয়। এই বাড়ির বিশেষ কোনও পরিবর্তন এখনও হয় নি, এখন এই বাড়ির সামনে দিয়ে মাঝে-মাঝে যাবার সময়ে, বাড়ির দিকে তাকালে, কত পুরাতন কথা মনে জাগে।

আমার এই পুরানো ইস্কুলের স্মৃতির সঙ্গে মাষ্টার মশায়দের আর আমার সহপাঠীদের কত কথা জড়িত! ইস্কুলের কথা মনে হ'লেই, তখনকার দিনের অর্থাৎ আজ থেকে ৪২ বৎসর পূর্বেকার ক'লকাতার দৃশ্য মানস-পটে ভেসে ওঠে। মাষ্টার মশায়রা, যাঁদের চরণের তলায় ব'সে ছেলেবেলার শিক্ষা লাভ করি, তাঁদের সকলেই দেহরক্ষা ক'রেছেন। তাঁদের নিয়ে তখন বালক-সুলভ চাপল্যের সঙ্গে কত-ই না ছেলেমানুষি ক'রেছি। এখন মনে হ'চ্ছে তাঁদের অবিরল স্নেহের কথা। সত্যই, প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে আমি ব্যক্তিগত-ভাবে অত্যন্ত প্রীতি যত্ন পেয়েছি। একটা কারণ ছিল, আমি ক্লাসে পড়ায় ভালো ছিলুম। এক অঙ্ক ছাড়া, আর সব বিষয়ে কেউ আমাকে হারাতে পার্‌ত না। এজন্য প্রায় সকলেরই প্রিয়-পাত্র ছিলুম। ছবিও আঁক্‌তুম ভালোই, তাই ড্রয়িং-মাষ্টার মশায়ও আমার প্রতি পক্ষপাতিত্ব ক'র্‌তেন। আমার ইস্কুলের শিক্ষকদের জ্ঞানের প্রসার বা গভীরতা বেশি ছিল না; তবে ইস্কুলের পড়া তাঁরা যেটুকু জান্‌তেন, সেটুকু তাঁরা অকৃপণ-ভাবে উদার হাতে ঢেলে দান ক'র্‌তেন; তাঁদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, ছাত্র সবটুকু যেন তাঁদের কাছ থেকে আদায় ক'রে নিতে পারে। এই জন্যে তাঁদের কথা মনে হ'লে সঙ্গে-সঙ্গে চিন্তা না ক'রে পারি না, আমার কোটি কোটি সকৃতজ্ঞ আর ভক্তিপূর্ণ প্রণাম তাঁদের চরণে পৌছাক। আমাদের ইস্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি মহাশয়। তিনি ফিফ্‌থ্‌ ক্লাসে ইংরিজি আর গণিত পড়াতেন। ভীষণ রাশভারী লোক ছিলেন, তাঁর হুংকারে অতি বড় পাজী ছেলেও ভয়ে কাঁপ্‌ত। অঙ্কে আমি বড়োই কাঁচা ছিলুম, বার্ষিক আর ষাণ্মাষিক পরীক্ষায় কোনও রকমে পাস ক'রে যেতুম মাত্র। একবার এক ষাণ্মাষিক পরীক্ষায় (পঞ্চম শ্রেণীতে তখন পড়ি) ব্রজেনবাবুর চোখের সামনে অঙ্কে একেবারে গোল্লা পাই—১০০ পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে একটি শূন্য, একটিও প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর হয় নি। ব্রজেন্দ্রবাবুর অপূর্ব স্নেহ। তিনি আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে, বেশ মিঠে-কড়া

ব'কৃলেন, ধমক দিলেন ; আর তাঁর হাতের গাঁট্টা বিখ্যাত ছিল, যেমন ছিল তাঁর বিরাট্ বেত্র-যষ্টি—তাঁর সুদীর্ঘ দেহের মতোই যেন দীর্ঘ—সেই গাঁট্টা গুটি কতক মাথায় মারলেন। এতে বেশ ভালো ফল হ'ল ; তাঁর স্নেহপূর্ণ আর কর্তব্যনিষ্ঠ মনের পরিচায়ক এই গাঁট্টা—এর দ্বারা, আর আমাদের যুগের Barnard Smith সাহেবের পাটীগণিত বিশেষ প্রচলিত ছিল, সেই Barnard Smith-এর বইয়ের প্রত্যেক অঙ্কটি নিয়মিত-ভাবে তাঁর চোখের সামনে ব'সে-ব'সে কষা—এই দুইয়ের সমন্বয়ে আমাকে পাটীগণিতে, মায় পরে বীজগণিতে আর জ্যামিতিতেও পোক্ত ক'রে দিলে। ১৯০৭ সালে, এই গাঁট্টার দাওয়াই প্রয়োগের পাঁচ বছর পরে, যখন আমি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিই, তখন যে-গণিতের পরীক্ষায় ফেল হবার আশঙ্কা মনে এক সময়ে প্রবল ছিল, তাতে ১৬০ পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে ১২২ পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম দশ জনের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রতে পারি। আমাদের অধ্যয়নের অন্যতম সার্থকতা হ'য়েছে, যখন ভবিষ্যৎ কালে গর্বের সঙ্গে আমাদের কথা অনুগামীদের কাছে আমার শিক্ষকদের ব'ল্‌তে শুনেছি। যখন এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিই, তখন হেড-মাষ্টার জগবন্ধু ঘোষ মহাশয়ের কী আগ্রহ আর যত্ন, যাতে আমি ভালো ফল করি। তিনি বেতন না নিয়ে পরীক্ষার পূর্বে এসে-এসে আমার পাঠ দেখে দিতেন, প্রবন্ধ লিখ্‌তে দিতেন, সংশোধন ক'র্‌তেন, আর পরীক্ষায় আমি জলপানি পাওয়ায় (আমার মা তখন ছিলেন না) বাবার যত আনন্দ হ'য়েছিল, আমার হেড-মাষ্টার মহাশয়ের আনন্দ বুঝি তার চেয়ে কম ছিল না।

আজকাল ছাত্রদের জন্য ইস্কুল-লাইব্রেরি, কত সুন্দর সুন্দর বই, বাঙলা সচিত্র পুস্তক, আর খেলাধুলোর কত পরিপাটি আয়োজন—এ-সব কি রকম সহজলভ্য হ'য়েছে। আমাদের সময়ে এ-সব কিছু ছিল না। মোতী শীলের বিনা বেতনের ইস্কুল ব'লে, এক এক ক্লাসে অসম্ভব রকম বেশি ছেলে ভর্তি হ'ত। নির্দিষ্ট সংখ্যার বালাই ছিল না ; আমাদের ক্লাসে অনেক ছেলে, বেঞ্চে স্থানের অভাব ছিল ব'লে, ভূঁয়েই ব'স্‌ত। বিশেষতঃ তখনকার দিনের সাতের আর আটের শ্রেণীতে।

যখন চতুর্থ শ্রেণীতে উঠ্‌লুম, তখন ক'লকাতায় হ্যারিসন রোড আর কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে YMCA, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় যুবক সংঘের শাখা হিসাবে ইস্কুলের ছেলেদের জন্য একটি ক্লাব খোলা হ'ল—YMCA, Boys' Branch। বাড়ি

থেকে ইস্কুলে যাবার পথে পড়ে, আমিও তার সদস্য হই—অল্প চার আনা না আট আনা মাসিক চাঁদায় এই ক্লাবের ব্যায়ামশালা, স্নানাগার, পুস্তকালয়, পাঠাগার, মাসিক নানা অধিবেশন, বাইরে ভ্রমণের সুযোগ, এই-সবের অধিকার মিল্‌ত। এখানে এসে নানা ইংরিজি বই পড়বার সুযোগ হয়, আর এখানকার পরিচালক, ছাত্রদের কাছে প্রিয়, খাসা-বাঙলা-বলিয়ে' পাদ্রি আর্থার লি-ফিভর সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে এখানে ছাত্রদের তদারক ক'র্‌তে নিযুক্ত হন পরমশ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস মহাশয়—ছাত্র-জীবনে এঁর সঙ্গে পরিচয় আর এঁর স্নেহ লাভ আমার পক্ষে একটি বিশেষ আনন্দের স্মৃতি। ওদিকে ইস্কুলে, আমরা জন কয়েক সহপাঠী মিলে চতুর্থ শ্রেণী থেকেই একটি পাঠচক্র সহজ ভাবেই গ'ড়ে তুলি—তা'তে আমার অন্যতম সহপাঠীদের মধ্যে প্রভাত বর্ধন (মেজর পি. [প্রভাত] বর্ধন নামে পরিচিত, জনহিতকর অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ রূপে আত্মদান ক'রেছিলেন) আর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস (ক'লকাতার একটি বড়ো যন্ত্র-পাঁতির আমদানি-কারবারের আর কারখানার মালিক)—এঁরা ছিলেন প্রধান। এই পাঠচক্রে ব'সে ব'সে, দুপুরে টিফিনের ছুটির সময়ে আমরা তারস্বরে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে নানা রকম ইংরিজি বই প'ড়্‌তুম —Dickens, Scott, Dicks ব'লে একজন বাজে ইংরিজি উপন্যাস-লেখকের বই—আর প'ড়্‌তুম স্বামী বিবেকানন্দের রচনা আর বক্তৃতাবলী। এইভাবে কিশোর বয়সে, আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান সংগঠন-কারী, চিন্তা-নেতা আর কর্মী বীর বিবেকানন্দের মহান্‌ উক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটে, আর এই পরিচয়কেই আমার ইস্কুলের জীবনে অন্যতম বড়ো জিনিস ব'লে এখন মনে হয়।

ছেলেবেলার কথা ব'ল্‌তে গেলে, সে-সময়কার আর্থনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে দুই-একটা কথাও ব'ল্‌তে হয়। আমাদের বাড়িতে ক'লকাতার আর পাঁচটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো নিয়ম ছিল যে সারা মাসের চা'ল, দা'ল, তেল, নুন, ঘী, আটা, গুড়, চিনি, বেনে-মশলা প্রভৃতি এক-সঙ্গে কিনে রাখা হ'ত। আলুও মন হিসাবে কিনে ঘরে রাখা হ'ত। খালি চার পাঁচ আনার শাক সব্‌জি বেগুন পটল মুলো প্রভৃতি, আর চার আনা কি আট আনার মাছ, রোজ বাজার থেকে আস্‌ত। সিমলা বাজারের গোবর্ধন পাল-নগেন্দ্রনাথ দে'র গোলদারি দোকান থেকে ঠাকুরদাদা "মাস-কাবারির বাজার" ক'রে আন্‌তেন, অনেক সময়ে আমরাও তাঁর সঙ্গে যেতুম। চা'ল তখন বোধ হয় দুই আড়াই টাকা

মন ছিল—একবার কিছু বেড়ে যাওয়ায় ঠাকুরমা মাথায় হাত দিয়ে প'ড়্লেন—চার টাকা চালের মন! ছেলেপিলেকে খাওয়াবো কী ক'রে? ঠাকুরদাদা মাছ মাংসের পক্ষপাতী ছিলেন না—তিনি তাঁর নাতিদের গরম ভাত কলাইয়ের দা'ল আর সঙ্গে খুব খানিকটা ঘী, এই খাওয়ানোর পক্ষে ছিলেন। খাঁটি ঘী তখন ছিল ৩২ টাকা মন—ঠাকুরদাদা প্রতি মাসে দশ সের চন্দ্রকোণার মট্‌কি কিংবা হাথরসের দশ-সেরা টিন আন্‌তেন, কখনও মাসের মাঝেও ২।৪ সের বেশি আন্‌তে হ'ত। সারা ছাত্রজীবনে এই খাঁটি ঘীটুকু ঠাকুরদাদার দয়ায় জুটেছিল। আর সে কী ঘী! অমন দানাদার সুরভি ভয়ষা ঘী আজকাল তো অলভ্য। এই ঘীয়ের জোরেই শরীর ভালো ছিল, পরিশ্রম ক'র্‌তে পার্‌তুম। গরম ভাতে বেশ একথামচা খাঁটি ভয়ষা ঘী, খানিকটা কলায়ের কি সোনা মুগের দা'ল, আর তার উপর আলুভাজা—এই ভোজের স্বাদ এখনও যেন মুখে লেগে আছে। কাপড়-চোপড়ের বালাই খুব ছিল না—এক জোড়া জুতায় বছর চালাতে হ'ত। দাদার জুতো ছোট ভাইয়েরা প'র্‌ত। ছেলেদের জন্য ছাতার পাট ছিল না—যেন তেন প্রকারেণ স্লেট মাথায় দিয়ে জল বাঁচিয়ে ইস্কুলে যেতুম বর্ষাকালে। ক'লকাতায় ঘোড়ায়-টানা ট্রাম ছিল, আর ছিল শেয়ারের কেরাঞ্চি গাড়ি। শ্যামবাজার, সুকিয়াস্ স্ট্রীট থেকে ডালহৌসি স্কোয়ার ৮ পয়সা ৬ পয়সা ৫ পয়সা শেয়ারে চার জন (কখনও ছাতে গাড়ির চালকের পাশে আর একজন) ক'রে কুঠিয়াল বাবুরা আপিস ক'রতে যেতেন। বাড়ি ফেরবার সময়ে বিকালে সকলে বেশির ভাগ হেঁটেই ফিরতেন। আমরা তো রোজই সুকিয়াস্ স্ট্রীট থেকে হ্যারিসন রোড আর হ্যালিডে স্ট্রীট (এখনকার চিত্তরঞ্জন আভেনিউ) পর্য্যন্ত হেঁটেই ইস্কুল ক'রতুম। বাবা ছেলেবেলায় আর যৌবনকালে কুস্তি ক'রতেন, শক্তিশালী ব'লে তাঁর খ্যাতি ছিল। অল্প-স্বল্প ব্যায়াম করার অভ্যাস আমাদেরও হ'য়েছিল—তা'তে ক'রে শরীর সারা জীবন মোটের উপর ভালোই আছে।

সে যুগে সিনেমা অজ্ঞাত ছিল। চা সবে মাত্র লোকে খেতে শিখ্‌ছে। সিনেমার বদলে ছিল নানা পূজা-পার্বণে যাত্রা—"শখের যাত্রা" বা "পেশাদারি যাত্রা"। থিয়েটার অবশ্য ছিল, কিন্তু পয়সা খরচ ক'রে থিয়েটার দেখ্‌তে যাওয়ার কথা, ইস্কুলের ছেলে কল্পনাও ক'রতে পারত না। চপ-কাটলেটের হোটেল বা রেস্তোরাঁর সূত্রপাত হ'চ্ছে—মাতালের মুখ-রোচক খোরাক ব'লেই

চপ-কাটলেটের দু'-একটা দোকান কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে আর অন্যত্র শুঁড়ীখানার পাশে দেখা দিচ্ছে। তখন আমাদের কাছে লোভনীয় ছিল—বড়বাজারের হিন্দুস্থানী দোকানের শুদ্ধ ঘীয়ে তৈরি পশ্চিমা মেঠাই বোঁদে, কিশমিশের সিঙাড়া, হিঙের কচুরি, মুগদল, অমৃতী, দালমোট, দা'লের সেমুই, মুগের দাল ভাজা, বাদামের আর পেস্তার বরফি, গোলাবজাম, এই-সব। আজকালকার ছেলেরা এ-সব শুনে হাসবে।

যা-হ'ক, তখন কর্তা ব্যক্তিদের আজকালকার যুগের মতন এত চিন্তাগ্রস্ত দেখি নি। জীবন কঠিন হ'লেও সহজ ছিল, মোটের উপরে সুখেরই ছিল— ইংরেজের শাসন আর শোষণ সত্ত্বেও। সে জীবন চিরতরে অন্তর্হিত। তখন আমরাও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখ্‌তুম, বঙ্কিম আর বিবেকানন্দের রচনা থেকে বাণী থেকে অনুপ্রেরণা পেতুম, স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ দিচ্ছিলেন প্রাণভরে তাঁদের পূজা ক'রতুম। রবীন্দ্রনাথ তখন আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে নেতারূপে দেখা দিয়েছেন। তোষণ-নীতির ভয়াবহ পরিণাম—ভারতের বিভাগ আর পাকিস্তানের স্থাপন—তখন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

শারদীয়া বিশ্ববার্তা, বঙ্গাব্দ ১৩৫৭। 'পথ-চল্‌তি' প্রথম খণ্ডে সংকলিত (১-৬৯)।

শৈশব-স্মৃতি

অতি শিশুকালে, বোধ হয় যখন পাঁচ কি ছয় বছর আমার বয়স হবে, তখন মাস খানেকের জন্য আমাদের পাড়ার এক পাঠশালায় প'ড়্‌তে যেতুম। এ প্রায় ৫৪-৫৫ বছর পূর্বেকার কথা। সুকিয়াস্ স্ট্রীট, আজকার কৈলাস বসু স্ট্রীটের উত্তর দিকে চাল্‌তা-বাগান পল্লীতে আমাদের বাড়ি ছিল। তখনকার দিনের ক'লকাতার চেহারাই ছিল আলাদা। চোখ বুজে চিন্তা ক'রে দেখ্‌লে সে যুগের সুকিয়াস্ স্ট্রীটের ছবি এখনও বেশ মনে পড়ে। এখন রাস্তার ধারে কোথাও এক ছটাকও খালি জমি দেখা যায় না, কিন্তু তখন এখানে-ওখানে-সেখানে খালি মাঠের ছড়াছড়ি। আর মাঝে-মাঝে ছোটো-ছোটো পুখুর আর ডোবা। কোঠা বাড়ি এত ছিল না, আর বেশির ভাগ কোঠা বাড়ি একতলা, সদর দরজার পাশে একটু রোয়াক, ছোটো-ছোটো জানালা, অনেক সময় জানালার গরাদে' কাঠের, রঙের বদলে বেশির ভাগ আলকাতরা দিয়ে রঙানো জানালা আর দরজা। খোলার চালের বাড়ি এদিকে-ওদিকে দু'চারখানা ছিল, কিন্তু গোলপাতায় ছাওয়া, বাঁখারি আর মাটির দেওয়ালের ঘর তখন চারিদিকে দেখা যেত। সুকিয়াস্ স্ট্রীট রাস্তায় সকলের চোখে-পড়ার মতো একটি ইমারত ছিল, সেটি এখনও আছে, সেটি হ'চ্ছে মহেশ ঘোষের প্রতিষ্ঠিত শিবালয়। এই মন্দিরটির একটু বিশেষত্ব আছে। এটির মধ্যে এক-ই খিলানের ভিতর ঠাকুরের ঘর—যাকে "গর্ভগৃহ" বলে—আর ঘরের বাইরের দরদালান তৈরি হ'য়েছিল। মদন মিত্রের গলির বাঁক থেকেই এই সাদা শিবের মন্দির আর তার সামনের কতকগুলি না'রকল গাছ দেখা যেত'। এই মন্দিরটি আমার ছেলেবেলার একটি উজ্জ্বল স্মৃতি। আমার দাদা যে পাঠশালায় পড়্‌তে যেত', সেটি এই শিবের মন্দিরের সামনেই গোলপাতায় ছাওয়া একটি ছোটো বাড়ির ভিতরে, খোলা উঠানে ব'স্‌ত। বাড়িটির দরজা দিয়ে ভিতর থেকে রাস্তার ওপারে মন্দির দেখা যেত'। রাস্তার উত্তর দিকে পাঠশালাটি ছিল, এই পাঠশালা থেকে টানা পশ্চিমে অভয়চরণ লাহার বিরাট প্রাসাদ, আর তার বাইরের ঘোড়ার আস্তাবল পর্য্যন্ত একখানাও কোঠা বাড়ি ছিল না। রাস্তার দক্ষিণ ধারেও শিবালয়ের পরে তাই। দাদা রোজ সকাল বেলা গুড়-মুড়ি, কিংবা বাসি রুটি আর আলু-

পটোল বা শাক ভাজা আর একটু দুধ খেয়ে পাঠশালা ক'র্‌তে যেত'। দাদা আমার চেয়ে এক বছরের বড়ো। আমারও খুব ইচ্ছে হ'ত আমিও যাই, কিন্তু যেতে পেতুম না। যে দিন সকালে মা ব'ল্‌লেন, আজ থেকে তুমি পাঠশালে যাবে, সেদিন আমার কী আনন্দ! দাদা তখনকার দিনের রেওয়াজের মতো তালপাতার পাততাড়ি নিয়ে যেত'। হাতে দড়িতে ঝোলানো মাটির দোয়াত, তা'তে চাল পুড়িয়ে হীরাকস আর কী সব মিলিয়ে ঘরে মায়ের হাতের তৈরি কালি থাকৃত, পাছে কালি প'ড়ে যায় সেই জন্য মাটির দোয়াতের ভিতর একটা ছোটো ন্যাকৃড়া পূরে দেওয়া হ'ত, তা'তে কালি চ'ল্‌কে প'ড়্‌ত না, আর সঙ্গে থাকৃত একটি খাঁকের কলম। বোধ হয় তখনও স্লেটের প্রচলন তেমন হয় নি। এই পাততাড়ি দড়ি দিয়ে বেঁধে আর পড়বার বই বর্ণমালা প্রথম ভাগ কি দ্বিতীয় ভাগ আর ধারাপাত, একটা ছোটো আসনে বা মাদুরে জড়িয়ে নিয়ে, দাদা পাঠশালায় যেত'। আমাদের সময়ে ছোটো ছেলেদের হাফ-প্যাণ্ট পরার রেওয়াজ ছিল না, পাঁচ থেকে ছয়, সাত, আট বছর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেরা হয় ধুতি প'র্‌ত আর নয় দিগম্বর হ'য়ে বেড়াত। ধুতির সামনে কোঁচা ক'রে ছেলে বয়সে আমরা রাখ্‌তে পারতুম না। সেই জন্য প্রায়ই আমরা কোঁচা না ক'রে ধুতির সামনেটা দড়ির মতন ক'রে নিয়ে কোমরে ফাঁস দিয়ে বেঁধে প'র্‌তুম— এ রকম ক'রে কাপড় পরাকে আমরা ব'ল্‌তুম "গেরো দিয়ে কাপড় পরা"; কোথাও কোথাও একে "রাখালে' গেরো" বলা হ'ত। আমাদের গায়ে ছিটের কামিজ আর গলাবন্ধ কোট ছাড়া অন্য জামা উঠ্‌ত না। দাদার কাপড় আর জামা প'রে আর নোতুন পাততাড়ি নিয়ে যেদিন দাদার পাঠশালায় গেলুম, সেদিনের অস্পষ্ট স্মৃতি কিছু কিছু মনে আছে। সঙ্গে আমার জন্য আলাদা মাদুর সেদিন কেনা হয় নি, ঠিক হ'ল দাদার সঙ্গে এক মাদুরেই ব'সবো। বাড়ির ঝি সেদিন আমাদের সঙ্গে গেল। বাড়ির খুব কাছেই পাঠশালা। ঐ পাঠশালার পাশেই আমাদের মুদির দোকান ছিল, ঝিয়ের সঙ্গে অনেক সময়ে সেখানে যেতুম, যখন ঝিকে কিছু কিন্‌তে পাঠানো হ'ত। এই মুদির দোকানের কথা পরে ব'ল্‌ছি।

পাঠশালার বাড়ির ভিতরে গিয়ে মনটা একটু দ'মে গেল। অতি সাধারণ গোলপাতা-ছাওয়া কুঁড়ে কতকগুলি। রাস্তার ধারে যে ঘরগুলি, সেগুলির দরজা রাস্তার উপরে, তা'তে কতকগুলি হিন্দুস্থানী কাহার আর ভারী অর্থাৎ

মুটে' থাক্‌ত। এই ঘরগুলো, আর বাড়ির ভিতরে আর এক সারি ঘর, আর মাঝখানে উঠোন। গুরু মশাই তাঁর স্ত্রী আর ছেলেপুলে নিয়ে উঠোনের পাশে একটি ঘরে থাকতেন, আর দু'-তিনখানি ঘরে অন্য ভাড়াটে' থাক্‌ত। এই ঘরগুলির সামনে একটু দাওয়া বা রোয়াক, তা'তে একসারি চক্‌চকে হ'লদে বাঁশের খুঁটি, খুঁটির মাথায় বাঁখারিতে তৈরি চালের বাতা, তার উপর গোল-পাতার ছাউনি। গুরু মশাই উঠোনে দাওয়ার সামনে একখানি ছোটো কাঠের টুলের উপর ব'সতেন। একখানা মোটা কাগজে জড়ানো কতকগুলি কাগজপত্র তাঁর হাতের কাছে থাক্‌ত, আর থাক্‌ত দোয়াত কালি। তিনি মাঝে মাঝে অন্য লোকের হ'য়ে চিঠি লিখে দিতেন, আর হিসেব ক'রে দিতেন। একগাছা লম্বা বেতও তাঁর হাতের কাছে থাক্‌ত। আর থাক্‌ত একটি ডাবা হুঁকো, তার গলায় একটি দড়ি বাঁধা, এই দড়ি দিয়ে হুঁকোটি যখন তিনি তামাক খেতেন না একটি বাঁশের খুঁটির গায়ে পেরেকে টাঙ্গিয়ে রাখ্‌তেন। গুরু মশায়ের সামনে উঠোনের উপরে দু'-তিন সার ছেলে নিজেদের আসন মাদুর পেতে, লম্বা সার দিয়ে ব'স্‌ত। সামনে তাদের পাততাড়ি আর দোয়াত কলম। আমি দাদার সঙ্গে গিয়ে দাঁড়ালুম, ঝি গিয়ে গুরু মশাইকে ব'লে দিলে যে, আজ থেকে আমি পাঠশালায় ভর্তি হ'লুম। গুরু মশাই বেশ খুশি-ই হ'লেন, তার পরে আমাকে ডেকে উৎসাহ দিলেন, "বেশ, বেশ, আজ থেকে রোজ সকালে পাঠশালে আস্‌বি, আর আসবার সময় কান্নাকাটি ক'র্‌বি নি, আর মন দিয়ে প'ড়্‌বি ; নইলে এই বেত দেখ্‌ছিস্‌ তো, বেত মেরে তোর হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় ক'র্‌বো।" ছেলেবেলায় বাবাকে বড়ো ভয় ক'র্‌তুম, কিন্তু গুরু মশায়ের এই কথায় বড়ো ভয় হ'ল। আমি ঘাড় নেড়ে ব'ল্‌লুম, "হ্যাঁ, মন দিয়ে ভালো ক'রে প'ড়বো।" তার পরে দাদার পাশে এসে ব'সে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

এই পাঠশালে কত দিন প'ড়েছিলুম মনে নেই। বোধ হয় মাস খানেক কি বড়ো জোর মাস দু'য়েক হবে। বাড়িতেই মায়ের কাছে বর্ণপরিচয় হ'য়েছিল। যাদের পাঠশালায় "হাতে-খড়ি" হ'ত তারা প্রথমটায় বোধ হয় রামখড়ি দিয়ে মাটিতে গুরু মশায়ের হাতের লেখা অক্ষর ধ'রে "দাগা বুলোত"। গুরু মশায় যেমন যেমন "দেগে দিতেন", তেমনি তেমনি ছেলেরা লিখ্‌তে শিখ্‌ত। তখন ব্ল্যাকবোর্ডের কথা পাঠশালায় কেউ জান্‌ত-ই না। মাটিতে দাগা

বুলোনোর পর তাল-পাতায় কালি-কলম দিয়ে ছেলেরা লেখায় "হাত পাকাত"। আমার দাদাকেও তালপাতায় লিখ্‌তে হ'য়েছিল, আর আমিও কিছু দিন ঐ তালপাতাতেই পাঠশালায় ব'সে ব'সে লিখ্‌তুম। বাড়ি ফিরলে পরে, লেখা তালপাতাগুলি মা ধুয়ে দিতেন, তার পরের দিন আবার এই ধোয়া পরিষ্কার পাতায় লেখা চ'ল্‌ত। যারা ছু'-চার পয়সা খরচ ক'র্‌তে পার্‌ত, সেই-সব ছেলে কালি-কলম দিয়ে কাগজের উপরে "হাত পাকাত"। এই কাজের জন্য এক রকম পাতলা বাদামি বা হ'লদে কাগজ ব্যবহার হ'ত, সেই কাগজকে "বালির কাগজ" ব'ল্‌ত। এক ভাঁজ ক'রে একটা কাগজ মুড়ে বড়ো বড়ো আকারে খাতা হ'ত। সেই খাতায় একবার নয়, ছু'বার, তিন বার, কখনও-কখনও চার-পাঁচ বার সোজা ভাবে আড়াআড়ি আমরা লিখ্‌তুম—বাঙ্‌লা, আর তার পরে যখন ইংরিজি ধরি, তখন ইংরিজি। এই রকম, লেখার উপর বার বার লেখাকে আমরা ব'ল্‌তুম "মক্শ" করা। "মক্শ" ক'রে ক'রে কোনও কোনও পাতায় ফাঁক আর দেখা যেত না। আমি বোধ হয় পাঠশালাতেই কাগজে লেখা শুরু ক'রেছিলুম।

আমাদের গুরু মশাইটির চেহারা প্রায় ভুলে গিয়েছি। তবে আবছা-আবছা মনে হয়, তিনি পাতলা একহারা চেহারার লোক ছিলেন, খালি গায়ে টুলে ব'সে আমাদের পড়াতেন বা লেখাতেন। তাঁর হাতের কাছে বেত থাক্‌লেও তিনি বেতের ব্যবহার বড়ো একটা ক'র্‌তেন না। পাঠশালা বন্ধ হবার আগেই খানিকক্ষণ ধ'রে আমাদের "ধারাপাত" মুখস্থ করানো হ'ত। ছু'জন "সর্দার প'ড়ো" বা প্রধান ছাত্র স্থর ক'রে ক'রে "শট্‌কে'" বা "শতকিয়া", কড়াকে' প্রভৃতি একশ' পর্য্যন্ত চেঁচিয়ে ব'ল্‌ত, আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারস্বরে সেই রকম স্থরে ব'লে যেতুম। এই ভাবে "নামতা" বা গুণফল আমরা অভ্যাস ক'র্‌তুম। এই স্থর ক'রে ধারাপাত মুখস্থ করা, এটা আমার বেশ লাগ্‌ত—বিশেষ ক'রে যখন জান্‌তুম যে, ধারাপাত আবৃত্তি করার পরেই সারা দিনের মতো ছুটি।

পাঠশালা থেকে ফেরবার পথে মহেশ ঘোষের শিবালয়টি রোজই একবার ভালো ক'রে দেখে নিতুম। মন্দিরের মধ্যে একটি কালো পাথরের বিরাট শিবলিঙ্গ আছে। সেটি খুব পালিশ করা, চক্‌চকে'। ইচ্ছে হ'ত, শিবলিঙ্গটির গায়ে একটু হাত বুলিয়ে' দিই। পরে একটু বড়ো হ'য়ে এই মহেশ ঘোষের

সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছিলুম। মহেশ ঘোষ আমাদের পাড়ায় সেকালে ছিলেন যাকে ইংরিজিতে বলে একটি character অর্থাৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। মহেশ ঘোষ অশিক্ষিত ছিলেন। পাড়ার লোকেরা তাঁকে সহজ ভাবে "ময়শা গয়লা" ব'লে উল্লেখ করত। বাবার ছেলেবেলায় মহেশ ঘোষ বৃদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন। তিনি জাতিতে সদ্‌গোপ ছিলেন, আর পেশা ছিল গোরু রেখে দুধ বিক্রি। তাঁর এক বিরাট্ গোহাল ছিল। এ-সব আমাদের জন্মাবার ঢের আগেকার কথা। বড়ো-বড়ো হাঁড়ি ক'রে তাঁর দুধ নোতুন বাজারে বিক্রি হ'তে যেত (চিৎপুর রোডের ধারে বীডন্ স্কোয়ারের সামনে)। মহেশ ঘোষ খুব খাঁটি মানুষ ছিলেন, তাঁর একটা গর্বের বিষয় ছিল যে তাঁর দুধে তিনি কখনও জল মেশাতেন না। মহেশ ঘোষের চাকরেরা সুবিধে পেলেই দুধে জল ঢাল্‌ত, আর এই ভাবে কিছু পয়সা ক'র্‌ত। এক দিন নোতুন বাজারে অন্য গোয়ালাদের সঙ্গে মহেশ ঘোষের ঝগড়া হয়, মহেশ ঘোষ জাঁক ক'রে বলেন যে কেবল তাঁর-ই দুধ খাঁটি থাকে, একটুও জল দেওয়া হয় না। কিন্তু সেদিন দুধে জ্বাল দিয়ে ক্ষীর ক'রে দেখানো হ'ল যে, তাঁর দুধেও জল ঢালা হয়। এইতে মহেশ ঘোষ দিব্যি গাল্‌লেন, তাঁর দুধ এইবার থেকে ভিজে গামছা দিয়েও ছাঁকা হবে না; আর তাঁর চাকরদের উপর এমনি কড়া নজর রাখবেন যে দুধে জল আর প'ড়্‌বে না। তাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষাও ক'রেছিলেন, আর শেষে তাঁর দুধের খুব সুনামও হয়। তখন নাকি না'রকল মালায় ক'রে দুধ মেপে বিক্রি হ'ত—না'রকল মালায় বাঁশের বাঁখারির হাতল, ঠিক যেন বড়ো হাতা। আর সকলের দুধের চেয়ে, মহেশ ঘোষের দুধের জন্যে মালা-পিছু এক পয়সা বা দু'পয়সা ক'রে বেশি দাম ধরা ছিল। এই ভাবে তাঁর দুধের ব্যবসায় খুব ফেঁপে ওঠে, আর তাঁর গোহালে অনেক গোরু আসে। পরে মহেশ ঘোষ বুড়ো হ'য়ে—কেন তা জানি না—তাঁর দুধের ব্যবসায় বন্ধ ক'রে দেন, আর সব দামী গোরু বিক্রি ক'রে দেন। সঞ্চিত টাকা, আর ব্যবসায় তুলে নেবার সময় সব গোরু বিক্রি ক'রে যে টাকা পান, দুই মিলিয়ে' তিনি এই মন্দির করেন।

বাবার কাছে শুনেছি, মহেশ ঘোষ মন্দির তৈরি ক'রবার জন্য একটি হিন্দু বাঙালী মিস্ত্রিকে কোন্ পাড়াগাঁ অঞ্চল থেকে ক'লকাতায় আনেন। তখন এই-সব অখ্যাত, অজ্ঞাতনামা হিন্দু আর মুসলমান গ্রাম্য মিস্ত্রি, প্রাচীন পদ্ধতি ধ'রে, অবলীলাক্রমে বড়ো-বড়ো দু'তিন তলার প্রাসাদ, ছোটো-বড়ো নানা

রকমের মন্দির আর অন্য ইমারত তৈরি ক'রতে পারত। এই মিস্ত্রি খুব ওস্তাদ কারিগর ছিল, আর মহেশ ঘোষকে অনেক সময় যা-তা ব'লত। কিন্তু গুণী লোক ব'লে মহেশ ঘোষ কিছু ব'লতেন না। এক দিনের কথা বাবার কাছে শুনেছিলুম, মন্দির-নির্মাতা মিস্ত্রি এক দিন মহেশকে ডেকে ব'ললেন, মন্দিরের কাজের জন্য একখানি ভালো দই চাই। মহেশ ঘোষ ভাবলেন, মন্দিরের গাঁথুনির জন্য মশলায় হয়-তো দই লাগ্‌বে। তাই তিনি খুব ভালো একখানি দই তৈরি করিয়ে' আনালেন। তখন মন্দিরের পূরো গাঁথুনিও হয় নি। দইয়ের হাঁড়ি পেয়ে মিস্ত্রি বাঁশের ভারা বেয়ে একেবারে উঁচু মন্দিরের যতটা গাঁথা হ'য়েছিল তার উপরে গিয়ে ব'স্‌ল, আর ব'সে-ব'সে দইয়ের সদ্ব্যবহার ক'র্‌তে লাগ্‌ল। মহেশ ঘোষ তো চ'টে আগুন। মিস্ত্রি ব'ল্‌লে—শরীরটা একটু খারাপ ছিল—মনে হ'ল, একখানা ভালো দই খেলে আবার একটু চাঙ্গা হওয়া যায়, তাই তো তোমাকে ব'ললুম। আর দই খেয়ে এই হাতে যা কারিগরি দেখাবো, তাতে তোমার মন্দির চিরকালের মতো থাক্‌বে।

মহেশ ঘোষের নামে একবার একখানা ইংরিজি ওষুধের বিজ্ঞাপনের পুস্তিকা এসে প'ড়েছিল। বোধ হয় ক'লকাতার রাস্তার ডাইরেক্টরি দেখে সুকিয়াস্ স্ট্রীটে অবস্থিত বাড়ির মালিকদের নামের মধ্যে মহেশ ঘোষেরও নাম পেয়ে, বিলেত থেকে পাঠিয়ে' দেয়। Mother Sigel's Syrup এই ওষুধের নাম। মহেশ ঘোষ এই বিজ্ঞাপন পুস্তিকাখানি পেয়ে বড্ড খুশি হ'ন, আর যত্ন ক'রে বইখানি রেখে দেন। আর যে তাঁর বাড়িতে আসত, তাঁকে এই বইখানি দেখাতেন, আর বিশেষ গর্বের সঙ্গে ব'লতেন, "দেখেছ, বিলেতেও আমাকে চেনে।" হিন্দু মুসলমানদের সম্বন্ধে তিনি এই গল্পটি ব'লতেন—"আগে হিন্দু আর মুসলমান দুইয়ে এক ছিল, দুই জা'ত তখন ছিল না। তখন সকলেই দু'খানি শাস্ত্রগ্রন্থ মান্‌ত, একখানির নাম 'পুরাণ', আর একখানির নাম 'কোরান'। মুসলমানদের পূর্বপুরুষেরা হিন্দুদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কোরান বইখানি নিয়ে আলাদা হ'য়ে গেল। আর যাদের কাছে পুরাণ র'য়ে গেল, তাদেরই নাম হিন্দু। আবার যখন পুরাণ আর কোরান এক হ'য়ে যাবে, তখন হিন্দু আর মুসলমানও এক হ'য়ে যাবে।" এই গল্পটি তিনি ঐতিহাসিক সত্য ব'লে বিশ্বাস ক'রতেন।

আমাদের পাঠশালায় যাবার পথে সুকিয়াস্ স্ট্রীটের উপরে একটা

মস্ত মুদির দোকান ছিল। আমাদের সংসারের "মাসকাবারি বাজার", প্রতি ইংরিজি মাসের গোড়ায় বাবা মাইনে পাবার দু'-এক দিনের মধ্যেই আনা হ'ত। ঠাকুরদাদা সাধারণতঃ এই বাজার ক'রে আন্‌তেন। হেদুয়া পুখুরের কাছে মানিকতলা স্ট্রীটে এক বড়ো বাজার ছিল—সিমলার বাজার। সেই বাজারের সামনে খুব বড়ো একখানা গোলদারি দোকান ছিল, ৺গোবর্ধন পাল আর শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে—এঁদের দোকান ছিল। ঠাকুরদাদা এই দোকানকে "গোবর্ধন মুদি"র দোকান ব'ল্‌তেন। সারা মাসের উপযোগী চা'ল, দা'ল, তেল, ঘী, গুড়, চিনি, নুন, আটা, ময়দা আর মশলা সংগ্রহ ক'রে রাখা হ'ত। একটু বড়ো হ'য়ে ঠাকুরদার সঙ্গে এই দোকানে আমিও যেতুম। সেখানে বিরাট্ বিরাট্ বস্তার মধ্যে মন মন রকমারি চা'ল, সে-রকম বিরাট্ আকারের জালার আর গামলার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের দা'ল, মাটির মট্‌কির মধ্যে আর ছোটো-বড়ো টিনের মধ্যে ঘী, ঘরের অর্ধেকখানা জোড়া গুড়ের নাগ্‌ড়ি, সিমেণ্টের চৌবাচ্চা ভর্‌তি নুন, এ সমস্ত আমার শিশু-মনকে তখন যেন অভিভূত ক'রে ফেল্‌ত। ক্রমাগত নানান রকমের জিনিস, কাঁচা খাদ্যদ্রব্য, বড়ো-বড়ো দাঁড়িপাল্লায় ওজন হ'চ্ছে; খ'দ্দেরের ভীড়; একটি ছোটো বাক্স কোলের সামনে রেখে দোকানের মালিকেরা লম্বা সরু কাগজের ফালির উপর খস্‌খস্ ক'রে ফর্দ লিখ্‌ছেন, মুখে-মুখে হিসেব ক'রে টাকার অঙ্ক ফেল্‌ছেন; বাইরে ঝাঁকা নিয়ে ডজন খানেক পশ্চিমা মুটে' অপেক্ষা ক'রছে, ভিতরে এসে মাল ওজন ক'রছে, এরাই জিনিস-পত্র ঝাঁকায় ভ'রে মাথায় ক'রে খ'দ্দেরের বাড়ি পৌঁছে দেবে। সিমলের বাজারে এই বড়ো মুদির দোকানের কর্মব্যস্ততা আমার মনের উপর তখন খুবই ছাপ দিয়েছিল। সুকিয়াস্ স্ট্রীটের মুদির দোকানটি এত বড়ো ছিল না। সেখানে ঝিয়ের সঙ্গে কখনও কখনও ছোটো-খাটো দু' একটা জিনিস আন্‌তে যেতুম—হয়তো সাগু বা মিছরির দরকার, কিংবা ঘী বা তেল ফুরিয়ে গিয়েছে, তখন এই দোকান থেকেই আনা হ'ত। এই দোকানটিকে আমারা দোকানীর নামে "উত্তম-মুদির দোকান" ব'লে জান্‌তুম। দোকানের চারিদিকে নানা ধামার মধ্যে, মাটির গামলায় আর হাঁড়িতে চা'ল, দা'ল প্রভৃতি জিনিস রেখে, সামনে তেলের আর ঘীয়ের হাঁড়ি নিয়ে, বাঁশের উঁচু মাচার উপরে পসার সাজিয়ে' দোকানী ব'সে জিনিস বিক্রি ক'রত। খ'দ্দেরের বাটিতে বা অন্য পাত্রে ছোটো ছেঁদাওয়ালা কাঠের খুরির মতন

পাত্রের মধ্য দিয়ে বাঁশের হাতাওয়ালা না'রকল মালায় ক'রে হাঁড়ি থেকে তেল নিয়ে ঢাল্‌ত—ঐ কাঠের ছেঁদা-খুরিটি ফুন্দিলের কাজ ক'রত, তেল চারিদিকে ছড়িয়ে' পড়্‌ত না। মুদির সামনেই একটা মাটির গামলায় এক গামলা কড়ি থাক্‌ত, আর সেই গামলার উপর একটি কাঠের বারকোশ। সেই বারকোশটি ছিল তখনকার দিনের দোকানের Counter ; তার উপর জিনিস-পত্র রাখা হ'ত—খ'দ্দেরের বাটি, ঘটি, বোতল আর ওজন-করা জিনিসের ঠোঙা। কড়ির পাট আজকাল উঠে গিয়েছে। আমি যখন শিশু, তখনও দোকানে কড়ি চ'লত। আমার যত দূর মনে পড়ে, এক পয়সায় আশিটি কড়ি ছিল, আর পাঁচ গণ্ডা বা দশ গণ্ডা কড়ি নিয়ে অর্থাৎ কুড়ি বা চল্লিশটি কড়ি নিয়ে লোকে আধ পয়সা বা সিকি পয়সার জিনিস কিন্‌ত। আমাদের সময় সিকি-পয়সা সিকি-পয়সা ক'রে, এক পয়সায় চার রকম জিনিস কেনা যেত'। কড়ির ব্যবহার চট্‌ ক'রে উঠে গেল, জিনিস-পত্র দুর্মূল্য হবার সঙ্গে-সঙ্গে। কিন্তু এখনও আমরা ব'লি, "তার অনেক টাকা-কড়ি আছে"। উত্তম-মুদির দোকানে বারকোশ-কাউণ্টারের সামনে মাচার উপরে একটি ছোটো কাঠের চৌকির উপরে দোকানদার ব'স্‌ত। তার পাশে, মাথায় ছেঁদাওয়ালা একটা বাক্স থাক্‌ত, তার ভিতর টাকা-পয়সা ফেল্‌ত। দূরের গামলা বা ধামা থেকে কোনো জিনিস নিতে হ'লে, খুব লম্বা, বাঁশের হাতলে বড়ো মালা লাগানো থাক্‌ত, তাই দিয়ে জিনিস তুলে নিত'। একটা জিনিস আমার বেশ লাগ্‌ত, উপরের চালের বাঁশ থেকে একটা মোটা শক্ত দড়ি মুদির মাথার কাছে ঝুলত, তার তলায় কতকগুলো ন্যাকড়া দিয়ে মুঠো ক'রে বেশ একটা ধরবার জায়গা, যাতে হাত পিছলে না যায়। উঠে দাঁড়াতে হ'লে মুদি ঐ দড়ি ধ'রে উঠ্‌ত, আর দূরের জিনিস নিতে হ'লে দড়ি ধ'রে ঝুঁকে' নিত'। এখন শহরে এ রকম দোকান উঠে যাচ্ছে। সুকিয়াস্‌ স্ট্রীটের এই অঞ্চলটায় এখন পশ্চিমে পুরানো-লোহাওয়ালাদের গুদাম আর গদি হ'য়েছে। আর তাদের সব দো-তলা মাটকোঠা উঠেছে। অন্য প্রদেশের লোক এসে পাড়ার চেহারা একেবারে ব'দ্‌লে দিয়েছে।

উত্তম-মুদির দোকানের প্রায় সামনে, রাস্তার ওধারে একটি মুড়ি-মুড়কির দোকান ছিল। দেকানটি চালাত' একটি দাড়িওয়ালা বুড়ো বামুন, অতি রোগা হাড়-বা'র-করা চেহারা। একটি আধা-বয়সী স্ত্রীলোকও এই বামুনের সঙ্গে দোকানের মালিক ছিল। এখানে মুড়ি, মুড়কি, খই, চিঁড়ে, গুড়, বাতাসা,

ছাতু এই-সব তখনকার দিনের সাধারণ জলখাবার বিক্রি হ'ত। আর বিক্রি হ'ত, নানান রকমের তেলে-ভাজা খাবার—সকালে বিকালে দা'ল-বাটার ফুলুরি, বেগুনি, পেঁয়াজি, কচুরি, সিঙাড়া প্রভৃতি, আর গুড়ে পাকানো কটকটে নাড়ু, চালের গুঁড়ো তিল আর গুড়ের তৈরি আনন্দনাড়ু, যা গৃহস্থ-বাড়িতে পৈতে, ভাত প্রভৃতি উৎসব-অনুষ্ঠানে তৈরি হ'ত, আর কুঁচো গজা—গুড়ের রসে ফেলা তেলে ভাজা পাতলা-পাতলা গজা। আর শীতকালে, 'মুড়ির চাক', 'চিঁড়ের চাক' আর 'ছোলার চাক'—মুড়ি, চিঁড়ে-ভাজা আর ছোলা-ভাজা গুড়ে পাক ক'রে, হাতের চাপে গোল-গোল চাক্‌তি করা। ভালো খাবারের দোকান পাড়ায় ছিল না, একটু দূরে ছিল, সেইজন্য এই-সব খাবার-ই আমাদের কাছে বড়ো লোভনীয় ছিল। দোকানের মালিক বামুন ঠাকুর মিষ্টান্ন তৈরি ক'র্‌ছে, মালপো ভাজ্‌ছে, খই আর গুড় দিয়ে মুড়কি তৈরি ক'র্‌ছে, আর স্ত্রীলোকটি বালির খোলায় মুড়ি ভাজ্‌ছে,—পাড়ায় যখন ঘুরে বেড়াবার শক্তি হ'ল, তখন লোভী চোখে কত দিন দাঁড়িয়ে এই-সব ব্যাপার দেখেছি। এখনকার দিনের শহরের ছেলেরা যারা চকোলেট, টফি আর পেস্ট্রির মর্ম বুঝেছে, তারা কুঁচো গজা আর তিলকুটোর স্বাদ বুঝ্‌বে না। তখন ঐ মুড়ি-মুড়কির দোকানে কাঁদি-শুদ্ধ কলা বিক্রির জন্য ঝুল্‌ত—এক পয়সায় ছ'টা, একটু বড়ো হ'লে চারটে ক'রে চাঁপা কলা পাওয়া যেত; ভালো চাটিম মর্তমান কলা পয়সায় দু'টো বা একটা ছিল—পরে দু'পয়সায় একটাও হয়।

আমাদের ছেলেবেলায় স্বয়ংগচ্ছ যান অর্থাৎ মোটর কার, ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম, বাস্, এ-সব হয় নি। একটু সংগতিপন্ন ব্যক্তির বাড়িতেই গাড়ি আর ঘোড়া থাক্‌ত। এই গাড়ি আর ঘোড়া আমাদের শিশুজীবনের অভিজ্ঞতার আর কল্পনার অনেকখানি জুড়ে' থাক্‌ত। আমার মামার-বাড়িতে ঘোড়ার-গাড়ি ছিল। পাড়ার ধনী পরিবার লাহাদের বাড়িতে বড়ো-বড়ো ঘোড়া আর গাড়িও ছিল। আজকালকার ছেলেরা এই ঘোড়ার প্রতি আমাদের শিশুমনের আকর্ষণ বুঝ্‌তে পার্‌বে না। শহরের ছেলেদের মধ্যে ঘোড়া নিয়ে মাতামাতি আজকাল আর দেখা যায় না। ছেলেবেলায় আমরা প্রায়ই "ঘোড়া ঘোড়া" খেল্‌তুম। একজন হ'ত ঘোড়া, তার মুখে দড়ির লাগাম লাগিয়ে' পিছনে-পিছনে ছুটে আর একজন সেই ঘোড়া চালাত'। নিজেরাও ঘোড়া সেজে, ঘোড়ার অনুকরণে কত রকম দৌড়-ঝাঁপ আমরা ক'র্‌তুম। আমাদের বাড়ির

কাছে কিছু দিনের জন্য এক ভাড়াটে'-গাড়ির আড্ডা ব'সেছিল। লাহা বাবুদের মাঠে এক বিরাট্ মাটকোঠা উঠ্ল, তার নিচে গোটা কুড়ি-পঁচিশ ঘোড়ার আস্তাবল, আট-দশখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ি, তার বেহারী সহিস আর গাড়োয়ান। ঘোড়ার পাশেই খাটিয়া পেতে তারা শুত'। মাটকোঠার উপরের তলায় এই ঘোড়া আর গাড়ির মালিক একজন খুব জবরদস্ত হিন্দুস্থানী বিধবা মহিলা থাকত। ঘোড়া আজকাল ছেলেরা তাদের কল্পনা থেকে অনেকটা হারিয়ে' ফেলেছে—এখন তারা রোলস্-রয়েস নিয়ে রোমান্স করে। কে একজন ব'লেছিলেন, গোলা-বারুদ কামান এসে সাবেক কালের chivalry —"দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি" নারীর রক্ষক বীর যোদ্ধাদের পাট—তুলে' দিয়েছে। আমার মনে হয়, আজকাল যন্ত্রচালিত গাড়ি এসে ঘোড়ার অন্ন যেমন মেরে দিয়েছে, তেমনি আমাদের জীবনে প্রাচীন কাল থেকে যে রোমান্সের ধারা চ'লে এসেছে তাকেও বাতিল ক'রে দিয়েছে। Other times, other manners—যা অবশ্যম্ভাবী, যা ভবিতব্য, তা হবেই, কিছু-ই চিরস্থায়ী থাকে না। কিন্তু ছেলেবেলার আকর্ষণ, বিদেশী বা ভারতীয় Knights in armour, on horseback, কিংবা মহাভারতের বা ইলিয়াদের দু'চাকার ঘোড়ায়-টানা রথে অর্জুন আর আখিল্লেউস্—এদের উজ্জ্বল স্মৃতি ঘোড়া, আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে চ'লে যাওয়ায়, আমাদের শিশু বা কিশোর মনকে আর আগেকার মতন আকুল ক'রে তুল্বে না ॥

শারদীয়া বসুমতী, বঙ্গাব্দ ১৩৫৮। 'পথ-চল্তি' প্রথম খণ্ডে সংকলিত (১৩৬৯)।

মানি-কাকা

আমার ছেলেবেলার আর কৈশোর-কালের স্মৃতির মধ্যে 'মানি-কাকা' একটা বেশ লক্ষণীয় স্থান জুড়ে আছেন। আমার মামার-বাড়ির কথায় আমার শৈশব ও কৈশোর জীবন ভ'রে আছে। হাওড়ার মধ্যে তখনকার দিনের সুন্দর একটি বর্ধিষ্ণু গাঁয়ে আমার মামার-বাড়ি, এই শিবপুর গ্রামটি এখন আর গ্রাম নেই, হাওড়া শহরের এক ঘনবসতিপূর্ণ ঘিঞ্জি পল্লীতে পরিণত হ'য়েছে। সেখানেই আমি ভূমিষ্ঠ হই। মায়েরা পাঁচ বোন, দুই ভাই; মাতামহকে কখনও চোখে দেখি নি*, তবে তিনি ছিলেন স্বগ্রামে ছোটোখাটো জমিদার, বেশির ভাগ শিবপুরে তাঁর নিজের বাড়িতে বাস ক'রতেন। ক'লকাতায় এক মস্ত-বড়ো ইংরেজ সওদাগরের হাউসে বড়ো-বাবু ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন স্বগ্রামবাসী অনেকের চাকরি ঐ সাহেবদের কোম্পানিতে তিনি ক'রে দিয়েছিলেন। দিদিমাকে কিন্তু জ্ঞান হওয়া থেকে দেখেছি। তিনি দাদামহাশয়ের মৃত্যুর পর থেকে আমার মামা নাবালক ছেলে দু'টিকে মানুষ ক'রে, বেশ প্রতাপের সঙ্গে পরিবার চালিয়ে' এসেছিলেন। শেষে অনেকগুলি পৌত্র-পৌত্রী দৌহিত্র-দৌহিত্রী আর তাদের কারো কারো ছেলে-মেয়েদের রেখে, তিন-চার দিন শিবপুরের ঘাটে গঙ্গাবাস ক'রে তবে দেহরক্ষা করেন।

ক'লকাতা থেকে মামার-বাড়ি যাবার নামেই আমরা উৎফুল্ল হ'তুম। সেখানে মায়ের অবাধ স্বাধীনতা ছিল, আর মাসিদের, তার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদেরও। কয় মাসতুতো ভাই-বোন মিলে কত না আড্ডা জমাতুম। হাওড়ার ও-অঞ্চলটা তখন ছিল নিতান্ত পল্লীগ্রামের মতন। এখানে ওখানে সেখানে ছোটো-ছোটো ডোবা, বড়ো-বড়ো পুখুর। খোলা মাঠ ছিল প্রচুর, আর তেমনি গাছ-পালা—বিশেষ ক'রে না'রকল গাছ। তখন আজকালকার মতন এত বাড়ি হয় নি। চটকল আর ময়দার কল গঙ্গার ধারে ২।৪-টে ছিল, কিন্তু গঙ্গার ধার তখনও বেশ খোলা ছিল। আর ছিল ঝক্‌ঝকে' তক্‌তকে', শহুরে' আবর্জনা স্তূপীকৃত হ'য়ে দেখা দিত না। সারা গ্রাম, মায় গঙ্গার ঘাট

---

* 'জীবন-কথা'য় সুনীতিকুমার তাঁর মাতামহ সম্পর্কে ব'লেছেন "—তাঁকে জীবনে আমার ৬।৭ বছর বয়সে বোধ হয় দুই একবার দেখেছি।" (পৃঃ ৪৩)—অ।

পর্য্যন্ত, ছিল আমাদের চলাফেরার অবারিত ক্ষেত্র। মামার-বাড়িতে তখন প্রথম সিমেণ্টের মেঝে হ'য়েছে, কতকগুলি ঘরে, আর একটি রোয়াকে। সিমেণ্টের মেঝেই আমাদের কাছে ছিল যেন মার্বেল-পাথরের। সেই মেঝে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে দেওয়া হ'ত, আর তার উপরে ঢালা হ'ত এক ধামা গরম-গরম মুড়ি, আর প্রত্যেকের হাতে থাকৃত কলা আর ছোটো-ছোটো পাথরের বাটিতে ক'রে খেজুরে' গুড়। আমরা ৮।১০জন মাসতুতো ভাই-বোন মিলে, কলা আর গুড় দিয়ে মেঝে থেকে সেই ঢালা মুড়ি মুঠো-মুঠো ক'রে নিয়ে গালে পুরে শেষ ক'রে ফেল্‌তুম, তার পরে খেতে হ'ত এক বাটি ক'রে দুধ। এ-সব যেন প্রতিদিন-ই চড়ুই-ভাতির আনন্দ।

মামার-বাড়ির পুরাতন স্মৃতির মধ্যে দু'টি মানুষের কথা এখনও মনে জল্‌জল্‌ ক'র্‌ছে। এক ছিল পুরাতন চাকর 'কাত্তিকে'। জাতিতে বোধ হয় মাহিষ্য ছিল। আমরা তাকে 'কার্ত্তিক দাদা' ব'ল্‌তুম। কেবল দিদিমা তাকে 'কাত্তিকে' ব'লে ডাক্‌তেন। খুব মিশ-কালো গাঁট্টাগোট্টা চেহারার মানুষ, সারাদিন তার খাটুনির বিরাম নেই। বাড়িতে ৮।১০টা গোরু, তাদের বাছুর, সমস্তের ভার কাত্তিকের উপরে। বা'র বাড়িতে বাড়ির দু'টো বড়ো-বড়ো বৈঠক-খানার ঘর পরিষ্কার রাখাও কাত্তিকের কাজ ছিল। আমরা তাকে বাঘের মতো ভয় ক'রতুম—আর মামাদেরও সে ধম্‌কাত। ছেঁড়া কাগজ ফেলে, কলার খোসা ছড়িয়ে' যদি আমরা বাইরের ঘর অপরিষ্কার ক'রতুম, কাত্তিকের হুংকারে তখনই নিজের হাতে সাফ ক'রে ভালো মানুষের মতো মুখ ক'রে তার কাছ থেকে পালাতুম। কাত্তিকেরা তিন পুরুষ ধ'রে মামার-বাড়ির চাকর—আর দেশে, অর্থাৎ গ্রামের বাড়িতে, তারা ছিল মাতামহ মহাশয়ের প্রজা।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ছিলেন আমাদের 'মানি-কাকা'। ভালো নামটা বোধ হয় ছিল 'মহেন্দ্র', তা থেকে 'মাহেন্দ্র, মাহেন্দ্রি, মাহিন্দি, মান্দি' ও শেষটায় 'মানি'। দাদা মশায়ের জ্ঞাতি সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই ছিলেন। মা, মাসি আর মামাদের কাকা সম্পর্কের, সেইজন্যই এই সম্পর্ক ধ'রে 'মানি-কাকা' নাম। মামারা, মা আর মাসিরা তাঁকে 'মানি-কাকা'-ই ব'ল্‌তেন। আর আমরাও 'মানি-কাকা' ব'লতুম। কখনও দাদামশায়ের সম্পর্ক ধ'রে 'মানি-দাদা' বলি নি, 'মানি-কাকা' ছাড়া অন্য সম্বোধন আমরা জান্‌তুম না। মানি-কাকাও

এতে আপত্তি ক'র্‌তেন না, যদিও তিনি আমাদের 'ভাই' ব'লেই সম্বোধন ক'র্‌তেন।

মানি-কাকা লোকটি অতি সরল সাধাসিধে ধরনের ছিলেন। একটু বেঁটে-খাটো চেহারার মানুষটি ; আর দেখেছি, অনেক সময়ে তাঁকে মামারা আর তাঁদের বয়স্যরা ঠাট্টাঠুট্টি ক'র্‌তেন। মাথায় হুঁকোর জল ঢালা বা তামাক খাবার জ্বলন্ত টিকা নিয়ে কাপড় ধরিয়ে' দেবার ভয় দেখানো প্রভৃতি বেল্লাল্লাগিরিও ক'র্‌তেন। মানি-কাকা এতে কোনো রাগ ক'র্‌তেন না, এ-সব উপদ্রব হাসি মুখেই সইতেন। যতদূর দেখেছি, মনে হয়, অর্ধপোষ্য গরিব আত্মীয়-রূপেই তাঁকে সকলে দেখ্‌ত। সামান্য দু-চার বিঘা জমি মানি-কাকার ছিল। তার আয়ে তাঁর চল্‌ত না। মামার-বাড়িতে নানা কাজ ক'র্‌তেন, বাজার সরকারের মতন, তার জন্য কিছু-কিছু পেতেন। মামার-বাড়িতে একগাদা ভাগ্‌নে-ভাগ্‌নি জড়ো হ'ত, তাদের নিয়েও থাক্‌তেন। দুপুরে বা অন্য সময়ে যখন বৈঠকখানা-ঘর খালি থাক্‌ত, তখন আমাদের নিয়ে, নীচু বড়ো-বড়ো চৌকির উপরে শতরঞ্চির উপর পাতা সাদা চাদরের আসরে ব'সে, তিনি গল্প ক'র্‌তেন। তাঁর বিদ্যা আর অভিজ্ঞতার প্রসার বেশি ছিল না। গল্প হ'ত তাঁর দেশের কথা নিয়ে, সেই দামোদর-নদের ও-পারে ছোটো একটি গাঁয়ে, সেখানে গল্পের মধ্যে আমাদের নিয়ে যেতেন। গ্রীষ্মকালে বালির মধ্যে দিয়ে ঝির্‌ঝির্ ক'রে অল্প একটু জল-ধারা চ'লেছে, সেই নদী বর্ষায় দু'কূল ছাপিয়ে কী রকম 'বাড়' হ'ত, তার বর্ণনা তাঁর কাছে শুন্‌তুম। দেশের নানা উৎসবের কথা—এক-একটা ভোজে ৮।১০ মন চা'লের ভাত হ'ত, দই পায়েসের স্রোত ব'য়ে যেত, মাছের ঝোলের যেন ছোটো পুখুর, বোঁদের পাহাড় জমা হ'ত, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণ থেকে আরম্ভ ক'রে অস্পৃশ্য দুলে হাড়ী ডোম পর্য্যন্ত সবাই এসে পাতা পাত্‌ত। নিমন্ত্রিতেরা সঙ্গে পিতলের ঘটি আন্‌ত। খাওয়ার পরে পাতের মাছ আর বোঁদে ঘটি ভ'রে নিয়ে, বাবুদের আশীর্বাদ ক'রতে-ক'রতে, আর ঢেকুর তুলতে-তুলতে বাড়ি ফির্‌ত। দু'-পাশে ধানের ক্ষেত, মাঝে সরু নালা। শরৎকালের পরিষ্কার আকাশ, মিষ্টি রোদ্দুর, নালা জলে ভর্‌তি। তার উপর দিয়ে শালতি নৌকো যাচ্ছে। নৌকোর ভিতর পূজোর জন্য বাড়ি-মুখো আপিসের বাবু, বছরে ৮।১০ মাস যাঁকে ক'লকাতায় বা অন্য শহরে থাক্‌তে হয়। নৌকোর উপরে শীষ-মাথা ধানের সবুজ খড়ের রাশি আর

কোথাও বা কাশের গুচ্ছ এসে প'ড়েছে। শালতি সাঁ-সাঁ করে এই-সবের মধ্য দিয়ে চ'লেছে, দূর থেকে আস্‌ছে শঙ্খচিলের তীক্ষ্ণ করুণ স্বর—এ-সব শুন্‌তুম। গল্প ব'লতে আর কিছু ছিল না। তবে হাঁ, মাঝে-মাঝে কথকতায় শোনা, যাত্রার পালায় দেখা, পৌরাণিক কাহিনী দু-চারটেও তাঁর কাছে শুন্‌তুম। অজামিলের কথা, রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী, ধ্রুবের তপস্যা, হনুমানের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে মন্দোদরীকে ছলনা ক'রে রাবণের মারণাস্ত্র সংগ্রহ করা—এ-সব গল্প বেশ শ্রুতি-রোচক আর মনোমোহন ক'রে শোনাতেন।

বড়োদের মহলে মানি-কাকাকে নিয়ে ঠাট্টাঠুট্টি করা হলেও, এক বিষয়ে সকলে তাঁকে খাতির কর্‌ত। মামার জ্ঞাতিদের বা অন্য কারো বিবাহ হ'লে যখন হাওড়া থেকে কোন্নগর কি বারাসত কি বেহালায় বরযাত্রী যেত—আমাদের ঠাঁই তা'তে হ'ত না, কারণ সব সময়ে আমরা তো মামার-বাড়িতে থাক্‌তুম না—তখন গ্রাম থেকে জ্ঞাতি-ঘরের ছোটো ছেলেরা আস্‌ত। বরযাত্রী হ'য়ে এই-সব বিয়েতে যোগ দেওয়া মানে, ২।৩ দিন বাইরে কাটিয়ে' আসা—কালো-কালো ছেলে, রঙীন সাটিনের জামা পরা, ছোটো চাদর কুঁচিয়ে' নিয়ে বুকে বাঁধা, পরনে কোঁচকানো ধুতি (ছেলেদের হাফ-প্যাণ্ট পরার রেওয়াজ তখন ছিল না), পায়ে হাটু-পর্য্যন্ত মোজা, বার্নিশ করা ফিতা-বাঁধা জুতো—এরা সকলেই বরযাত্রী হ'য়ে যেত, দেখে আমাদের হিংসা হ'ত। আমার বাবা আমাদের যেতে দিতেন না, কারণ তাঁর আপিসের এত কাজ ছিল যে তিনি ছুটি পেতেন না। সুতরাং আমরাও যাবার কথা ভাব্‌তেই পার্‌তুম না। মানি-কাকা এই বরযাত্রী দলের পাণ্ডা হ'তেন। সকলের জন্য গাড়ি ঠিক করা, গাড়ি-ভাড়া দেওয়া, জল-খাবারের জন্য সিঙ্গাড়া জিলিপি সন্দেশ কেনা, পান-তামাকের ব্যবস্থা করা (ক্যাম্বিসের ব্যাগের মধ্যে টিনের কৌটোয় ক'রে তামাক, টিকে, কড়ি-বাঁধা ছোটো হুঁকো, কলকে', এ-সব তিনি-ই নিয়ে যেতেন—তখনকার দিনে চায়ের প্রচলন মোটেই হয় নি; এ হ'চ্ছে ১৯০০ সালের পূর্বেকার কথা)—এ-সবের ভার প'ড়ত মানি-কাকার উপরেই। তিনি হাসিমুখে এই ভার নিতেন, আর কারো কোনও বিষয়ে কিছু মনঃপূত না হ'লে বা অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি হ'লে, সকলে মানি-কাকার উপরেই ঝাঁজ দেখাত। তিনি হাসিমুখে, 'চ'ট্‌ছিস্ কেন দাদা' ব'লে সকলেরই মন যোগাবার চেষ্টা ক'র্‌তেন। তাঁকে না হ'লেও আবার কারো চ'লত না।

বরযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা মাতব্বর থাকতেন, যেমন বরের ঠাকুরদাদা বা বাবা বা খুড়ো বা মামা, তাঁরা একটু অন্তরালে, একটু উর্দ্ধে বিরাজ ক'র্তেন। বিয়ে-বাড়িতে গিয়ে কুটুম্বদের মধ্যে হৈ-চৈ করা, বরযাত্রী খাওয়ানোর সময় নিজে গিয়ে পাতা ঠিক-মতো সাজানো হ'চ্ছে কি না তার তদ্‌বির করা, সকলে পান-তামাক ঠিকমতো পেলে কি না, আবার বরযাত্রীদের খাবার জন্য ডাক প'ড়্‌লে খাওয়ানোর স্থানে গিয়ে চিনে-চিনে বরযাত্রীদের, মায় পুঁটকে শিশুদের ছাড় দেওয়া (বরযাত্রী দলের মধ্যে বাজে রবাহুত অনাহুত লোকও ঢুকে পড়্‌ত, সেইজন্য এই ব্যবস্থা ছিল)—এ-সব মানি-কাকা মাথায় চাদর জড়িয়ে' ডান হাতে ডাবা হুঁকো নিয়ে দাঁড়িয়ে' দেখ্‌তেন। তারপর বর-ক'নে বিদায়ের সময়, কন্যা-যাত্রীদের পক্ষে যে-সমস্ত পাওনার ফর্দ নিয়ে গ্রামের লোক আস্‌ত, যেমন ইস্কুলের চাঁদা, লাইব্রেরির চাঁদা, হরিসভা, বারোয়ারি পূজো, গ্রামভাটি প্রভৃতি আদায়ের জন্য, তখন গ্রামের ছেলে বুড়োরা এসে বরকর্তাদের নাস্তানাবুদ ক'রত। মানি-কাকা তাদের সঙ্গে একটা ফয়সালা ক'র্তেন। পাঁচ টাকা থেকে তাদের এক টাকা বা আট আনাতে নামাতেন। সামাজিক জীবনে বিয়ের ব্যাপারে এইভাবে মানি-কাকার যোগ্যতা সকলেই স্বীকার ক'র্তেন।

মানি-কাকার বিষয়-বুদ্ধি গ্রামের জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শুনেছি যে, তাঁর স্বগ্রামে আর পাশাপাশি চার-পাঁচটা গ্রামে কারো ঘর বাঁধতে হ'লে (ঘর মানে খড়ে ছাওয়া মাটির ঘর), তার এষ্টিমেট মানি-কাকা ক'রে দিতেন —কত বাঁশ লাগ্‌বে, কত না'রকল দড়ি, কত মাটি, ক'খানা ইট, কতটা উলুখড়, জানালা দরজার জন্য কতটা জারুল কাঠ বা আম কাঠ বা কাঁঠাল কাঠ আর কয়জন ঘরামি আর তাদের মজুরি-ই বা কত, ইত্যাদি। এই কাজে তিনি পোক্ত ছিলেন আর তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল। সেজন্য তিনি একটু গর্ব অনুভব ক'র্‌তেন। পাড়াগাঁয়ের মাটির ঘর, সে-যুগে ২০৷২৫ টাকার বেশি প'ড়্‌ত না। বোধ হয় মানি-কাকার এষ্টিমেট কখনও ৩০৷৪০ টাকার উপরে উঠ্‌ত না। ইটের বাড়ি তখন দেশে বেশি ছিল না। কিন্তু ইটের বাড়ির সম্বন্ধেও আন্দাজে-আন্দাজে খরচ কত প'ড়্‌বে তা তিনি বল্‌বার চেষ্টাও ক'র্তেন। পাড়াগাঁয়ের গরিব ব্রাহ্মণ, বোধ হয় এক শ' টাকা একসঙ্গে দেখেন নি। মানি-কাকার এষ্টিমেট নিয়ে তাঁকে সকলে একটু ঠাট্টাও ক'রত। দামী বড়ো ইটের

বাড়িতে কত খরচ প'ড়েছে। তাঁর আন্দাজ শুনে নিয়ে, তাই নিয়ে লোকে হাসাহাসি ক'র্‌ত। তাতে তিনি দ'ম্‌তেন না। একবার এক বরযাত্রী দলের সঙ্গে তাঁকে নৈহাটিতে না আর কোথাও তখনকার দিনের ঈস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে ক'রে যেতে হয়। ওপারে হাওড়া থেকে এপারে শিয়ালদহ স্টেশনে ৪।৫ খানা কেরাঞ্চি গাড়ি ক'রে বরযাত্রীর দল এসে পৌছলেন। শতরঞ্চি পেতে সকলে খানিকক্ষণের জন্য স্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ওয়েটিং হলে ব'সলেন, ট্রেন ছাড়তে কিছু দেরি আছে, টিকিট কেনা হ'চ্ছে। মানি-কাকা হুঁকো নিয়ে তামাক টানতে ব'সে গিয়েছেন। ৫০।৬০ বছর পূর্বেকার শিয়ালদহ স্টেশন। আজকালকার মতন বিরাট ব্যাপার ছিল না। একটিমাত্র প্রবেশ-পথ। রাস্তা থেকে কতকগুলি সিঁড়ি বেয়ে উপরের প্লাটফর্মের চাতালে উঠতে হয়, গুটি কয়েক মাত্র প্লাটফর্ম। চাতালের উপরে উঠবার সিঁড়ির সামনে খানিকটা খোলা জায়গা, তারপরেই ট্রাম লাইন। তখনকার দিনের ঘোড়ার ট্রাম, এক-ঘোড়ায় টানা ক্ষুদে'-ক্ষুদে' ট্রাম-গাড়ি। শিয়ালদহ থেকে বউবাজার হ'য়ে লালদিঘি যায়, হাইকোর্ট যায়। ঘোড়ার ট্রামের আড্ডা কাছেই, ছোটো ছেলেরা কৌতুকের সঙ্গে এই এক-ঘোড়ার ট্রামের ঘোড়া বদ্‌লানো দেখছে। বরযাত্রীদের মধ্যে প্রৌঢ় বয়স্ক একজন, হাতে কোনও কাজ না থাকায়, একটু মজা করবার জন্য মানি-কাকাকে ধ'রে ব'সলেন—'বলো তো মানি-কাকা, এই শিয়ালদহ স্টেশনটা তৈরি ক'রতে ক' কুড়ি টাকা লেগেছে?' লোহার ফ্রেমের ছাত, উপরটা টিন দিয়ে ঢাকা, নীচে অবশ্য ইটের ইমারত। আজকালের শিয়ালদহ স্টেশনের মতো মোটেই বিরাট ব্যাপার নয়। মানি-কাকা শুনে নিজের একটু অক্ষমতা জানালেন—'ওরে, এ-সব ইটের আর লোহার ব্যাপার হ'চ্ছে, এর হিসেব আমি কী ক'রে ক'রবো?' তবুও সকলে ঘিরে তাকে নির্বন্ধের সঙ্গে অনুরোধ ক'রতে লাগ্‌ল—'বলো না মানি-কাকা, তুমি-ই ঠিক মোটামুটি খরচের একটা ধারণা আমাদের দিতে পারবে।' তাতে মানি-কাকা হুঁকোতে কয়েক বার জোরে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে, বুদ্ধিটাকে একটু সতেজ ক'রে নিয়ে, স্টেশনের দেয়াল, ঘর-বাড়ি, রেলিং, উপরের ছাতের লোহার ফ্রেম—সব একবার চোখ বুলিয়ে' ভালো ক'রে দেখে নিলেন। তার পরে চুপ ক'রে যেন একটু হিসেব ক'রে নিলেন। তারপর ব'ললেন—'কত আর খরচ এই স্টেশনে হ'য়ে থাকবে; এ তো আমাদের হাওড়া স্টেশনের মতো

বড়ো নয়। এতে খরচ হ'য়েছে—এই ধরো শতাবধি দেড়-শ'।' শুনে সকলেই খুব আমোদ পেলে, আর তখন থেকে মানি-কাকার এই 'শতাবধি দেড়-শ' বিখ্যাত হ'য়ে গেল। কোথাও কোনও ব্যাপারে একটু বেশি কিছু খরচ হ'য়ে গেলে, সকলেই ব'লত—কত-ই বা হবে—মানি-কাকার 'শতাবধি দেড়-শ'।

মামার-বাড়িতে দিদিমার গুরুদেব মাঝে-মাঝে আস্‌তেন। পরে তাঁর সঙ্গে গুরুপুত্রও আস্‌তেন। তাঁদের আহারাদির পরিপাটি ব্যবস্থা হ'ত, আমরা থাকলে তাঁর জন্য যা তৈরি হ'ত তার থেকে বঞ্চিত হ'তুম না। ভালো মাছ, দই ক্ষীর, নানা রকমের মিষ্টি, পায়স, কলার-বড়া, ক্ষীরপুলি, চন্দ্রপুলি, ছানাবড়া প্রভৃতি। গুরুদেব ছিলেন মিষ্টভাষী, প্রত্যেকের খোঁজখবর নিতেন। মানি-কাকা থাক্‌লে পর, অত্যন্ত ভক্তি-ভাবে তাঁর সঙ্গ নিতেন। গুরুদেব ধর্ম উপদেশ বিশেষ ক'রে কাকে দিতেন জানি না। আর সে বিষয়ে আমাদের কৌতূহলও হ'ত না। কিন্তু মানি-কাকা ব'লতেন, "কেন তোরা সব গোলমাল ক'চ্ছিস ভাই? গুরুদেব এসেছেন, চেঁচামেচি ক'রে বিরক্ত করিস না, ওঁর কাছ থেকে গোটা কতক 'আক্ষেপের কথা' শুনি।" যাত্রার দলে যখন বড়ো-বড়ো বক্তৃতা হ'ত, কিংবা চৌধুরী পাড়ায় কথকতার আসরে কথক-ঠাকুর যখন কোনও গম্ভীর বিষয় নিয়ে বাগাড়ম্বর ক'রে ব'লে যেতেন, মানি-কাকা নিবিষ্ট চিত্তে শুন্‌তেন, আর অনেক সময়ে চোখ দিয়ে তাঁর ঝর-ঝর ক'রে জল প'ড়ত। তিনি তখন একাগ্র মনে, তাঁর বর্ণনা অনুসারে, দুটো 'আক্ষেপের কথা' শুনছেন। তাঁর এই 'আক্ষেপের কথা' শোনার আগ্রহ আমাদের কাছে একটা রসিকতার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

মানি-কাকার এক ছেলে ছিল, তাকে আমরা গোষ্ঠ-মামা ব'লে জান্‌তুম। আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো। বহু দিন ধ'রে তাঁর পৈতে হয় নি। ১৭৷১৮ বছরের বামুনের ছেলের পৈতে না হওয়া বিশেষ নিন্দার কথা ছিল সে যুগে। মানি-কাকা তার জন্য বড়ো চিন্তিত ছিলেন। শেষে মামার-বাড়িতেই দিদিমার আনুকূল্যে গোষ্ঠ-মামার পৈতে হ'য়ে গেল একদিন। এতে মানি-কাকা যে কী খুশি হ'লেন, তা কথায় বলা যায় না। মামার-বাড়িতে কাজ ক'রত এক বুড়ো নাপিত, তার হাত কাঁপত, সে-ই গোষ্ঠমামার মাথা কামিয়ে' দিলে, কান বিঁধিয়ে' দিলে। খুশির চোটে মানি-কাকা তার পিঠ চাপ্‌ড়ে' দিলেন নিজের হাতে।

মামার-বাড়িতে একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রেছিলুম। বাড়িতে কোনও ক্রিয়া-কর্মে যজ্ঞি হ'লে, নিমন্ত্রিত অতিথিরা তো আপ্যায়িত হ'তেন, সকলে তাঁদেরই দেখত। মানি-কাকা কিন্তু ওর মধ্যে গরিব দুঃখী কাঙালি যারা এসে ব'সত, তাদেরই দিকে একটু নজর রাখতেন। কোথাও বাজনদারেরা খেলে কি না খেলে, কাচ্চা-বাচ্চা কতকগুলি নিয়ে কাঙালি মেয়ে কোথা থেকে এল, তাকে বসিয়ে খাওয়ানো, রাঁধুনি বামুনরা ঠিক সময় মতো নিজেরা খেতে পেলে কি না, আমরা ধ'রে নিয়েছিলুম—এ-সব ছিল মানি-কাকারই কাজ। কেউ-কেউ এতে একটু চ'ট্‌ত, কিন্তু আমাদের এ জিনিসটা ভালোই লাগত। যাদের দিকে কর্ম-বাড়িতে কেউ-ই দৃষ্টি দেয় না, তাদেরই খুঁজে-খুঁজে মানি-কাকা সেবা ক'র্‌তেন।

মানি-কাকা আর একটি কাজেও অতন্দ্র হ'য়ে পরের সেবা ক'র্‌তেন। মৃতের সৎকার, জীবিত বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার গঙ্গাযাত্রা করানো, এ-সব কাজে মানি-কাকা সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন। শুনেছি, মানি-কাকা দেশে থাক্‌লে কোনও শব-সৎকারে সাহায্য ক'র্‌তে কখনও পিছপাও হন নি। মোটা বাঁশ আনিয়ে তাতে দড়ি বেঁধে' মাদুর দিয়ে ঝোলার মতন ক'রে, সেই ঝোলাতে শবদেহ রেখে, চারজনে বাঁশ কাঁধে ক'রে শবযাত্রা ক'রত। কাঠ কেটে আনা আত্মীয়দেরই কাজ ছিল। 'বাঁশের দোলায় চেপে, কে হে বটে, জা'ত বেহারার কাঁধে চ'ড়ে, যাচ্ছো তুমি শ্মশান-ঘাটে'—এইরকম একটি গান তাঁর মুখে শুনেছি—গুন্‌গুন্ ক'রে তিনি গাইতেন। রোগীর সেবায় রাত জাগতে, ডাক্তার-বদ্যির কাছে যেতে, শুনেছিলুম তাঁর যোগ্য লোক গ্রাম তল্লাটে আর ছিল না। কারো শক্ত বেয়ারাম হ'লে আত্মীয়দের অনুরোধে তিনি নারায়ণকে তুলসী দিতেন, দুর্গানাম জপ ক'র্‌তেন।

তার পরে বহু দিন মানি-কাকার খবর পাই নি। আমরাও বড়ো হ'য়ে উঠ্‌লুম, মামাদের মৃত্যু হ'ল, মামার-বাড়িতে যাওয়া-আসাও, বন্ধ হ'য়ে না যাক্, ক'মে গেল অনেকটা। তার পরে কবে শুন্‌লুম মানি-কাকা দেহরক্ষা ক'রেছেন। তাঁর একটি ছেলে গোষ্ঠ, সে অল্প বয়সেই মারা যায়। তারপরে তিনি এর ওর কাছে ঘুরে ফিরে বেড়াতেন। গাঁয়ে একবার কলেরা দেখা দেয়। তিনি তখন সব সময়টাই গ্রামের দুঃস্থ, গরিব, অস্পৃশ্য দুলে' বাগদি কেওড়া হাড়ীদের পাড়াতেই ঘুরতেন, রোগীদের তদ্‌বির ক'রতেন। ওষুধ-পত্র ডাক্তার-

বস্তির পাট বড়ো ছিলো না। তিনি তাদের কাছে উপস্থিত থেকে, এই-সব অশিক্ষিত লোকেদের সাহস দিতেন, আর পীড়িত লোকেদের নাম ক'রে নারায়ণের উদ্দেশে তুলসী দিতেন। দরদী ব্রাহ্মণ এইভাবে কাছে থাকায়, তারা মনে একটু বল পেত। কেউ মারা গেলে, তাদের সৎকারের ব্যবস্থা ক'রতেন। অনেকে তাঁকে বারণ ক'রেছিল, তাঁকে হাওড়ায় চ'লে যেতে ব'লে-ছিল। গ্রামের ভদ্র-সন্তানদের মধ্যে যিনি পেরেছিলেন, গ্রাম ছেড়ে তিনি তখনকার সময়ে চ'লে গিয়েছিলেন। মানি-কাকা নিজে অসহায়, কিন্তু এই অসহায় লোকগুলিকে ছেড়ে পালাতে চান নি, তিনি গ্রাম থেকে নড়েন নি। শেষে কলেরাই তাঁকে পেড়ে ফেল্‌লে। কি ভাবে তাঁর দেহান্ত হ'ল, তার খুঁটি-নাটি খবর কেউ রাখে নি।

মানি-কাকা বহু দিন হ'ল চলে গিয়েছেন, আমাদের ছেলে-বয়সের ছোটো-খাটো উপদ্রব অনেক সহ্য ক'রেছেন। জীবনে তাঁকে প্রণাম করবার কথা কখনও মনে হয় নি। এখন মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়—মানি-কাকার সঙ্গে আবার দেখা হ'লে, তাঁর পায়ে মাথা লুটিয়ে একবার প্রণাম করি॥

কথাসাহিত্য, কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৬৩। 'পথ-চল্‌তি' দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত (১৩৭১)।

হেড-পণ্ডিত মশায়

আমরা ইস্কুলে হেড-পণ্ডিত মশায়ের পূরো নামটা ভালো ক'রে জান্‌তুম না। প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন বোধ হয় তাঁর নাম ছিল, কিন্তু আমরা সকলে "হেড-পণ্ডিত মশায়" ব'লে উল্লেখ ক'র্‌তুম, আর তাঁর পিছনে ছাত্রেরা সকলেই তাঁকে "পাগ্‌লা পণ্ডিত মশায়" ব'লে অভিহিত ক'র্‌ত। আমাদের ইস্কুলে আটটি শ্রেণীতে আটজন শিক্ষক ছিলেন, তাঁরা ইংরিজি পড়াতেন, আর এঁদের নাম ধ'রেই ক্লাসগুলির নামকরণ করা হ'ত। যেমন, অমুক বাবুর ক্লাস, অর্থাৎ যে ক্লাসে তিনি ইংরিজি পড়াতেন। তখন ক্লাসের সংখ্যাকরণ অন্যভাবে হ'ত —এ আমি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর পূর্বেকার কথা ব'ল্‌ছি। ইস্কুলের সব-চেয়ে নিচু শ্রেণীর সংখ্যা ছিল আট। আর যে শ্রেণীতে উঠে তখনকার দিনে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা (ম্যাট্রিকুলেশান) দিতে হ'ত, সে শ্রেণী ছিল ফার্স্ট ক্লাস বা প্রথম শ্রেণী। উপরের কয়টি ক্লাসে গণিত, ইতিহাস আর ভূগোল পড়াবার জন্য দু'জন শিক্ষক ছিলেন ; আর দু'জন পণ্ডিতমশায় ছিলেন—একজন হেড-পণ্ডিত মশাই, যাঁকে আমরা "পাগ্‌লা পণ্ডিত মশায়" ব'ল্‌তুম, তিনি উপরের চার শ্রেণীতে (ফোর্থ ক্লাস থেকে ফার্স্ট ক্লাস পর্য্যন্ত) আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন, আর নিচের চার ক্লাসের জন্য বাঙলা পড়াতেন রাম পণ্ডিত মশায়। তখনকার দিনে একখানি বাঙলা গদ্য-পদ্য সংগ্রহ ছাড়া আর কোনও বাঙলা বই পড়ানো হ'ত না। বাঙলার ক্লাসটা নিতান্তই ফাঁকির ক্লাস ছিল। রাম পণ্ডিত মশায় হয়-তো আমাদের কিছু ডিক্‌টেশান দিতেন, নয়-তো পাঠ্য-পুস্তক ধ'রে দুই-একটি শক্ত কথার মানে ব'লে দিতেন। ব্যস্‌, এইতেই কাজ হ'য়ে যেত। বাঙলা ব্যাকরণের পাট আমাদের এই হাই-ইস্কুলে ছিল না। তবে যে-সব ছেলে মিড্‌ল্‌-ইংলিশ ইস্কুলের পড়া সমাধা ক'রে উপরের ক্লাসে যোগ দিতে আস্‌ত, তাদের রীতি-মতো বাঙলা মায় ব্যাকরণ পর্য্যন্ত শিখ্‌তে হ'ত ; সেকালে যখন এ-রকম বাঙলা ইস্কুল থেকে পাস-করা ছেলে আমাদের ইস্কুলে ফোর্থ ক্লাসে ভর্‌তি হ'ত—তখন দেখ্‌তুম, তারা ইংরিজি ছাড়া আর সব বিষয়ে আমাদের থেকে ঢের এগিয়ে আছে। বাঙলা ভাষায় আগত সমস্ত সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি তারা জান্‌ত। সন্ধি, ণত্ব-বিধান, ষত্ব-বিধান, কৃৎ-প্রত্যয়,

তদ্ধিত-প্রত্যয়—তারা সব-ই জান্‌ত। এ-সব বিষয়ে আমরা ছিলুম একেবারে নিরেট। যাই হ'ক, ইংরিজি ইস্কুলে ইংরিজির উপর জোর দেওয়া হ'ত। আমরা ইংরিজি প'ড়্‌তে-প'ড়্‌তে যতটুকু শিখে নিতুম, বাঙলার পক্ষে তা'ই যথেষ্ট হ'য়েছিল। তাই সম্বল ক'রে ভবিষ্যৎ জীবনে আমরা বাঙলা লিখেছি, আর তাতে আমাদের কোনো অসুবিধে হয় নি।

রাম পণ্ডিত মশায় অনেক দিন, বিশেষতঃ গ্রীষ্মের দিন, ঘুমিয়েই কাটাতেন। দুই-একটি উৎসাহী ছেলে তাঁকে ঘুম পাড়াবার জন্য পয়সা খরচ ক'রে বরফ কিনে এনে বরফ-জল ক'রে খাওয়াত। খাতা দিয়ে বাতাস ক'র্‌ত। পণ্ডিত মশায় দশ-পনেরো মিনিট দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতেন। আমাদের উপর হুকুম ছিল, আমরা যেন বেশি চেঁচামেচি না করি; আর দুটি ছেলেকে পাহারার কাজে লাগিয়ে' দেওয়া হ'ত—হেড-মাষ্টার মশায় অথবা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশায় ক্লাসের দিকে আস্‌ছেন যদি দেখা যেত, তখন-ই তাঁকে জাগিয়ে' দিতে হ'ত। পণ্ডিত মশায় সকলের উপর খুশি ছিলেন, আর তাঁর ঘণ্টাটাকে ছুটির ঘণ্টা ব'লে আমরা মনে ক'র্‌তুম। এই-ভাবেই আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষা করা হ'ত।

কিন্তু যখন আমরা চতুর্থ শ্রেণীতে উঠ্‌লুম, তখন সংস্কৃত আরম্ভ ক'র্‌তে হ'ল হেড-পণ্ডিত মশায়ের কাছে। এখানকার ব্যবস্থা উল্‌টো। নিচের ক্লাসটিতে রাম পণ্ডিত মশায় ছিলেন অত্যন্ত মোলায়েম—টাক-মাথা গৌর-বর্ণ পুরুষ, সদাই মুখে হাসি লেগে আছে, ছেলেদের সঙ্গে বেশ আত্মীয়তা ক'রে কথা ব'ল্‌তেন। আর হেড-পণ্ডিত মশায় তার একেবারে উল্‌টো। একটু ময়লা রঙের দীর্ঘকায় পুরুষ, রাম পণ্ডিত মশায়ের মতো তাঁর গায়ে কখনো কামিজ বা পিরহান দেখি নি, ধুতি প'রে আর চাদর গায়ে দিয়ে বিদ্যাসাগরি চটি পায়ে তিনি ইস্কুলে আস্‌তেন। একটি শামুকে ক'রে নস্যি নিয়ে আস্‌তেন, সেটি ট্যাঁকে গুঁজে রাখ্‌তেন, আর মাঝে-মাঝে নস্যি নিতেন। মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, বোধ-হয় মাথার সঙ্গে কোনো দিন চিরুনির সংস্পর্শ হয় নি—আর তার-ই মধ্যে একটি ছোটো টিকিও ছিল। সপ্তাহে বোধ-হয় একবার ক'রে কামাতেন, আর সেই জন্যে মুখে খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়িও থাক্‌ত। তাঁকে হাস্‌তে কখনও দেখা যেত' না। ইস্কুলের মধ্যে পণ্ডিত মশায়দের নিয়ে বেলেল্লাগিরি করা সাধারণ ছিল। নানাভাবে পণ্ডিত মশায়দের বৈষয়িক

অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে, তাঁদের প্রতি ছেলেরা অশোভন ব্যবহার ক'র্‌ত। পণ্ডিত মশায়রা সে বিষয়ে সাধারণতঃ উদাসীন থাক্‌তেন, কোনও কিছু গায়ে মাখ্‌তেন না। ছাত্রদের রসিকতা তাঁদের কাছে পৌঁছত-ই না। আর পৌঁছলেও সে-সব জিনিস তাঁরা উপেক্ষা ক'র্‌তে অভ্যস্ত ছিলেন। আমরা এই পণ্ডিত মশায়দের সম্বন্ধে নানারকম গল্প শুন্‌তুম। আমরা নিজেদের মধ্যে তাঁদের অবলম্বন ক'রে ঠাট্টাও ক'র্‌তুম, তাঁদের ভয়ও ক'র্‌তুম।

আমাদের হেড-পণ্ডিত মশায় ভালো সংস্কৃত জান্‌তেন ব'লে, হেড-মাষ্টার মশায়ও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা ক'র্‌তেন। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির হ'লেও, প্রাণমন দিয়ে ছেলেদের পড়াতেন। ছেলেরা যাতে দেবভাষা আয়ত্ত ক'র্‌তে পারে, সেজন্য তিনি সম্পূর্ণ-ভাবে পড়ানোর কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিতেন। ক্লাসে সুবিধে পেলেই ছেলেরা তাঁকে বিব্রত করার চেষ্টা ক'র্‌ত, তিনি সেইজন্যে একটু-আধটু মা'র-ধ'র-ও ক'র্‌তেন। তবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশায়ের শাস্তি-মূলক বেতের বা তাঁর বিখ্যাত গাঁট্টার মতন পণ্ডিত মশায়ের কান ধ'রে টানা বা চুলের মুঠি ধ'রে ঝাঁকানো ভীতিপ্রদ ছিল না। পণ্ডিত মশায় সংস্কৃত পাঠ্য-পুস্তক নিয়ে ব্যাখ্যা ক'রে পড়িয়ে' যেতেন। তখন খুঁটিনাটি ব্যাকরণ আলোচনা, আর সময়ে-সময়ে সাহিত্যের রস বিশ্লেষণ, সব-ই ক'র্‌তেন। এই পড়ানোতে আমরা হ'তুম নির্বাক্ শ্রোতা, এবং তিনি একাই ক্লাস মাত ক'রে রাখ্‌তেন। এখন যেমন পড়ানোর কাজে ছেলেদেরও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করানোর চেষ্টা করা হয়, তখন সেটা ছিল না।

"পাগ্‌লা পণ্ডিত" মশায়ের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জ'ন্মে যায় যে, গরিব ছেলের প্রতি তিনি বিশেষ সদয় ছিলেন। খোশ-পোশাকি বড়ো-লোকের ছেলেদের তিনি পছন্দ ক'র্‌তেন না। অত্যন্ত গরিবানা চালে যে-সব ছেলে তাঁর সামনে উপস্থিত হ'ত, যেমন খালি পা, তালি-দেওয়া জামা, ময়লা কাপড়, রুক্ষ চুল, তাদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও সহানুভূতি নানাভাবে নাকি দেখা দিত। আমাদের মধ্যে একটা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে' গিয়েছিল যে, যখন মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হ'ত (দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত মৌখিক-ই হ'ত), তখন যে-সব ছেলে এ-রকম গরিবানা চালে যেত', তারা তাঁর কাছ থেকে একটু বেশি নম্বর পেত'। সেইজন্য হেড-পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত পরীক্ষা দেবার দিন বড়ো-লোকের ছেলেরাও ময়লা কাপড় প'রে দারিদ্র্যের তক্‌মা এঁটে আস্‌ত।

পণ্ডিত মশায় আমাদের সংস্কৃত অনুবাদের ক্লাসও নিতেন, আর ব্যাকরণ সম্বন্ধে প্রশ্নও ক'র্তেন। তিনি কতকগুলি বাঙলা বাক্য ব'লে যেতেন, আমরা সেগুলোর সংস্কৃত ক'রে নিয়ে তাঁকে দেখাতুম। অনুবাদের জন্য তিনি এই রকম উপদেশ-মূলক বাক্য বেশি দিতেন—"দুরাত্মার মরণই মঙ্গল। যাহারা যথাকালে বিদ্যাভ্যাস না করে, তাহারা উত্তরকালে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। সর্বদা গুরুর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবে। কদাচ নিজের কর্তব্যে অবহেলা করিবে না। ছাত্রদিগের পক্ষে বিদ্যাভ্যাসই একমাত্র তপস্যা—" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই-রকম বাক্যের সংস্কৃত অনুবাদ ক'র্তে বেগ পেতে হ'ত না। আর তাতে ক'রে তিনি আমাদের উপর প্রসন্ন-ই ছিলেন। তবে তাঁকে মাঝে-মাঝে রাগাবার জন্য আমরা খুব মোটা-রকম ইচ্ছাকৃত ভুল-ও ক'র্তুম।

ক্লাসে নরেন মুখুজ্যে ব'লে একটি ছেলে ছিল। বাস্তবিক-ই গরিব ঘরের ছেলে। পড়া-শুনোতেও ভালো ছিল, আর তার মাথায় একটি ছোটো টিকিও ছিল (আমাদের সময়ে বামুনের ছেলেরা প্রায় সকলেই নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক ক'র্ত। এ বিষয়ে প্রায় ব্যত্যয় হ'ত না। আজকাল অবশ্য এ ব্যবস্থা উঠে গিয়েছে)। নরেনকে পণ্ডিত মশায় স্নেহ ক'র্তেন, সে লেখাপড়ায় তো ভালো ছিলই, আর তার টিকি থেকে তার ধর্মভাবও সূচিত হ'ত। সেই নরেন একদিন "বৃক্ষ হইতে" পদের সংস্কৃত অনুবাদ করে "গাছাৎ" রূপে। এটা পণ্ডিত মশায়কে চটাবার জন্যই ক'রেছিল। পণ্ডিত মশায় তার খাতায় "গাছাৎ" কথাটা পেয়ে, যে-ভাবে কাতর চোখে তার দিকে তাকালেন, তা'তে মনে হ'ল, তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্রের ব্যবহারে দুঃখিত হ'য়েছেন। তখন পণ্ডিত মশায়ের কাছে গিয়ে জোড় হাত ক'রে নরেন ব'ল্লে, "পণ্ডিত মশায়, আমাকে ক্ষমা ক'র্বেন, এমন ভুল আর কোনোদিন হবে না।" তা'তেও তাঁর রাগ পড়ে নি ; দু'-তিন দিন তিনি নরেনের সঙ্গে কোনো কথা-ই বলেন নি। আমরাও এ ব্যাপারে যেন পণ্ডিত মশায়ের কাছে লজ্জিত বোধ ক'রেছিলুম। ব্যাপারটি ছোটো, কিন্তু এ-থেকে বুঝ্‌তে পারা যায় যে, আমরা পণ্ডিত মশায়কে "পাগ্‌লা পণ্ডিত" ব'ল্লেও, আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে একটি গভীর স্নেহের ও ভক্তির যোগ ছিল।

পণ্ডিত মশায় অনেক সময় শাস্তি দেবার জন্যে ছেলেদের মাথার চুল ধ'রে টেনে ঝাঁকানি দিতেন। তাঁর এই দৌর্বল্য দেখে, একটি ছেলে একদিন আভাঙ

ক'রে মাথায় সরষের-তেল মেখে আসে আর পণ্ডিত মশায়কে ইচ্ছে ক'রে কোনও কারণে চটিয়ে' দেয়। পণ্ডিত মশায় বিচার না ক'রে তার মাথার চুল-গুলো ধ'রে বেশ ক'রে যেমনি ঝাঁকানি দিয়েছেন, অমনি তাঁর আঙুলের মধ্যে দিয়ে সরষের তেল গড়িয়ে' প'ড়তে লাগ্‌ল। এই ব্যাপার এত-ই অনপেক্ষিত আর অতর্কিত যে, তিনি ঘৃণায় তেল-জব্‌জবে হাতখানি তুলে ধ'রে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে' রইলেন। আমরাও তৈরি ছিলুম। সঙ্গে-সঙ্গে কেউ রুমাল নিয়ে, কেউ গায়ের চাদর নিয়ে (তখন ছেলেদের কেউ-কেউ শার্ট বা কোটের উপর চাদর প'র্‌ত), কেউ খাতা থেকে দু'-খানা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে, পণ্ডিত মশায় যাতে হাত মুছ্‌তে পারেন সেই আগ্রহে, তাঁর চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালুম। কা'র সেবা তিনি নেবেন, তা চারদিকে তাকিয়ে' তিনি ঠিক ক'র্‌ছেন, এমন সময় তাঁর নজরে প'ড়্‌ল একটি ছেলে, রুখুরুখু চুল। তিনি সেই দিকে গিয়ে তাঁর হাত দিয়ে তার মাথার চুল ধ'রে খুব ঝাঁকানি দিলেন—তেলা হাতের তেল রুখু মাথায় গেল, আর তাঁর হাত হ'ল কতকটা পরিষ্কার। তারপর বাইরে গিয়ে হাত ধুয়ে, চাদরের সঙ্গে তিনি গামছা নিয়ে আস্‌তেন, সেই গামছায় হাত মুছ্‌তে-মুছ্‌তে তিনি ফিরে এলেন। এর পর তিনি কারোর মাথার চুল ধ'রে টান্‌তে গেলে আগে ভালো ক'রে reconnoitre বা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে নিতেন, তার মাথায় স্নেহদ্রব্য কতটা আছে।

পণ্ডিত মশায়ের মধ্যে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য ক'রেছিলুম যে, যদিও তিনি খুব গম্ভীর ছিলেন এবং বেশি কথা ব'ল্‌তেন না, তাহ'লেও কিন্তু তিনি ছাত্রদের প্রাণের ভিতর থেকে ভালোবাস্‌তেন। মনে আছে, একদিন সরস্বতী পূজোর সময়ে আমরা তাঁকে একটু বিপন্ন করবার কুমতলব নিয়েই ব'ল্‌লুম, "পণ্ডিত মশায়, এবার সরস্বতী পূজোয় আপনার বাড়িতে আমরা অঞ্জলি দিয়ে আস্‌বো, আর প্রসাদ পাবো।" তা'তে পণ্ডিত মশায় যেমন একদিকে খুব খুশি হ'লেন, তেমনি আর একদিকে বড়ো বিপন্নও হ'য়ে প'ড়্‌লেন। ব'ললেন, "বাবা, নিতান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমি, থাকি ছোটো একটি খোলার চালের বাড়িতে, তোমরা আমার ছাত্র, পুত্রতুল্য, তোমরা আস্‌বে সে তো আমার সৌভাগ্য, তবে ক'জন আসবে আমাকে জানিও—আমি যথাসাধ্য সেই মতো চেষ্টা ক'র্‌বো। আর বাড়িতে তো একমাত্র ব্রাহ্মণী, তোমাদের তিনি ছেলের মতোই দেখ্‌বেন।" তাঁর কথা শুনে' আমরা নিজেদের মধ্যে আপসে

বিচার ক'রে দু'-এক টাকা ক'রে চাঁদা তুলে' কিছু অর্থ পণ্ডিত মশায়ের বাড়িতে গিয়ে দিয়ে এলুম, তাতে তাঁর চিন্তার সবটুকু-ই লাঘব হ'ল। তাঁর বাড়িতে—সুদূর না'রকেল-ডাঙায় তিনি থাক্‌তেন—সরস্বতী পূজোর দিন আমি যেতে পারি নি। তবে যারা গিয়েছিল, তাদের তিনি আর তাঁর গৃহিণী যত্ন ক'রে লুচি, আলু-কুমড়োর ছক্কা, ছোলার দা'ল, লাউয়ের চাটনি, দই, পায়েস, বোঁদে খাইয়েছিলেন। প্রায় সকলেই উচ্চ স্বরে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রেছিল।

পণ্ডিত মশায়ের প্রাণটি নিতান্ত কোমল ছিল। উড়িয়া কুলিরা রাস্তার খোয়া সমতল করার জন্য লোহার রোলার টান্‌ছে, তিনি কাতর-ভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌তেন, বেচারিদের খালি পায়ে কত না জানি যন্ত্রণা হ'চ্ছে। গোরুকে নিষ্ঠুর-ভাবে মারার বিরুদ্ধে, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানের কাছে তাঁকে কাতর-ভাবে অনুযোগ ক'র্‌তে আমাদেরই দু'একজন দেখেছি। তাঁর সম্বন্ধে একটি গল্প ছিল যে, একবার তিনি কই না মাগুর মাছ কিনে বাড়ি নিয়ে আস্‌ছেন। যখন তিনি গামছা-বাঁধা মাছ নিয়ে পোলের উপর দিয়ে খাল পার হ'চ্ছেন, তখন তাঁর মনে হ'ল, জল দেখে বুঝি মাছগুলি ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছে। গামছা-বাঁধা মাছগুলোকে তিনি উপরে তুলে' ধ'রে অত্যন্ত কোমল-ভাবে ব'ল্‌লেন, "ঘর যাবি বাবা, ঘর যাবি?" তারপর গামছাটা খুলে উজাড় ক'রে মাছগুলোকে জলের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। আমাদের মধ্যে একটি ছেলের পিতার মৃত্যুর কথা শু'নে তাঁর কী কান্না!

পণ্ডিত মশায় ইংরিজি জান্‌তেন না। আমরা ইস্কুল ছেড়ে যাবার পরেও বহু বছর তিনি ইস্কুলে কাজ ক'রে যান। তারপরে বার্ধক্যের আতিশয্য-হেতু তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর এক ছেলে সংস্কৃত ভালো ক'রে শিখেছিলেন। তিনি পিতার পদে নিযুক্ত হন। পণ্ডিত মশায়ের পুত্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি। এঁরই এক পুত্র, অর্থাৎ পণ্ডিত মশায়ের নাতি, জাহাজের খালাসি হ'য়ে বিলেতে ও আমেরিকায় যান। আমেরিকাতে গিয়ে সেখানকারই একটি মহিলাকে বিয়ে করেন। বোধ-হয় এ ঘটনা আমাদের পণ্ডিত মশায়ের দেহরক্ষার পরে ঘ'টেছিল। তিনি জীবিত থাক্‌লে এ ব্যাপার কিভাবে গ্রহণ ক'রতেন, জানি না। তিনি নিশ্চয়-ই প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে প'ড়্‌তেন, কিন্তু স্বাভাবিক ঔদার্য্যগুণে মেনে নিতেন-ও নিশ্চয়-ই।

যাক্ সে কথা। আমাদের পণ্ডিত মশায়ের কথা মনে হ'লে এবং ইস্কুলের আমাদের অন্যান্য শিক্ষক মশায়দের কথা মনে হ'লে, তাঁদের চরণে কোটি-কোটি প্রণাম নিবেদন করি। ব্যক্তিগত-ভাবে, আর সমবেত-ভাবে, আমরা প্রত্যেকটি ছাত্র এই "পাগ্‌লা পণ্ডিত" মশায়ের কাছ থেকে যে নীরব অনুপ্রেরণা পেয়েছি—যথার্থ পণ্ডিত, আর সঙ্গে-সঙ্গে জাগতিক বিষয়ে নিস্পৃহ, হৃদয়বান্ ও কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের যে আদর্শ তাঁর মধ্যে দেখেছি—তার পুণ্য প্রভাব আমাদের জীবনে অলক্ষ্যে এসে গিয়েছে ॥

কথাসাহিত্য, কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৬৪। 'পথ-চল্‌তি' প্রথম খণ্ডে সংকলিত (১৩৬৯)।

প্যারিসে ছাত্রজীবন

ইংরেজ আমলে, ভারত-সরকারের বৃত্তি পেয়ে, দু বছর, ১৯১৯ থেকে ১৯২১, লণ্ডনে ছাত্র হিসাবে কাটিয়ে, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর-অব-লিটারেচর ডিগ্রি লাভ করবার পর, আমার আবেদন অনুসারে লণ্ডনে ভারত-সরকার ইউরোপে ফ্রান্সে থেকে পড়াশুনা করবার জন্য আমার বৃত্তি আরও এক বছরের জন্য বাড়িয়ে দিলেন। আমি ঠিক ক'রেছিলুম, এই তৃতীয় বছরটা প্যারিসেই কাটাবো। প্যারিস-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডক্টরেটের জন্য চেষ্টা ক'রবো ; তবে প্রধান উদ্দেশ্য আমার এই ছিল,— দু বছরের একটানা কাজের পরে এক বছর হবে আমার ছুটি, মনপ্রাণ দিয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র আর উৎস-স্থান প্যারিসের প্রবহমান জীবনের মধ্যে থেকে তার আধিমানসিক আর আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গ পরিচয় অর্জন ক'রবো— নিজের মন আর আত্মার প্রসারের জন্য, চিত্তের স্বাস্থ্যের জন্য— বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিটা হবে আনুষঙ্গিক, গৌণ ব্যাপার, মুখ্য নয়। ছেলেবেলা থেকেই, অর্থাৎ এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাস ক'রে ১৯০৭ সালে কলেজে ঢুকেই, গ্রীস রোম আর আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস প'ড়তে আরম্ভ ক'রে, ইউরোপের সভ্যতা আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছা— কেবল জিজ্ঞাসা নয়, জ্ঞান-পিপাসা বা জ্ঞান-বুভুক্ষা— মনের মধ্যে গজিয়ে উঠ্‌ছিল, সেই ক্ষুধা বা তৃষ্ণা মিটাবার জন্য ইউরোপের প্রাচীন মধ্যযুগীয় আর আধুনিক সংস্কৃতির লীলা-ভূমি বিভিন্ন কতকগুলি দেশ দর্শনের আগ্রহ মনের মধ্যে বলবৎ হ'য়ে উঠ্‌ছিল। ইংলাণ্ডের পরেই প্রথম ফ্রান্সের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ এই হ'ল। এক বৎসর ছিলুম প্যারিসে।* এই যাত্রাতেই, প্যারিসের পাট এক বছরে চুকিয়ে, ১৯২২ সালে নভেম্বর মাসে বাড়ি ফেরবার পথে, সেপ্টেম্বর অক্টোবর আর নভেম্বর এই তিনটে মাসে (পূরো তিনটে মাস নয়— সেপ্টেম্বরের আদ্ধেক, অক্টোবর পূরো, আর নভেম্বরের

---

* ১৯২২ সালের ৭ জুন তারিখে সুনীতিকুমার গ্রীস থেকে প্রমথ চৌধুরী মশায়কে এক পত্রে লেখেন : "১৯২১-এর আগস্ট থেকে ১৯২২-এর এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত, এই মাস নয়েক একটানা প্যারিসে কাটাই।" পত্রখানি 'সবুজ পত্র'-এ ছাপা হয় (বঙ্গাব্দ ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)। দ্রষ্টব্য 'পথ-চল্‌তি', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১।—অ।

আন্ধেক, সব মিলে দু মাস মাত্র), ইটালি গ্রীস আর জর্‌মানি একটু দেখে আস্‌তে পারি। সহায়-সম্বলহীন বৃত্তিভুক্ গরিব ছাত্রের পক্ষে তখন তা এক অভাবনীয় ব্যাপার হ'য়েছিল।

আলোচ্য বা অধ্যেতব্য বিষয় আর উপযুক্ত গুরু ঠিক ক'রে নিয়ে তবে গুরুকুল বা বিদ্যালয় বেছে নিয়ে সেখানে অধ্যয়ন ক'রতে যাওয়া— কেবল পাঠ নেবার জন্য নয়, একটু উঁচু ক্ষেত্রে আলোচনা বা গবেষণা করা যখন উদ্দেশ্য— এইটেই হ'চ্ছে সনাতন রীতি, কি প্রাচীন আর মধ্য-যুগের ভারতে, আর কি প্রাচীন গ্রীসে, মধ্য-যুগের অথবা আধুনিক কালের ইউরোপের নানা দেশে। প্যারিসে ভারতীয় বাকৃতত্ত্বের সম্বন্ধে বিখ্যাত গবেষক আর অধ্যাপক Jules Bloch ঝ্যুল্ ব্লক, তিব্বতী আর ইন্দোচীনের ভাষা আর সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত Jean Przyluski ঝাঁ প্‌শিলুস্কি, ইন্দো-ইউরোপীয়বর্গের ভাষাতত্ত্বের অদ্বিতীয় পণ্ডিত, এই বিষয়ে আমাদের যুগে ইউরোপের অন্যতম নেতা অধ্যাপক Antoine Meillet আঁতোয়ান্ মেইয়ে, আর সমগ্র এশিয়া খণ্ডের তাবৎ দেশের সংস্কৃতি ইতিহাস ভাষা সাহিত্য প্রভৃতিতে একপত্রী— কি তিব্বতী আর মোঙ্গোল, কি ফারসী আর সংস্কৃত, কি চীনা আর জাপানী, আর আরও অনেক বিষয়ে— অধ্যাপক Paul Pelliot পোল্ পেলিও; আর উপরন্তু সংস্কৃত চীনা তিব্বতী ভাষা সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধ্যাপক Sylvain Lévi সিল্‌ভ্যাঁ লেভি— এই রকম কতকগুলি বিরাট্ বিরাট্ পণ্ডিতের চরণতলে ব'সে কিছু পড়্‌বার শোন্‌বার আগ্রহ নিয়েই প্যারিসে আস্‌বো ঠিক ক'রেছিলুম। ভাগ্যক্রমে সরকার থেকে এক বছর প্যারিসে থাকবার, আর ইচ্ছামতো যা খুশি যেখানে ইচ্ছা পাঠ নেবার, দেখ্‌বার শোন্‌বার, অনুমতি পাওয়া গেল— বৃত্তির মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

বিবেকানন্দ ব'লে গিয়েছেন—অমরাবতী-তুল্য প্যারিস।* স্বর্গের অমরাবতী কেউ দেখে নি। কিন্তু বিগত ৩।৪ শতক ধ'রে প্যারিস-নগরী তার সৌধ-সমৃদ্ধিতে, তার শিল্প-গৌরবে, তার নাগরিকদের চিন্তাশীলতায় আর সহজ সৌজন্যে, তার পণ্ডিত আর বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞানের গভীরতায় আর প্রসারে,

* "এ বিরাট রাজধানী মর্ত্যের অমরাবতী, সদানন্দ-নগরী।" (দ্রষ্টব্য 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', "পারি ও ফ্রাঁস"-শীর্ষক অধ্যায়)। —অ।

ফরাসি ভাষার সাহিত্যের অপূর্ব গুণাবলীতে, ফরাসি নাট্য আর অন্য শিল্পকলার মহিমায়, পৃথিবীর শীর্ষস্থানে। সারা পৃথিবীর তাবৎ সংস্কৃতিপূত ব্যক্তিরা প্যারিসের জয়গানে মুখর— প্যারিস হ'চ্ছে Ville Lumière 'ভিল্‌-ল্যুমিয়ের্' বা আলোক-নগরী, সেখানে অবস্থান ক'রতে পারাতেই চিত্তের প্রসার হয়। ভাব-জগতে, সৌন্দর্য্য-জগতে চিন্তা-জগতে প্যারিস বাস্তবিকই অমরাবতী-তুল্য। প্যারিসে এক বছর নির্ভাবনায় থাকতে পারা যাবে, কথাটা ভাবতেই আনন্দ হ'চ্ছিল। আগে থেকেই আমার পূর্ব-পরিচিত অধ্যাপক ঝ্যুল্‌ ব্লক, যাঁর কাছে আমার সম্বন্ধে লণ্ডন থেকে অধ্যাপক J. B. Anderson জে. বি. আণ্ডার্সন লিখেছিলেন আর যিনি আমার কাজের কথাও শুনেছিলেন, তাঁকে চিঠি লিখি— তিনি জবাব দেন, তুমি আগে এসে থিতু হ'য়ে প্যারিসে ব'সো, তার পর কী পড়াশুনা ক'রবে, কী ডিগ্রি নেবে সে-সব কথা পরে হবে।

লণ্ডন থেকে বিদায় নিয়ে প্যারিসে উপস্থিত হ'লুম, ঠিক মনে প'ড়ছে না কবে, বোধ হয় ১৯২১ সালে সেপ্টেম্বর [? আগস্ট] মাসে। ঐ সময়েই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়, কলেজগুলি খোলে, অধ্যাপকেরা বাইরে থেকে শহরে ফেরেন। প্যারিসে একটি বাঙালী ছাত্রবন্ধু কয় সপ্তাহ ধ'রে বাস ক'রছিলেন, তিনি অক্সফোর্ডে থেকে পড়াশুনা ক'রছিলেন, ফরাসি ভাষাটা একটু যড়্‌গত ক'রে নিয়েছিলেন, চিঠি লিখে তাঁর বাসাতেই ঘর ঠিক ক'রে, সেখানেই উঠ্‌লুম। ঐ সময়ে আমি ফরাসি প'ড়ে বুঝতে পারি, একটু একটু লিখতে পারি, কিন্তু তড়বড় ক'রে ফরাসিতে কথা ব'লতে তখনও শিখি নি (এখনও তো খুব তাড়াতাড়ি ফরাসি বলার অভ্যাস হয় নি)। যা হ'ক. বন্ধুর বাসায় ঘর একখানি পেয়ে, সপ্তাহখানেক সেখানে থেকে, চারিদিক একটু বেয়ে চেয়ে দেখা গেল— অবস্থাটা একটু বোঝা গেল। তার পরে পাকাপাকি বাসা পাওয়া গেল ১৬ নং Rue de Sommerard র‍্যূ-দ্য-সোম্‌রার্‌-এ একটি বাড়িতে। এই রাস্তাটি প্যারিসের কেন্দ্রস্থলে ; Notre-Dame নোত্র্‌-দাম গির্জার খুব কাছে, ইউনিভার্সিটি-পাড়া Quartier Latin "কার্তিয়ে লাত্যাঁ"র মধ্যে। প্যারিসে পূরা বছরটা প্রায় এই বাড়িটিতে কাটাই। আমাদের সময় থেকেই ষোলো নম্বর র‍্যূ-দ্য-সোম্‌রার্‌-এর বাড়ি ভারতীয় ছাত্রদের একটা নামী বাসাবাড়ি হ'য়ে দাঁড়ায়— আমি প্যারিস থেকে চ'লে যাবার বহু বৎসর পরেও এখানে দুটি চারটি ক'রে ভারতীয় ছাত্র বাস ক'রতেন। ঐ সময়ে,

এখন থেকে প্রায় ৪৮।৫০ বছর আগে, ভারতীয় ছাত্র ব'লতে মুখ্যতঃ বাঙালী ছাত্রই বুঝাতো—অন্য প্রদেশের ছেলে ইংলাণ্ড ছেড়ে ফ্রান্সে বড়ো একটা যেত না, যদিও আমাদের আগে হরিচন্দ শাস্ত্রী ব'লে একজন পাঞ্জাবী সংস্কৃতবিৎ ছাত্র প্যারিসে থেকে অধ্যাপক সিল্ভ্যাঁ লেভির কাছে প'ড়ে প্যারিস-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট পেয়ে যান। ষোলো নম্বর র‍্যূ-দ্য-সোম্‌রার্‌-এর বাড়িতে ১৯২১-১৯২২ সাল এই এক বছর ছিলুম, তখন ওখানেই আমার সঙ্গে থাকতেন—বন্ধুবর পরলোকগত অধ্যাপক সুবিখ্যাত ডক্টর কালিদাস নাগ, আর পরলোকগত অধ্যাপক ডক্টর ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ (ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত-পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক)—আমরা এই তিনজন ওই বাড়ির পাকা বাসিন্দে। আর আমাদের পাড়ায় থাকতেন অমিতাভ ঘোষ, চন্দননগরের ছেলে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফরাসি সেনাদলে স্বেচ্ছায় যোগ দেন, Verdun ভ্যার্দ্যাঁ-র যুদ্ধে ছিলেন, অধ্যাপক লেভি আর তাঁর স্ত্রী এঁকে নিজেদের ছেলের মতো দেখতেন। মধ্যে মধ্যে লণ্ডন থেকে বাঙালী আর ক্বচিৎ অন্য প্রদেশের ছাত্রবন্ধুরা আমাদের এখানে এসেই উঠতেন। আমাদের সময়ে প্যারিসে বাঙালী ছাত্র বা গবেষকদের মধ্যে ছিলেন পরলোকগত ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অন্যতম অধ্যাপক পরলোকগত ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র (প'রে যিনি জাতীয় অধ্যাপক হন), আর পরবর্তী কালে ক'লকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক আর গবেষক ডাক্তার অমূল্যচরণ উকিল। শেষের এঁরা তিনজন প্যারিসের অন্য পাড়ায় থাকতেন, কিন্তু আমরা প্রায়ই সন্ধ্যার সময়ে র‍্যূ-দ্য-সোম্‌রার্‌-এর বাড়িতে জমা হ'তুম, আর দল বেঁধে প্রায়ই একসঙ্গে বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় সায়মাশ বা সান্ধ্য আহার সারতে যেতুম,—আবার কখনও কখনও নাটক অপেরা প্রভৃতিও একত্র দেখতে যেতুম। অন্য ভারতীয় ছাত্র কেউ লণ্ডন বা বার্লিন বা অন্য কোনও জায়গা থেকে এসে গেলে, আমাদের এই দলে সানন্দে ভিড়ে প'ড়্‌ত। তখন আমরা কাজ-চালানো ফরাসি ব'লতে পারি, সহজেই তাদের দোভাষীর কাজ ক'র্‌তে পারতুম।

ভারতীয় ছাত্র আমরা অল্প এই কয়জন ছাড়া, প্যারিসে তখন Mauritius (বা Maurice) মরিশস্‌ দ্বীপপুঞ্জে উপনিবিষ্ট ভারতীয় ঘরের ছেলেও ৪।৫ জন দেখেছি। তাদের মধ্যে 'রামা' ব'লে একজন ছিল, এখানে ডাক্তারি প'ড়ত। ভাষায় তমিল। মরিশসে উপনিবিষ্ট ভারতীয়দের মধ্যে, বিহারী

(ভোজপুরী) আর পূর্বীহিন্দীভাষীদের সংখ্যাই হ'চ্ছে বেশি, আর কিছু তমিলভাষী। এদের পূর্ব-পুরুষ সব আখের ক্ষেতে চাষ-আবাদ করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ কুলি হ'য়ে ঐ দেশে যায়, তারপরে ওখানেই র'য়ে যায়, ভারতে আর ফেরে না। ফরাসিরা ছিল তখন মরিশস্ দ্বীপাবলীর মালিক, তাদের ভাষাই বেশি চ'লত, গতিকে ভারতীয়েরাও ফরাসি শিখ্‌ত। আজকাল অবশ্য ফরাসির রেওয়াজ ক'মে যাচ্ছে, ইংরিজিই বাড়্‌ছে। স্বদেশে রামার শিক্ষাদীক্ষা প্রধানতঃ ফরাসিতেই হ'য়েছিল, তাই প্যারিসেই ডাক্তারি প'ড়তে আসে। বেশ মিশুক প্রকৃতির ছিল। ধর্মে হিন্দু, পরে ভারতে এসে নিজেদের সমাজের একটি মেয়েকে বিয়ে ক'রে নিয়ে যায়। প্যারিসে কিন্তু একটি মেয়ের সঙ্গে ঘর-বসত ক'রত—তাকে হয়তো রেজেস্টারি ক'রে বিয়ে ক'রে থাকতে পারে। রামা আমাদের পাড়াতেই থাকত।

ছাত্র নয়, ব্যবসায় উপলক্ষে প্যারিসে বাস ক'রছেন সপরিবারে, এমন কতকগুলি সিন্ধী আর গুজরাটী পরিবারও ছিলেন। এঁরা মুখ্যতঃ মুক্তার আর হীরা-জহরতের কাজ ক'রতেন। অন্য পাড়ায় বা প্যারিসের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে এঁরা থাকতেন। দু-চারজন ছাত্র আমরা যারা ছিলুম, তাদের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ মোটেই ছিল না। শ্রীযুক্ত রাণা ব'লে একটি প্রাচীন গুজরাটী ভদ্রলোক, জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমিক, ব্যবসায়ীও বটে, তিনি ছিলেন এঁদের সমাজের নেতা। রবীন্দ্রনাথ প্যারিসে গেলে, শ্রীযুক্ত রাণা তখন এঁদের একজোট ক'রে, রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানান। পরে ডক্টর কালিদাস নাগ এসে যখন প্যারিসে বাস ক'রতে লাগলেন, আমাদের সময়ে, তখন তিনি শ্রীযুক্ত রাণার সাহায্যে এঁদের নিয়ে একটা পাকাপাকি রকমের ভারতীয় সমিতি বা সংস্থা গ'ড়ে তুললেন, বছরে ২/১ বার দীপাবলী আর অন্য উৎসবের সময়ে এঁদের সামাজিক মিলনের ব্যবস্থা আরম্ভ ক'রলেন, আর এঁদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ ক'রে, সেই টাকায় ভারতীয় ছাত্র ২।৩ জনের প্যারিসে এসে পড়াশুনা করবার ব্যবস্থাও ক'রতে সমর্থ হ'লেন—বোধ হয় ৩।৪ বৎসর মাত্র প্যারিসের ভারতীয় বণিকদের অর্থ-সাহায্যে এইভাবে ৩।৪টি ছেলে, বিজ্ঞান বা চিত্রবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে প্যারিসে এসে থেকে অধ্যয়ন করবার সুযোগ পায়। পরে উৎসাহের অভাবে এটা বন্ধ হ'য়ে যায়।

আমাদের সময়ে প্যারিসে ভারতবর্ষের সুনাম আর গৌরব বাড়াবার জন্য

কালিদাস-বাবু নানাভাবে অজস্র চেষ্টা ক'রতেন। প্যারিসের সাংস্কৃতিক জীবনে, জ্ঞানের জগতে ভারতীয় ছাত্রদের যাতে পূর্ণ প্রবেশ, আর সম্ভব হ'লে অংশগ্রহণ, ঘ'টতে পারে, সে বিষয়ে তিনি সর্বদা চিন্তা ক'রতেন, কাজ ক'রতেন। আমরা এক বাসায় পাশাপাশি ঘরে থাকতুম, তাঁর হৃদ্যতা আর সাহচর্য্য, আর তাঁর হিতৈষণা, প্যারিসের সব কিছু যাতে ভালো ক'রে আমি দেখতে পারি, বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে যাতে আমার পরিচয় হয়, সে বিষয়ে তাঁর অভূতপূর্ব আগ্রহ ছিল। প্যারিসের ছাত্রজীবনের কথা মনে হ'লেই, তাঁর সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতায় মন ভ'রে ওঠে।

প্যারিসে পড়াশুনার কথা, মানসিক চর্য্যার কথা বল্‌বার আগে, প্যারিসে ১৯২১-১৯২২ সালে ছাত্র হিসাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটু পরিচয় এইবার দিয়ে নিই। বিদেশীর পক্ষে প্যারিসে থাকবার বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। এক—হোটেলে গিয়ে ওঠা। সব-চেয়ে খরচ হোটেলে থাক্‌লে। খুব বেশি দামের হোটেলে দিন-খরচা সব ধ'রে তখন ছিল ৭০।৮০।৯০ টাকা; আজকাল তো আরও বেশি। ছোটোখাটো মধ্যবিত্ত চালের হোটেলে ২০।২৫ টাকা লেগে যেত। কাজেই আমীরি চালে থাক্‌বেন এমন পয়সাওয়ালা লোক ছাড়া, বারো মাস হোটেলে থাকার কথা, আমাদের মতো মধ্যবিত্ত ছাত্র কেউ ভাবতে পার্‌ত-ই না। তারপরে pension "পাঁস্যিঁ"। এটাকে শস্তায় থাকার বাড়াবাড়ি বলা যায়। একটা ঘর দেয়, সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় তিন বেলা আহারের ব্যবস্থা আছে, বাড়ির মালিক আর তাঁর স্ত্রী, পুত্র কন্যাদের সঙ্গে ঐ একই বাড়িতে থাকে—paying guest "পেয়িং গেস্ট্" বা "ভাড়াটে অতিথি"র মতন থাকতে হয়। ছাত্রদের হস্টেল বা ছাত্রাবাস আছে, নানা কলেজের সঙ্গে সংলগ্ন—কিন্তু আমরা সাধারণ ছাত্রের পর্য্যায়ের তো ছিলুম না—সেইজন্য সেই-রকম হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা আমাদের জন্য সহজ ছিল না। প্যারিসে—লণ্ডনেও যেমন—কোনও ভদ্রলোক একটি বড়ো বা মাঝারি আকারের বাড়ি ভাড়া নিলেন, ৩।৪।৫।৬ তলা বাড়ি, প্রতি তলায় ৪।৫।৬টি ক'রে ঘর, আর একটা ক'রে শৌচাগার আর স্নানের ঘর। স্নানের ঘর আবার সব বাড়িতে হ'ত না। সব-নীচের তলায়—কখন কখনও বা ইংরিজিতে যাকে বলে basement, অর্থাৎ রাস্তার নীচেকার তলায়—সব ঘরগুলি যিনি বাড়ি ভাড়া নিলেন তিনি সেই basement-এ সপরিবারে থাক্‌বেন। আর উপরের

সব তলার ঘরগুলি—এক একখানি ঘর—মাস ভাড়া হিসাবে ভাড়াটে বসাতেন। একজন, বা দুজন থাক্‌বার মতো ঘর। যথারীতি furnished অর্থাৎ খাট-পালঙ্ক টেবিল-চেয়ার আলমারি-বিছানাপত্র দিয়ে সাজানো। ফরাসিতে এই রকম furnished room-কে বলে chambre-meublée "শাঁব্র্‌ম্যব্লে"। র্যু-দ্য-সোম্‌রার্‌-এ আমাদের বাড়িতে এইভাবে বিভিন্ন ঘরে ভাড়াটের বসতি ছিল। মূল মালিক-ভাড়াটে, তাঁকে বলা হ'ত Monseur le Patron "মঁসিয়্য-ল্য-পাত্রঁ" অর্থাৎ "বাড়ি-আলা-মশাই", আর তাঁর গৃহিণী ছিলেন Madame la Patronne "মাদাম্‌-লা-পাত্রন্‌" বা "বাড়িআলী-গিন্নী"—এঁরা ছেলেপিলে ঝি-চাকর নিয়ে নীচের তলায় ঘর কয়টি দখলে রাখ্‌তেন। আমি, একজনের উপযোগী এইরকম, একটি ছোটো ঘর নিই। খাট বিছানা ইত্যাদি দিয়ে সাজানো—বিছানার চাদর-টাদর যথারীতি ব'দলে দিত। আমার ঘরের ভাড়া ছিল মাসে তখনকার দিনে ১৮০ ফ্রাঁ—তখনকার ইংরিজি তিন পাউণ্ডের কিছু কম। বাড়িতে একাধিক ঝি আর চাকর ছিল ; ভাড়াটে ছিল সব কয়টি ঘর মিলিয়ে' প্রায় ৩০ জন, তাদের সকলকার ঘর পরিষ্কার ক'রে রাখ্‌ত, ব্যস্‌। একটি ফরাসি যুবক, বয়স বছর ২৮।৩০ হবে, ঐ বাড়ির অন্যতম চাকর—সে আমাদের দোতলার ঘরগুলির তদ্‌বির ক'রত। অর্থাৎ প্রত্যেক ঘরটি দুবেলা সকাল-সাঁঝ ঝাঁটা দিয়ে ঝেড়ে মুছে সাফ ক'রত, আর রোজ ভোর সাতটার আগেই পুরুষ ভাড়াটেদের ঘরে ঘরে একটি মগে ক'রে গরম জল দিয়ে যেত, দাড়ি কামাবার জন্য। দরকার হ'লে ছোটোখাটো ফাই-ফরমাসিও খাটত। এই সেবার জন্য তাকে প্রতি মাসে ২০ ফ্রাঁ ক'রে pour-boire "পূর্‌-বোআর" বা জল-পানি অর্থাৎ বখশিশ দিতে হ'ত, তাতে সে খুশি ছিল। ১৮০ আর ২০, দুইয়ে মিলে "শাঁব্র্‌ম্যব্লে"তে থাকার খরচ ছিল ২০০ ফ্রাঁ। খাবার ব্যবস্থা ছিল রেস্তোরাঁয়। বাড়িআলা বাড়িআলী ঘর ভাড়া দিয়েই, বিছানাপত্র দিয়েই খালাস। তবে যেদিন স্নান ক'রতুম, সেদিন স্নানের ধাতুনির্মিত চৌবাচ্চায় গরম জল ভ'রে দিত, আর একখানা মস্ত চাদর দিত, চাদরখানা জলের টবের ভিতর পাতা হ'ত, স্নানের পরে গায়ের ময়লা সাবানের ফেনা সব চাদরের গায়ে লেগে থাকৃত, চাদর তুলে নিয়ে ধোপার বাড়ি পাঠাত, জলের টবের ভিতরটা ময়লা হ'ত না।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল নিজেদের। পূরো একদিনের দিনচর্য্যা ১৯২১-

২২ সালে আমাদের কিভাবে হ'ত তার কথা ব'লে, আমাদের প্যারিসের ছাত্র-জীবনের প্রসঙ্গ এইবার আজকের মতো সাঙ্গ করি।

ভোর ছটার আগেই আমার ঘুম ভাঙ্ত। গ্রীষ্মকালে ৫টার দিকেই বেশ আলো, শীতে ৭টা ৭॥ টাতে বেশ আঁধার। ৬টার দিকেই মিউনিসিপালিটির আবর্জনার মোটর-লরির ইঞ্জিনের আওয়াজ রাস্তা থেকে কানে আস্ত। আমার ঘর ছিল সরু রাস্তা র‍্যু-দ্য-সোম্‌রার্‌-এর উপরেই, দোতলায় বিরাট এক জানালা ছিল রাস্তার উপরে, গ্রীষ্মে তার কাচের শার্সিও খুলে রাখা চ'ল্‌ত। ময়লা-গাড়ির আওয়াজ—প্রত্যেক বাড়ির দরজার সামনেই গাড়ি থাম্‌ছে আর বাড়ি থেকে ঝি-চাকর, বড়ো-বড়ো বালতি বা ডোলে ক'রে সারা দিন ঘরে জমা-করা বাড়ির জঞ্জাল, ডোলগুলি টেনে এনে-এনে কপি-কলের সাহায্যে ময়লা-গাড়ির মধ্যে তাদের জঞ্জাল ঢেলে দিচ্ছে, ধাতুর বালতি বা ডোলগুলির শব্দে বোধ হয় কারো ঘুম টিক্‌তে পারে না ;—তবে ওদেশে ভোরের নিদ্রায় কাতর কুম্ভকর্ণের অভাব নেই। তার পরে পাইপে ক'রে রাস্তায় জল দেবার, আর বড়ো বুরুশ নিয়ে ফুটপাথের ধারগুলি পরিষ্কার করার আওয়াজ। প্রাতঃকৃত্য সেরে, একটু ব্যায়াম ক'রে নিয়ে তৈরি হওয়া যাচ্ছে। বাড়ির ভিতরে কে বা কারা কাঠের সব সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা শুরু ক'রছে। সাড়ে-ছ'টার মধ্যে, আমার ঘরের চাকর, তার নাম ছিল Jean ঝাঁ (অর্থাৎ John জন), বাইরে থেকে দরজায় টোকা দিলে। দরজা খোলাই রাখ্‌তুম, ছিটকিনি আর দিতুম না—Entrez "আঁত্রে" অর্থাৎ "ভিতরে এসো"—Enter— ব'ললেই সে বড়ো এক জগ্‌ ক'রে গরম জল নিয়ে ঘরে ঢুকত। আমাদের এই ঝাঁ চাকরটি ছিল একটি সরল-প্রাণ যুবক, তার ঘরের কথা মনের কথা আমায় ব'ল্‌ত। বড়ো মজার লোক ছিল। আমার ফরাসির দৌড় তখন বিশেষ ছিল না—প্রাতঃকাল ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকেই আমার ভাঙা ভাঙা ফরাসি নিয়ে তার উপরেই চড়াও হ'তুম—ঝালিয়ে নিতুম বলা চলে। ঝাঁ বোঝবার চেষ্টা ক'রত, সে এক হিসাবে আমাকে ফরাসি শেখাবার গুরুই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। ঝাঁ-র কথা প্যারিসের বিষয়ে কিছু ব'লতে গেলে আপনিই এসে যায়—তার সম্বন্ধে একটু ভালো ক'রেই পরে ব'লবো। ঝাঁকে দুই-একটি খবর শুধোতুম, সে-ও দিনের খবর, বাড়ির খবর, পাড়ার খবর, নিজের খবর আমায় শোনাত। এইভাবে ঘুম থেকে উঠেই ফরাসির চর্চা একটু

বিনা মূল্যে বিনা শ্রমে হ'ত। ঝাঁ তারপরে যেত অন্য ঘরের বাসিন্দাদের খেদমতে। তার আনা গরম জলে কামিয়ে নিয়ে, মুখ হাত ধুয়ে, কাপড় প'রে, সারা দিনের মতন তৈরি হওয়া যেত'।

এদিকে বেলা সওয়া-আটটা সাড়ে-আটটা হ'তে যাচ্ছে। ছোট্টো রাস্তাটি এইবার লোক-চলাচলে, লোকের গলার আওয়াজে, ঘোড়ার-গাড়ির আওয়াজে, কখনও-কখনও দুই-একখানি মোটর-গাড়ির আওয়াজে জ'মে উঠছে। এই পাড়ায় গৃহস্থ লোকেরই বাস, দোকান-পাট আপিস-টাপিস তেমন নেই। কাছেই ছোট্টো একটি মিউজিয়ম—Musée de Cluny 'ম্যুজে-দ্য-ক্ল্যনি'—মধ্য যুগের শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহশালা। তার লাগাও ছোট্টো একটি বাগান, প্লেন গাছের মাঝে-মাঝে ঘাসের উপরে বসবার বেঞ্চি। পাড়ার ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়েরা খেল্‌ছে রাস্তায় এসে—তাদের উচ্চ কণ্ঠধ্বনি। ফেরিওয়ালা দু-একজন যাচ্ছে, নানান্ ঘর-গেরস্থালির কাজের মিস্ত্রি; তাদের মধ্যে একটি মানুষের বিচিত্র ব্যবসা আর তার কণ্ঠস্বর এখনও মনে প'ড়ছে—Vitrer, au Vitrer—"ভিত্রে, ও ভিত্রে" অর্থাৎ 'জানালার ভাঙা কাচ জোড়া লাগাবে গো!' গরিব বিধবা মেয়ে দু-চারটি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সুর ক'রে ফরাসি ছড়া কেটে-কেটে ভিক্ষায় বেরিয়েছে—বড়ো-বড়ো রাস্তায় এভাবে ভিক্ষায় বেরোতে এদের মানা, সাহসও করে না—সেই ছড়ার সুর বড্ড মিষ্টি বড্ড করুণ শোনাত। দোতলার ঘরে ব'সে-ব'সে জানালার ভিতর দিয়ে ছোট্টো রাস্তাটিতে ফরাসি Bourgeois 'বুর্‌ঝোআ' বা শহুরে বা নাগরিক জীবনের এইরকম ছোটো-খাটো দৃশ্য দেখতুম। আবার লেখা-পড়ার কাজও একটু-আধটু ক'রতুম। তারপরে দিনের কাজ বুঝে, প্রায় সারা দিনের মতো বা'র হ'তুম—প্যারিস-বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর গবেষণা-মন্দিরে—La Sorbonne 'সর্‌বন্' নামে বিখ্যাত বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ঝ্যুল্ ব্লক-এর সঙ্গে কিছু পাঠ বা আলোচনার জন্য যাবো, কি Collège de France কলেঝ্-দ্য-ফ্রাঁস্ বা শ্রেষ্ঠতম বিদ্যা আর ভাষণ-গৃহে অধ্যাপক Pelliot পেলিও অথবা অধ্যাপক Meillet মেইয়্যের ক্লাসে যাবো, কি École des Langues Vivantes Orintales 'একল্-দে-লাঁগজ্-ভিভাঁজ্-ওরিআঁতাল্'-এ অর্থাৎ প্রাচ্যদেশের জীবিত ভাষার বিদ্যা লয়ে গিয়ে অধ্যাপক Przyluski প্‌শিলুস্কির কোনও ক্লাসে যাবো—এটা 'রুটিন' দেখে স্থির ক'রে নিয়ে, প্রথম প্রাতরাশ সমাপনের জন্য বা'র হ'তুম। 'সর্‌বন্'

আর 'কলেঝ্-দ্য-ফ্রাঁস' এই দুটি প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি, আমাদের বাসার কাছেই—দু-তিন মিনিটের পথ। প্রাচ্যভাষা-বিদ্যালয়ে, কিংবা জাতীয় গ্রন্থাগার Bibliotheque Nationale বিব্লিওতেক নাসিওনাল-এ গিয়ে সারা দিন, প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, ঐখানেই পড়াশুনা ক'রতুম—গ্রন্থাগারেই রেস্তোরাঁ ছিল, সেখানেই দুপুরের খাওয়া শেষ ক'রতুম।

আমাদের বাসা থেকে প্রাতরাশের জন্য যখন বা'র হ'তুম, প্রায়ই বন্ধুবর কালিদাস-বাবু (ডক্টর নাগ) আর আমি একসঙ্গেই যেতুম। কালিদাস-বাবু আমাদের Quartier Latin কার্তিয়ে লাত্যাঁ বা ইউনিভার্সিটি পাড়ার দোকান-পাটের সম্বন্ধে প্রথমেই আমায় ওয়াকিবহাল ক'রে দিয়েছিলেন—রাস্তার মোড়ের ঐ ছোট্টো Café 'ক্যাফে' বা কফিখানাটি শস্তা আর চমৎকার, ও পাশের ছোট্টো রেস্তোরাঁটিতে খুব সুন্দর cidre 'সিদ্র' বা আপেলের রস পাওয়া যায়, খাতা আর কালিকলমের জন্য মনিহারির দোকান ঐ পাশের সরু গলিটায় আছে, ইত্যাদি। সকালে বেরিয়ে সর্‌বনের বাড়ির প্রায় সামনেই আমাদের বাড়ির কাছে একটি ছোট্টো ক্যাফে—এটিই সুবিধার আর শস্তার মনে হ'ত, ছাত্রেরা অনেকেই প্রাতরাশ সার্‌বার জন্য এখানে জুটত। ছোট্টো ঘরটি, এক গোল বুক-সমান উঁচু টেবিলে সকালের জন্য ফরাসি petit dé-jeuner 'প্তি-দ্য-ঝ্যনে' বা ব্রেকফাস্টের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য বারকশে প্লেটে বা ঝুড়িতে সাজানো থাক্‌ত—অর্ধচন্দ্র আকারের প্যারিসের বিখ্যাত croissant ক্রোআসাঁ রুটি—আমাদের সময়ে মাখনের ময়ান দিয়ে তৈরি মুচ্‌মুচে এই রুটিগুলি অতি সুস্বাদু লাগ্‌ত, আর তা ছাড়া অন্য নানা রকমের রুটি, pâtisserie 'পাতিস্রি' বা pastry অর্থাৎ কেক-মিঠাই—কাটা কেকের টুক্‌রো, নানা রকমের বিস্কুট, পীচ বা আপেল বা কলা প্রভৃতি ফল; ডিম মাছ মাংস প্রভৃতি ভারী খাদ্যদ্রব্য থাক্‌ত না। ফরাসি ব্রেকফাস্ট খুবই হাল্‌কা হ'ত। দুটো বা তিনটে ক্রোআসাঁ, বা দু টুকরো কেক, আর এক বাটি কফি বা দুধ, ব্যস্। চা পাওয়াই যেত না—বিশেষ ক'রে অর্ডার দিলে তবে প্রায় অখাদ্য চা এক বাটি মিল্‌তে পার্‌ত। মাখন জ্যাম টোস্ট-এর রেওয়াজ ছিল না, আর পরিজ ডিম মাছ বা মাংসের একটি পদ, আর ২।৩ বাটি চা—ইংরিজি মতে এই গুরুভার প্রাতরাশ ফরাসিদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। ক্যাফের বুক-উঁচু টেবিল, যার উপর খাদ্যদ্রব্য সাজানো থাক্‌ত, তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একটা প্লেটে ইচ্ছামতো এই-সব খাবার

নিজের হাতে নিয়ে খাওয়া যেত—ব'সে খাবার জন্য টেবিল চেয়ার ২।৩ খানা থাকলেও, অন্য ছাত্রদের মতো আমরাও বসে খেতুম না। টেবিলের ওপাশে দোকানের মালিক দাঁড়িয়ে, সদা হাস্যময়, ফরাসি নাগরিকদের দরে একটু বেঁটে-খাটো মানুষ, মুখে অল্প গোঁফ, সাইফন টিপে কফি দুধ অন্য পানীয়ে পাত্র ভ'রে গ্রাহকদের সামনে এগিয়ে দিচ্ছে। খবরের কাগজও দুই-একখানা থাকে, খেতে-খেতে কেউ-কেউ চট ক'রে তাতে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। দোকানদার কোথায় কী হ'চ্ছে না হ'চ্ছে, বিশেষতঃ ফ্রান্সে আর ইউরোপে, সে-বিষয়ে খুবই খবর রাখে, রাজনীতিতে পোক্ত, ছাত্রদের সঙ্গে সমানে-সমানে আলাপ করে। ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কথাও বলে, আবার ছাত্রেরাও তাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ ক'রে নিজেদের কথাও কখনও-কখনও বলে। গরিব ছাত্র, বাড়ি থেকে টাকা আসে নি, চার দিন হয়তো এই ক্যাফের মালিকের সহানুভূতি আর সৌজন্যে ঐখানে কফি দুধ রুটি, ক্বচিৎ ডিমের অমলেট রুটি খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রলে; পরে বাড়ি থেকে টাকা এলে, দিয়ে দিলে। ফরাসি দেশে (অন্য দেশেও এর অভাব নেই) এই সহজ আত্মীয়তার সম্পর্কটা চট ক'রে গ'ড়ে ওঠে, এটি আমার বেশ লাগ্‌ত।

এইভাবে প্রাতরাশ সেরে, বারোটা কি একটা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত। তার পরে দুপুরের খাওয়া। ইউনিভার্সিটি পাড়ায়, ছাত্রদের জন্য এখানে প্রচুর ছোটো-খাটো সব রেস্তোরাঁ আছে। অতি চমৎকার ফরাসি বা অন্য দেশীয় রান্না—গ্রীক, রুমানীয়, চেক, ইতালীয়—আর দুই একটি দূর দেশের—চীনা, জাপানী, 'ম্যারক্' বা মরোক্কোর আরব রান্না, আর ভারতীয় ও সিংহলী। দাম বেশ শস্তা। সাড়ে তিন ফ্রাঁ-তে Table d' Hôte "তাব্-দোৎ" অর্থাৎ চার রকম বাঁধা পদের পুরা মধ্যাহ্ন-ভোজন তখন মিল্‌ত—potage পোতাঝ. বা সুপ, poisson পোআসঁ বা মাছ, viande ভিয়াঁদ বা মাংস তার সঙ্গে garniture গার্নিত্যুর্ অর্থাৎ শাকসব্‌জির টাক্‌না, অথবা পৃথক্ legume লেগ্যুম্ বা কলাইশুঁটি সিদ্ধ বা অন্য সব্‌জি, অথবা champignon শাঁপিয়ঁ্য বা বেঙের-ছাতা (অতি চমৎকার ভাবে রান্না), শেষে dessert দেজেয়ার অর্থাৎ মিষ্টি অথবা fromage ফ্রোমাঝ. বা পনীর অথবা এক বাটি yoghourt য়োগুর্ত্ বা দই, আর উপরন্তু একবোতল লাল মদ—একটু সামান্য গাঁজানো আঙুরের রস ব'ললেই চলে। এ পাড়ায় যারা এই-সব রেস্তোরাঁয় মদ নিত না, তাদের পরিবর্তে পনীর বা

মিষ্টি বেশি একটা দিত। আর একটা স্থবিধা ছিল,—আগাম দাম দিয়ে দশটি সায়মাশের টিকিট কিনে, দশ দিন ধ'রে ঐ একই হোটেলে এসে খাওয়া ঠিক ক'রে নিলে, নয়টি ভোজনের দামে দশটি পাওয়া যেত'—৩'৫০ ফ্রাঁ-য়ে দশটি ভোজনের দাম ৩৫ ফ্রাঁ। ৩১'৫০ ফ্রাঁতেই দশখানি ভোজনের টিকিটের একটি carnet "কারনে" বা একসঙ্গে গাঁথা দশখানি টিকিট পাওয়া যেত'।

বিকালে খিদে পেলে কোনও কেকের দোকানে গিয়ে ব'সে কিছু উপাদেয় ফরাসি মিঠাই খাওয়া যেত', দরকার হ'লে এক কাপ কফি—চা-ভাল ব্যক্তিদের অস্থবিধা, সব জায়গায় চা মিল্‌ত না। রাত্রের আহার—সায়মাস বা নৈশভোজ —ত্বপুরের মতো। বিকালে প্রায়ই আমার ঘরে কিংবা কালিদাস-বাবুর অথবা ফণীদার ঘরে আড্ডা ব'স্‌ত—বাইরে থেকে অন্য বাঙালী ছাত্র বা অভ্যাগত ত্বই-একজনকে প্রায়ই পাওয়া যেত'। প্যারিসের রাস্তায়, Champs-Elysée—'শাঁজে লিসে' বা Les Grands Boulevards 'লে-গ্রাঁ-বুলভার'গুলির মতো বড়ো-বড়ো দোকানে-ভরা উজ্জল আলোয় চোখ-ঝল্‌সানো, মানুষের ভীড়ে জনাকীর্ণ বড়ো সড়কগুলিতে, অথবা ছোটো-ছোটো গলি-ঘুঁজিওয়ালা পুরাতন প্যারিসের ঘিঞ্জি পল্লীতে বেড়ানো আমার বড়োই প্রিয় ছিল। আর তা ছাড়া, প্যারিসে আছে ৪০টা মিউজিয়ম ; প্যারিসের বিখ্যাত নৃত্যনাট্যশালা Opera 'অপেরা', Comedie-Française 'কমেদি-ফ্রাঁসেজ্', Odéon 'ওদেআঁ প্রভৃতি, Vieux Colombier 'ভিয়্যকলঁবিয়ে'-র মতো ছোটো Art Theatre, এসব ছিল বিকাল আর সন্ধ্যা কাটাবার জন্য। আর সপ্তাহে এক-বার অন্ততঃ অধ্যাপক ব্লক অথবা অধ্যাপক লেভির বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ত্বপুর আর বিকাল কাটিয়ে' আসা।

এইভাবে দিনচর্য্যার মধ্যে আমার প্যারিসের এক বৎসরের ছাত্র-জীবন কেটেছিল॥

বেতার জগৎ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭৬।১৯৬৯।

STUDENT LIFE IN CALCUTTA*

If man is a social animal, the young man is a hundred times more so. It is from the society we live in that we are influenced in our tastes and habits of life and thought, and it is worth one's while to try to see the sort of life led by our students to find out how far their social life takes part in forming their mind and character.

Diversity—At the present time one cannot sum up in general terms what might be called the characteristic peculiarities of our student community as a whole. We have here such a bewildering diversity of types as would scarcely be met with in any other land. In the enlightened countries of Western Europe, as well as in the United States and Canada, there is more or less a homogeneity of ideas and ways of thinking among all sections of people, and students there in spite of their aims and aspirations and *esprit de corps* are not separated, we believe, by any sharp line of

---

* This article and the following one (*Hostel Life in Calcutta*) were published in the *Bengal Educational Journal*, Vol II, 1913. The original titles of these two articles were *Student Life* and *Life in the Hostel* respectively. The first article appeared in the August Number of the *Journal* and the following caption from the Editors of the *Journal* appeared in big letters on a separate page :

"The Editors have been extremely fortunate in securing the following article from Mr. S. K. Chatterjee, a popular student of Presidency College. It gives a Vivid Picture of Present Student Life, as it is. It is a description which cannot fail to be of interest to all in any way connected with education.

"We are glad to announce that we have secured from the same author, for next month, another article of an even more detailed descriptive nature."

The second article was published in two instalments, in September and October. As the earliest published original pieces of Professor Suniti Kumar Chatterji, when he was still a student, these interesting records of student life in Calcutta sixty five years ago are being reproduced here.—*A. K. K.*

demarcation from other communities. But in India the students, especially college students, from the very fact of their forming but an infinitesimal fraction of a great mass containing comparatively few literates, may be taken to form a class by themselves. A college student has, for instance, an instinctive sense of superiority over the uneducated classes, but this sense of superiority has nothing of snobbish arrogance about it. He is a student, and none the less a member of society in which the humble ryot or the artisan has his place ; he is only a more intelligent member, and that is all. But among students themselves there are such wide divergences of ideas which are possible only in a society which is, for good or for evil, slowly but surely and certainly undergoing the process of transformation. The world of life around us and the world of ideas we enter into often go counter to one another, and our own ideas and views are the result of our successful or unsuccessful assimilation and reconciliation of the two.

It all depends on the individual and the circumstances that act and re-act upon him ; so that we should not be surprised to find startlingly opposed views among students even of the same class.

Conflict of Ideas—We find students who in their views on life and society and religion and things in general are not a whit behind the students of any country holding the most 'advanced' ideas, and there are others who passionately cling to the ideals of the past. Some are frankly 'rationalistic', others firm and unshakeable in their belief in the faith of their fathers, even to the most inessential forms. These extreme bigots of 'rationalism' or of tradition are rare ; but one can study the mind of the civilised man in its various stages among the student community of this country. The 20th century jostles with the 8th or 12th century, Mid-Victorian England and 18th century France with 16th century Bengal, in our minds in a most strange way. Then there is

the poet and dreamer, side by side with the stolid Philistine, who refuses to be humbugged by any moonshine world of ideas. But all keenly feel happy in their college life; and even the student of straitened circumstances whose life is literally a struggle for existence and who looks up with hope and longing to the time when he will be settled in some respectable profession and freed from his hardships, will admit the years of his student life to be certainly not the least happy in his career.

Equality—One of the greatest advantages of college life lies in the fact that all students are conscious of a sort of social equality among themselves. The Brahman forgets his pride of birth and sits beside the lowliest of the low without the slightest feeling of compunction. Caste-pride among college students is almost an unheard of thing and, if present in very rare cases, it is treated with a good-humoured rebuff which is more effective than the expression of any bitterness. Students of the same class and same college, and especially those who put up at the same hostel, do feel as brothers, although according to social usage and acquired social instincts the Brahman may not take his meal of rice with the Sudra and the latter not insist upon it.

A feeling of equality is perhaps the most important element in the social life of the students of a community in which caste distinction is for the outsider its most obstrusive feature. But Christian influences, indeed, the influence of any creed, have not the slightest force with the Hindu students in this case; this sense of equality and fraternity arises naturally and easily in the course of intimate friendly intercourse among the young men.

The Growth of Self-confidence—Confidence in himself must necessarily come to the student who has to leave the affectionate care of his relations at an early age of 15 or 16 and has to come into a strange city for the purpose of education. In Calcutta the students who live with their

parents—mainly "Calcutta cockneys"—are numerically far inferior to those who come from the villages. The air of urbanity and confident non-chalance, which a student bred in the city naturally has, is soon acquired by the new-comer, to whom it rapidly becomes a second nature. But the long period of separation from home makes his home memories all the dearer to him, and serves only to redouble his love for his village home and the tender emotions which thoughts of it bring to his heart.

The Student from East Bengal—Let us take the case of the average Calcutta student. He generally comes from Eastern Bengal; in Calcutta perhaps three-fourths of the students are from Eastern Bengal. There is little to wonder at it, because linguistically Eastern Bengal covers over two-thirds of the whole presidency. Eastern Bengal students unquestionably form the most vigorous section of the student community of Calcutta in almost all the paths of student activity. They are more determined, more pain-staking, more 'acute' than Western Bengal students. Calcutta is the greatest centre of education in the province, and is the seat of Bengali intellectual activity and culture which are disseminated throughout the country through the students who flock together from all the parts of Bengal. However, our student has no difficulty in getting himself enrolled in one of the first grade colleges in Calcutta if he has matriculated in the first division; he is a college student now, with hope and enthusiasm writ large on his face, conscious that a new chapter, one of the happiest, in his life has begun.

The college building, the number of students, the fact that all lectures are delivered in English and that he is learning from 'Saheb' professors for the first time, the importance he feels as he handles his new books and the elegant note-books—all these tickle his fancy, and tend to make him serious in his studies. He quickly forms new and fast friends. He gets accustomed to the standard Calcutta

pronunciation of his mother-tongue and avoids his Eastern Bengal dialect as much as possible.

Fashions—If a rich man's son, he emulates the Calcutta boys in the latest fashions of their coats and shirts and *Panjabis.* Very soon he gets over his village shyness and reserve, and sometimes his simple and unaffected manners give place to city formality. He often feels a secret compunction when he sees senior students and others express views and do acts *e.g.* eating at Restaurants and 'Hindu Refreshment Rooms'—which hardly conform with the strict orthodoxy in which he has been brought up ; but gradually he acquiesces into all that, persuaded by the arguments of those who are more 'liberal' than he, as well as by the fashionableness of the thing.

Home-sickness—The 'attached mess' or hostel in which he has a 'seat' is of the ordinary type of the bigger Calcutta houses, and he is painfully reminded of the wide fields and the trees and groves of his native village. The novelty of the situation sometimes makes him home-sick, and he then longs for the Puja holidays to be off to his home to breathe the free air of the country and to be petted and treated with every attention and loving care by his relatives.

Religion—The first and second years in the college are most important in a student's career. His mind is more or less in a fluid state and is now moulded into some definite shape. In these two years he forms certain definite ideas of his own on things, and it is these ideas which, more or less modified, abide. In short, he 'finds himself' in these two years. A Hindu boy of 16 or 17, unlike young men brought up in other faiths, has no hard-and-fast religious dogmas. He cannot, and neither does he care to, tell one by rote what he is expected to believe in. Outwardly often careless of religion, he is never irreverent at heart ; he has an inner vein of spiritual emotion which can glow fervently at times. He believes in and reveres the sacred utterances of the seers

of his land to contain precious gems of truth which cannot be found elsewhere ; and in those cases where he takes to personal study of them his belief is confirmed and strengthened. He believes in one great Oversoul, and in the many Gods as manifestations of the Supreme Absolute in the great *avatāras* like Rama and Krishna, and Buddha and Chaitanaya, great exemplars to man and teachers in his striving after the right and the true.

Sometimes his views are as rational and eclectic as of any cultured society ; and in rare cases he becomes a declared agnostic or positivist. But he does not hold image-worship to be a sin, and even though he might not believe in its necessity for his own case, he sees no harm in it, and voluntarily joins with the most devout worshipper of Saraswati in offering flowers to her image and in making a success the annual festival held in the college or the hostel in honour of the Goddess.

His moral notions are neither extraordinarily high, nor are they lower than those of the students of any other community.

Temptations—It is natural for well-wishers of the student community to feel uneasy about the temptations always present in a great city like Calcutta. We cannot speak of the condition of student life in Calcutta in the past, but with regard to the present state, we feel convinced that the general body of students in their character and manners cannot be taken exception to in any way. The student rarely forgets that the confidence of his parents rests upon him, that his brothers and sisters, and it may be, his newly-wed wife, as well as the numerous circles of relations look up to him ; the sense of responsibility on his own account, the esteem of friends, as well as the ever-present question of the examination, make it very difficult for him to entertain unmanly thoughts.

Then there are numerous facilities for innocent enjoy-

ment and display of good fellowship which form the best antidote against any tendency to transgress the ideal of the student's life.

The Failures—With regard to those young men who forget themselves, their number, we believe, is very, very small, and of them we can only say with Robert Louis Stevenson, that "those who got to the devil in youth with anything like a fair chance were probably little worth saving from the first; they must have been feeble fellows—creatures made of putty and pack-thread, without steel or fire, anger or true joyfulness in their composition; we may sympathise with their parents, but there is no cause to go into mourning for their own sake."

All the moral training which a Hindu student receives prior to his coming to college is imparted unconsciously in his home life and home environments. He has no moral training while studying at college. No one can belittle the value of moral training in forming the character of a young man; but his moral training solely depends upon the teacher and the way in which he imparts it. Imposed as a task rather than impressed upon by example as well as precept, any such good intention is liable to fall through, because the students consider themselves men and not babies. But one thing is unmistakable about the Hindu (and also Mahomedan) students; they are more readily roused to serious thoughts by the discourses of teachings of a great teacher of their own community than by anything else. The very name of Ramakrishna awakes feelings and aspirations which the compulsory attendance at the Bible class in some of the Christian colleges fails to do. Works like the discourses of Ramakrishna Paramahamsa and his disciple Vivekananda, the devotional songs of Rabindranath and Rajanikanta, besides the *Gita* and the *Upanishads*, and some great books like Marcus Aurelius's *Meditations* or Epictetus's *Discourses* or Thomas á Kempis's *Imitation of Christ* in the case of

students with a taste for reading, are the favourite books on spiritual culture among the students. But they are repelled by dogmatism of any sort whether from the Hindu standpoint, or Christian or Moslem.

Slang—The ordinary student by the time he has got into his second-year class has become thoroughly 'Calcatianised', as it is said in student slang. He is still in some awe of his seniors, in spite of his sense of importance. His manners have got the city polish, and the air of unstudied elegance is sometimes overacted and exaggerated in a few. But this affected hauteur and indescribable something in the manner of an 'over-Calcatianised' student, in contrast to the frank and open manners of a **'griffin'** or **'honest fellow'**, and known as **RICE*** in the queer but most expressive slang of Bengali student, is no longer tolerated than noticed. A student cannot but choose to be well-behaved and frank towards his friends, unless he is fool enough to think himself the cleverest man ; and such people are more pitied than resented.

Sometimes the students are very free in their talk, and they like to annoy affectedly innocent people by being atrociously unconventional in their discourse. This, of course, is not a good thing ; but while the man of sterling worth is quickly found out and respected by all, the general opinion of the students inclines towards the brusque and unconventional student as the honester man, and is suspicious of the mincing manners and clergymanlike profession of morals of the parader of innocence, who, as the Bengali phrase puts it, 'drinks while under water'.

Professors—With regard to his Professors, the Hindu students know the principle of the Sanskrit adage that one

---

*Bengali *chāl*=style, affected manner ; also *chā'l* (=*chāul*)=rice. Student slang of Calcutta revels in ingeniously ludicrous mistranslations like this, often the work of real wits among the students ; the bilinguality of the Bengali student gives him extra facility for this.

১২

endowed with reverence attains knowledge (*śraddhāvān labhate jñānam*). He is always respectful towards his masters; but their whims and foibles do not escape him, and if they are extraordinarily prominent or if the professor becomes unpopular with his students, they are made the subject of many witticisms and railleries, and gain for him expressive and not very complimentary nicknames which none but one initiated into the student's *argot* can unravel and appreciate. Even a professor who is generally liked does not escape this. *In the matter of the relations between professors and students the English professor should know one thing. The language question has a great deal to do with the social relations between men. Howsoever well some students might know and use the English language, it is but an acquired language with them, and it is very difficult for the average Bengali student to express himself well in English.* The students' want of adequate command over every-day conversational English makes him appear queer or strange to the European professor who has had little opportunity to study the Indian character. The student often feels embarrassed when he is called upon to enter into familiar conversation with an Englishman; this embarrassment gives rise to awkwardness in manner or expression which the sympathetic Englishman can easily discern, and can assure the student. If the European professor shows that he has real interest in the student, he will assuredly be able to understand the warmth of love and admiration which an Indian student can feel for his teacher, and to know how deeply he cherishes any mark of spmpathy he sees.

Etiquette—An ordinary Indian student cannot be expected to be acquainted with the etiquette of English society. In fact, the usages and social etiquette of India and Europe are in somes cases so diametrically opposed that to an inexperienced European Indian students often appear to be ill-behaved and unmannerly. The student, however,

although he knows that customs vary with peoples, and does not entertain the notion that Indian social etiquette is inferior to the etiquette of any other society, is ever ready to learn and will try his best to follow as closely as he can the code of English etiquette when occasion demands it, if only he is taught it.

Tastes—But it is in the formation of literary or scientific tastes and likings that the teacher is more directly responsible. The Bengali students take more interest in English literature than the students of any other University in India, except, perhaps, Madras. With a great many the love of their mother-tongue and its literature is almost a passion. The student hostels and messes have a literary atmosphere which saturates the minds of even students of pure science. The professor can help to form a good taste in his students by recommending good books and insisting upon their being read if they can spare time. The supreme value of pure literature in contributing to mental culture cannot be over-estimated, and it is admitted by even the most erudite scientists ; and one of the inestimable benefits is conferred upon the student if he is possessed of the golden key of poetry or of the spirit of romance which opens vistas of beauty and truth to him.

Athletics—It is a happy sign that a love of athletics and manly sports is spreading among our students. The ideal of a 'good student' is not what it seems to have been a decade back. The man who ruins his health to top the list of successful students is now pitied of all, and the best boy of the year if he is at all to be looked at with esteem must not be broken down in health. A renowned foot-ball player now raises more attention than a first class man with no other qualification than his scholarship. Even the spectacled and pale-featured bookworm cannot escape the growing enthusiasm of the students for athletic sports. Passive indifference has now given place to active interest. Athletic

sports and gymnastics have become quite important factors in the social life of the students here, but the facilities, however, are far from satisfactory. Every college and hostel ought to have its well-equipped gymnasium, and physical exercise under efficient gymnastic masters should be made compulsory for all students.

Hostel Life—Life with most students is life in the hostel or mess, and the benefits of hostel life preponderate considerably over the unavoidable little defects or deficiencies. It is the hostel life that calls forth into full play all the generous impulses in the student's heart. An adequate idea of the value of hostel life can only be formed by one who has lived it or studied it from within, and all the various wakes of social activity which are synonymous with hostel life cannot be fully realised by an outsider.

The first thing noticeable in hostel life is the entire absence of formalities among the students. This want of any artificial barrier in the free communication between the students gives rise to a sort of socialism in which each man is as good as his neighbour and has a right to share his neighbours' goods, which is not the least delightful side of hostel life. An *esprit de corps* among students is found particularly in those messes or hostels where the currents of the life of the students have their full play and do not receive unnecessary interference from the superintending authorities who would like to preserve a strict puritanical decorum forgetting that youth is the time to be loud and full of bustle and roaring laughter and horseplay so long as it does not transgress rules of propriety. The Government Eden Hindu Hostel is, all things considered, the best example of what a students' hostel ought to be. It has got certain traditions, and the number of its inmates as well as the well-regulated yet none the less enjoyable life which they lead create in them a sense of love and pride for their hostel which we do not find among the inmates of many

other hostels. It is in the hostel that often lifelong friendships grow. It is in the hostel that the happiest hours of a student's life are spent when several friends gather together to chat upon or discuss things in general; and no topic under the sun is left alone when students meet together for familiar conversation.

Discussions—The Bengali student is in his elements when he is arguing it out with an equally doughty opponent; and they use the curious jargon of the Bengali student in which English nouns and verbs and adverbs and even whole sentences are freely introduced into the Bengali. The most animated discussions refer to literary and social topics, and the dinner hour is a very convenient time for it. A favourite literary subject everywhere is the respective merits and demerits of Rabindra Nath Tagore and the late Mr. D.L. Roy as poets, or the general tone and critical attitude of the various Bengali Journals; and those who have read least are always loudest and most opinionative and most persistent. In these informal conversational debates, as well as in the regular Hostel or Ward Debating Clubs, the students shine much more than in the College Seminar or Debate Meetings.

When social or religious topics are broached, an ardent reformer of the sixties or seventies of the last century, we fear, will not find much in our students to be satisfied with, be cause the outlook is generally cynical and unenthusiastic, and views askance at both the vehemence of the spirit of reform and the self-satisfaction of the spirit of conservatism.

Manuscript Magazines—The reading rooms and libraries in the hostel are a new blessing to the students. Debating Clubs are a matter of course with all hostels, and many have manuscript magazines to which the students contribute regularly. The Eden Hindu Hostel has five such magazines, one for each ward; and some of the numbers occasionally

are far above the ordinary outturn of students' magazines.

Cliques—Students with similar tastes sometimes form small circles of their own which strictly are clubs, without the sense of exclusiveness which the word club conveys. A few students may thus arrange among themselves to have regularly physical exercise every morning or evening, or to read together some English or Bengali author. Attendance at football or cricket or hockey matches is now the rule among the students. Visiting cinematograph exhibitions forms another popular recreation. The students also sometimes go to see Bengali plays, and muster in strong numbers to witness the presentation of Shakespeare dramas by English troupes touring through India during the winter season.

Sympathy—The feeling of brotherliness which is the outcome of hostel life is seen at its best when the students tend their friends during illness. It is touching indeed and cheering to see them eagerly contend for the privilege of attending to or watching beside the bed of a sick friend. Even if the disease be of a dreadfully contagious nature, as plague or small-pox, it does not in the least daunt them. What anxiety, what solicitude is felt by all the members of a students' mess if one of them is seriously ill ; and what a cheering effect that anxious care has on the patient. The love of his friends makes him forget that he is away from his home.

Poverty—Poverty is no crime among the students, and perhaps nowhere else the rich man with his grand air is so much disliked as among the students. Books are unhesitat-ingly lent to those who cannot afford to buy them. The tendency to share everything with others influences all the acts of the students. Standing one's friends in the matter of cold drinks or tramway fares or tickets at the football ground or theatre is a matter of common occurrence, and he who can pays unreservedly. Every man's wardrobe, from

the rich shawl, presented, it may be, by his father-in-law, to a pair of socks, is at the disposal of his friends.

Work—But the real aim of student life is not lost sight of. There is plenty of study and honest work too. Hostel life makes it easy for several students of the same class to study in consultation, which is very effective in impressing things in one's mind. The lazy man who always resolves to begin studying in right earnest from tomorrow morning is shamed into working when he sees the example of his more conscientious class friends. But hostel life may also make your brilliant student with an enviable university career deteriorate by developing the common tendency to waste too much time in careless talk, for in the hostel the temptations and opportunities for whiling away valuable hours are in the maximum. Here lies the duty of the superintending professor or class teacher in bringing those who are unduly negligent in their studies to their senses by gentle hints or rebukes.

Where the student has most liberty and is most trusted by the college authorities, we find that he always in his behaviour and manners and in the straightforwardness of his conduct is worthy of his position as a student. The students headed by the monitors ought to have some voice in the management of their mess and in the arrangements for their own comforts. For sometimes it happens that in some hostels or attached messes the high-handedness of an unsympathetic superintendent, not always a member of the college staff, leads to various unpleasantness ; and the man with a mean mind, ever present in all ranks of society, who would otherwise have his littleness of temper in check, finds it worth his while to curry favour with such a superintendent, and so to create distrust and bitterness where all was amity and goodwill.

In spite of everything, however, student life in Calcutta in a hostel like the Eden Hindu Hostel, with a few things

like wider recreation grounds, gymnasiums, boating arrangements, etc, added, is perhaps not inferior to the student life in any country.

Social Occasions—Almost all the Hindu hostels or messes, except those under Christian or Brahmo control, celebrate the annual worship of the Goddess Saraswati with as much *éclat* as possible. The preparations for the ceremony bring back to the students all the thousand memories of their homes where the various religious ceremonies like it take place all the year round gladdened by the presence of the loving mother, aunt or sister. The Saraswati Puja is often made the occasion of theatrical performances by students, which form one of the events in the comparatively uneventful social life of the Calcutta student.

Marriage—Marriage of his friends are other great events in the social life of the student. The third and fifth years in the college are dangerous for the bachelordom of the student, for it is in those two years that the 'marriage epidemic' is most virulent for him, and many are the triumphant 'passed intermediates' and graduates who succumb. Young men, especially 'College-educated' ones, are having more and more voice in the choice of their brides, but as social etiquette still looks askance at a prospective bridegroom's seeing his bride before the wedding, the young man where he is not hardy enough to cut a figure by insisting on seeing his future wife himself is at liberty to depute some of his most intimate friends to see his would-be bride ; and he unhesitatingly accepts their view and opinion of the charms and accomplishments of his future wife—for do they not feel as brothers, and are not their minutest tastes and likings, and even their innermost hearts known to each other ? When all is arranged, the college friends, who are sure to be invited to the wedding, muster together and follow the bridegroom to bride's place where they are treated with due deference and feel masters of the situation.

They present prothalamic poems and addresses, solemn or jocular, to the bridegroom, and partake of the wedding dinner. A few days after they have another feast at their friend's, where the timid and bashful bride is shewn to the guests who give her presents of books or fancy articles; and how fervent is their wish, how earnest their prayer, although unexpressed in words, for the happy and prosperous life of the newly married pair. These occasions of weddings of their friends are always kept fresh in the memories of the students; and if the marriage takes place in the village home of the bridegroom, far away from the metropolis, the reminiscences of it are made more pleasant by the change of scene which it affords.

Heterodox Luncheons—Occasional excursions to places like the Botanical Gardens at Sibpur or the temple and gardens at Dakshineswar are much liked by the students. Most students spend their afternoons or evenings in the public squares like the College Square or Cornwallis Square or in the Eden Gardens or in the Maidan, walking or talking in groups, sitting or lying on the grass. Tiffins or luncheons in the English style in one of the numerous restaurants for students is very popular among the heterodox section which is getting larger and larger in the student community. These restaurants are repugnant to the Orthodox Hindu with his strict notions of ceremonial cleanliness and his religious scruples; but the fact is that they are fast becoming a very important item in the social life of the Calcutta student, almost as much as cafés in many of the cities of the Continental Europe.

Clubs—In making the slightest reference to the student community in Calcutta, no one can forget to mention that great club for students—the Calcutta University Institute—unique of its kind in Bengal. It would take more space than we can command to give anything like an adequate account of it. Suffice it to say that with its central position, its

library and reading room, its athletic section and rowing club, its social gatherings and various other facilities it affords to students of all colleges to meet each other, it is getting more and more popular every year. Here we find represented all the best types of the student community. All the educationists—professors and others—of the city are in touch with it. Its reading room is a centre of culture among the students of Calcutta. Its annual recitation competitions are keenly contested by all the colleges in and about Calcutta. Here great leaders of the people and friends of the students like Sir Gooroodass Bannerjee meet with and give friendly advice to the students. Accomplishments and talent of any kind in the students are sure to meet with appreciation and encouragement here. Its Students' Fund maintained by the exertions of its members is one of the best organised charity funds for deserving students, and the annual theatrical performance held in its aid has reached a standard of excellence rarely surpassed anywhere in Bengal. All the best intellects in Calcutta read papers or deliver lectures on literary, historical or scientific topics for the student community in the hall of the Institute. The Calcutta University Institute is undoubtedly one of the best clubs in India aiming at the moral and intellectual improvement of students and the educated classes.

Defects—The social life of the students of Calcutta at present is as good as can be expected under the circumstances. But it is capable of great improvement in many ways.

(1) The crying need of the student community is greater facilities for sports and physical culture. There should be more play-grounds for students round about the central part of the city, for although almost all the colleges have their play-grounds, they are mostly in the Maidan, too far away from the residences of the students to enable them to take active interest in games and sports. Every hostel or mess ought to have a big ground attached to it, like the quadrangle

of the Eden Hindu Hostel. If possible, all hostels and messes should have gymnasiums attached to them. All students should be compelled to spend at least one hour daily in the play-ground. Indigenous games like *Kawadi* which are quite as strenuous as football and yet are inexpensive can be with advantage popularised among the students once more. A few more squares with big tanks in them like the College Square or Cornwallis Square would be a blessing to the students who crowd thither to enjoy the cool breeze every evening.

(2) In the present day social life of the students the part taken by the European professor is very little indeed compared with what used to be a decade back. This is not as it should be, and the reason of it should be inquired into. But we believe that a little more interest in the student, his language, literature and society, etc., manifested by the European professors than what we regret to notice many of them seem to possess or show, will go a great way in removing this great deficiency in the social life of the student at College.

Popularity—The love and esteem of one's friends and class-mates is perhaps the most covetable thing in a student's life. The man who is liked by all and who can easily make all feel at home with him, whose absence in a company is never unnoticed and whose presence is welcomed by all, is in a better way both as a student and as a member of society than the dyspeptic scholar taking the first place at every examination and repelling all by his scholarship. We can do without these scholars, but we cannot do without our popular men. To be popular is denied to all who have not any genius for it. The ambition of the student, unless he possesses some exceptionally brilliant accomplishments together with a nameless power to charm all who come into contact with him, ought to be to gain the love, respect and confidence of his friends rather than to be the cynosure

of all eyes. True moral worth, frank simplicity without any trace of affectation, and a real affection for one's friends are surest to win their heart. Graceful manners and accomplishments added to that wlll make one notonly loved but also looked upon with pride and joy by his friends. But perhaps there is no better guiding principle for the student in his social relations than that contained in that prayer of the students of ancient India ;

saha nāv avatu,
saha nāu bhunaktu ;
saha vīryaṁ karavāvahāi :
tējasvi nāv adhītam astu :
mā vidviṣāvahāi—

May we thrive together,
May we enjoy tog:ther ;
May we act with courage ;
May all our studies be with vigour ;
May we never feel jealous of each other.

HOSTEL LIFE IN CALCUTTA*

Hostel-life as led by the students in Calcutta is of a piece everywhere, only that members of some hostels enjoy some advantages and comforts which are denied to members of others. To an outsider, the sort of life which our students lead in the hostels, with three or four beds in a room or narrow cells with single beds, would seem tame and dull enough. For to him the bigger rooms with tables littered with books and papers and white walls either quite bare or adorned with hanging almanacs and very ordinary pictures or photographs of the students' friends or relations, with crumpled beds on which the students sit or lie to read or gossip or play cards or sleep at all hours of the day, perhaps appear to have nothing of cosiness about them ; and lines of cells with single doors and sometimes no windows seem far from cheery and inviting.

But all who have lived as students in hostels, and are living the same life now, will certainly agree that it is impossible to imagine a more lively and thoroughly enjoyable life that can fall to the lot of a Bengali young man.

Getting up—Let us try to give a picture of the daily life of the boarders in a hostel. The hostel is astir with reawakening life quite early in the morning, often earlier in summer, and a little later in winter and the rains. A few avowed sluggards, however, try to take a last nap before they finally get up, and linger in their beds as long as they can. Those who enjoy the luxury of a whole room to themselves may defer getting up as long as they like ; but for others less fortunately circumstanced, it is impossible to keep to bed for a long time, as the bustle and stir which

*The original title of this article was *Life in the Hostel*. The line drawings accompanying this article were published with it and were the work of Professor Chatterji himself.—*A. K. K.*

goes on in the room is peculiarly irritating to one who would like a little quiet for a morning doze. The student who evinces a predilection for rising late soon finds out what woeful devilries his chums are capable of in ruining one's sleep,—unless he receives their practical jokes in a surly or seriously uninviting spirit, or is fortunate enough to fall among ideally polite people or among room-mates who countenance each other in their habit of rising late.

Roll Call—By half past six roll-call by the monitors or the resident superintendent is finished, and the hostel porter opens the gates. The first thing which a student does after getting up is to wash his face and cleanse his teeth. After that many take their morning bath. The Hindu student is scrupulously clean in his person ; he bathes at least once every day, summer and winter, and some bathe twice or even thrice every day regularly.

The Water-duck and the Bullet eater—The gentleman who with his over-delicate health is ever in fear of a cold which he may catch in his bath is made the subject of many a joke : he is the veritable WATER DUCK, bathing as many as two or three times every year ; he was bathed once on the day he was born and will be bathed once more when he is lifted upon his pyre. He is an *opium-smoker* ('bullet-eater', as they say in Anglo-Bengali slang*) who is supposed to have horror of water. This story is told that the 'bullet-eater' cannot persuade himself to take a bath (except once in a few years), unless in a desperate attempt to rescue his towel from sinking which he throws into the water-tank just with that purpose. Further that once he went to bathe in this way, but ultimately came away leaving his towel in the water, for after much deliberation whether to take the plunge or not, he wisely decided that it was foolish to

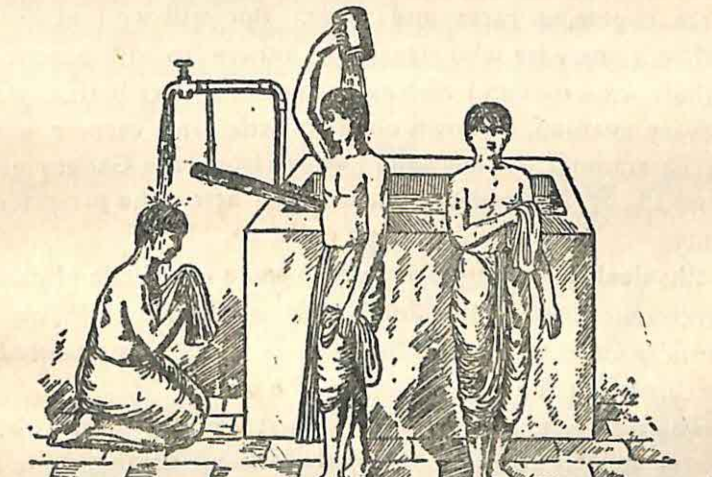
---

* Bengali *gooli-khor* = opium-smoker. But *gooli* means bullet as well as opium for smoking. Hence this conscious mistranslation in the students' argot.

destroy the effects of an opium smoke costing eight annas by going down into the water to save a towel, a paltry affair of four annas.

Oil and Soap—In bathing a student anoints himself with cocoanut or mustard oil, with perfumed oil for the head, and vigorous rubbing of the body with the towel. Sitting under the water tap or pouring bucketfuls of water on the head constitutes the general mode of the bath in Calcutta, but in the villages all enjoy a swim, there being plenty of lakes and tanks.

Excessive use of the soap is the sign of a fop, especially when the use of oils is treated with contempt. Where such a fop is not blessed with a particularly fair skin, he has to prepare himself for the witticisms of his friends : they recommend to him various complexion balms as well as beauty-



specialists in the town, and never fail to bring to his notice accounts of any new cosmetics which appear in the ladies' page in the papers.

Prayers—There are no formal prayers or modes of worship in Hindu Hostels. Hinduism allows its adherents

unlimited liberty in matters of faith, and Hindu students nowadays are thoroughgoing Hindus in this respect. They are, however, accustomed to look upon with reverence or at least with toleration the various rituals and ceremonies prescribed by the scriptures and customs of their religion and society, but they have no particular liking for worship and prayer after the manner of the Christian and Brahmo churches. Undoubtedly there are some who try to approach the Supreme Being after their own fashion, but they never let any others know that they ever are serious or are in the habit of praying, and outwardly they carry it off in a scoffing way. The orthodox Brahman student who will not let even a single drop of water pass down his throat before he has performed his morning and evening worship (*sandhyā*) by reciting the sacred Vedic hymns and offering oblations of water is getting rarer and rarer. But still we find many Brahman students who rigorously adhere to the practices of their ancestors and who every morning after bath, as well as every evening, sit down on their little grass carpets, with the ceremonial vessels and water from the Ganges, and spend 15 or 20 minutes in worship after the prescribed forms.

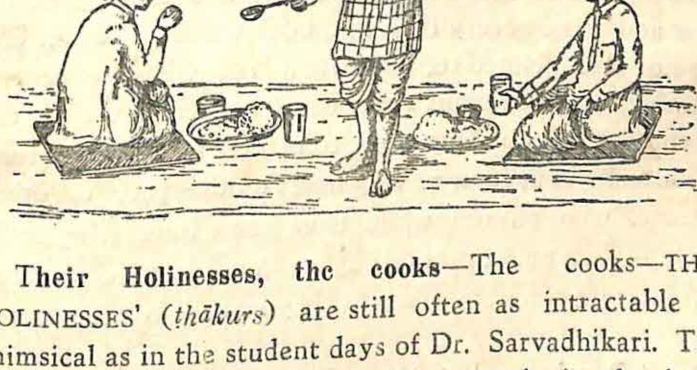
Physical Exercise—Before bath some take little physical exercise either with grip dumb-bells or Indian clubs, or in the indigenous way with some dozens of *dans* and *baiṭhaks*. But this is not the rule.

The majority of our students eat nothing before their midday meal at about 10.30, for there is no arrangement in any hostel or mess for an early breakfast. Some, however, make their own arrangements for a cup of tea with a few biscuits or a little Indian pudding (*halwa*), or for bread and butter and eggs.

Morning Work—Bath over, the student sits down at his desk with his books. But generally little serious study is done in the morning, unless it be a short time before an examina-

tion. He is ever ready to chat and gossip with his friends or read novels, or anything which may interest him outside of the narrow circle of his college text-books. Reading the various papers and commenting upon and discussing quite intelligently and often with unusual seriousness all the items of the day's news form an important item in the morning's work.

Meal time in the morning is fixed between about 9.30 to 12 or 1 o'clock. Those who have classes to attend in the early hours of midday take a hasty meal and start for college. The meal invariably consists of rice and lentils or pulses and different kinds of curries, and chutney. If there is no hurry, they take their food quite leisurely, talking and joking and discussing things in general. All students do not sit down to their dinner or breakfast together, but come to the dining hall in batches or singly, and are served by the cooks as they come. On Sundays and holidays when there is no college to attend, students almost invariably take their breakfast a little late.



Their Holinesses, the cooks—The cooks—THEIR 'HOLINESSES' (*ṭhākurs*) are still often as intractable and whimsical as in the student days of Dr. Sarvadhikari. They cannot inconvenience the students much in the bigger

hostels where half a dozen or more are employed. Where two or three are employed, they sometimes without rime or reason will not turn up in the afternoon and so leave the students to shift for themselves. Except that it is just before an examination, the students do not often mind it, and try their hand in the culinary art. On such occasions there are also the sweetmeat shops or restaurants to fall back upon. On feast days when students generally take their meal together and there is a fear of dishes being done away with by the cooks and servants, the Brahman students assist the cooks in serving the rest and in keeping general order.

At College—Back-Benchers—After breakfast the student goes to college or takes a short nap, the attentive servant or room-mate rousing him up in time to attend his class. Great enthusiasm and eagerness are shown by freshmen in attending the lectures. Some manage to retain their early enthusiasm all through, but with most the novelty of attending college classes gradually wears off, and they attend their lectures in a matter of course spirit and steadily become 'back-benchers', always ready to steal a little sleep during lectures if they can. The 'good boy', one who uniformly does well at examinations, often becomes a back-bencher, specially if he is an intellectual dandy, too lazy to do the rough work of taking down lecture-notes or minutely following the lectures of his professor, and nothing seems duller and more dreary than to take down notes when one does not feel inclined to, and when the vigilance of the professor insists upon his notes being written down by the students. This insistence leads to protest in some quarters and to make-believe in writing notes on the part of other students, who all the while have some interesting book, which, hidden under note-books or loose papers covered with hieroglyphics and scrawls, they manage to read on the sly.

Front-Benchers—But there is no lack of honest men

among the students, who jostle with each other for the privilege of occupying the front seats and are attentive and busy with book and pencil. These uniformly do well in the examinations, but do not always stand very high; whereas the back-bencher is either a genius or an intelligent man, who, to translate freely the rather irreverent phrase used by the students, '**kicks at things and passes his examinations'**; or a man of very ordinary parts who gets ploughed oftener than he passes. Students of the same class, however, whether attentive throughout or only occasionally so, soon form a unanimous (and never unjust) opinion on the respective merits of their professors; and it is among them that reputations are made which become as strong as pillars for the credit of the college.

Proxy Leagues—A certain section of the students have a predilection for getting their friends and themselves marked present by proxy. The air of light jocularity with which this practice is countenanced among members of 'Proxy Leagues' and 'Proxy Companies' does not however convince honester men, and nothing can exonerate this sort of thing from blame. But ampler inducements for being more honourable in this matter might be held out by lowering the compulsory high percenage of attendance at classes, which is so rigidly enforced, and by excusing inability to complete that percentage owing to unavoidable reasons of absence like serious illness.

The student among his class-mates, after some degree of intimacy has grown up, is the happiest of beings. The common reading rooms, a blessing unknown to former generations of students and as yet but imperfectly realised in many colleges of Calcutta, witness successive streams of 'jests, and youthful jollity, quips and cranks and wanton wills', and careless chat among the many batches of students who come to spend the intervals during lectures. Here we see more serious students comparing notes, in the literal

sense of the phrase, and correcting them by looking into each other's books. But indolent creatures do nothing but sleep under the fans, making a pillow of their books or *chādars*.

The Absence of Hobbies—His classes over, the student either stays in the college library to study, or returns to the hostel to read or sleep or gossip with his chums and friends, or play cards or chess, following individual taste as well as the mood of his friends. It is a thing to be lamented that very few of our students have any praiseworthy hobbies. Athletics and sports are the passion with some ; some few can go in for photography ; but we do not usually meet with students who have a real taste for pictures and curios or are interested in stamp or coin collecting. Although almost all can appreciate and do like to hear music (Indian music) and singing, which many practise well enough, it is rare to find a student who has a genuine taste for and appreciation of the arts, painting and sculpture. But it is a hopeful sign that there are a few, and their number is getting larger, in whom one can see a pronounced taste for some literary, historical or scientific pursuit which keeps them engrossed and occupies all the time and money they can spare.

The hostel very soon grows almost as dear as the very home of the student, and there he takes his fullest ease. In the afternoon a game of cards is very much appreciated, and he plays English games like bridge, and various Indian card games.

Tiffin—At about half past three or four in the afternoon, the students have a light tiffin—a few thin cakes fried in butter, a little curry and a sweetmeat or two, with a meat or egg dish added occasionally. It is in the afternoon that friends either from college or from their native place come to visit them, and if they happen to be present at luncheon-time, the students hear no denial in treating them to tiffin. Bengali students are all hospitable in this respect.

Afternoon Exercise—After this tiffin which corresponds somewhat to the English afternoon tea, they stir out for a little walk or physical exercise. The Eden Hindu Hostel which can boast of a tolerably-fine grass quadrangle, or the Sibpur Engineeing College Hostel which has wide fields attached to it, can afford its members plenty of room to stretch their limbs, as it were, and this serves to make life there freer and more wholesome than in many hostels which have no open space except a few square yards, in a dim and ever-wet courtyard, and on the terrace. No student, even the most bookish one, remains shut up in his room in the afternoon or evening, except when too interesting a topic is being discussed to break up the party engaged in it. Most students from all hostels go out to take a walk either in College Square or Cornwallis Square. Some make a long tramp to the Maidan or the Eden Gardens. Those who are determined sportsmen go to the College grounds far away in the Maidan, and practise vigorously for the coming matches.

The Serious Lok—There are a few unfortunates, however, who too early try to take a serious view of life, and avoid 'frivolities' and think that a few minutes' walk in the corridor or on the terrace, and occasional leaning against the balustrade to look on with benign scorn at the childishness of several young men running after a ball or tossing a shuttlecock as if their lives depended on it, are physical exercise enough to prevent that dread malady—dyspepsia. These grave and sober gentlemen feel that nowadays times are too degenerate to appreciate the value of their 'serious view on life', and that even they themselves cannot get rid of that undesirable display of enthusiasm which attracts all students during the football season.

Football—Fat *v.* Lean—In the Eden Hindu Hostel they play football in the afternoon in a semi-serious way or in a desultory and random fashion, every one joining a side if he

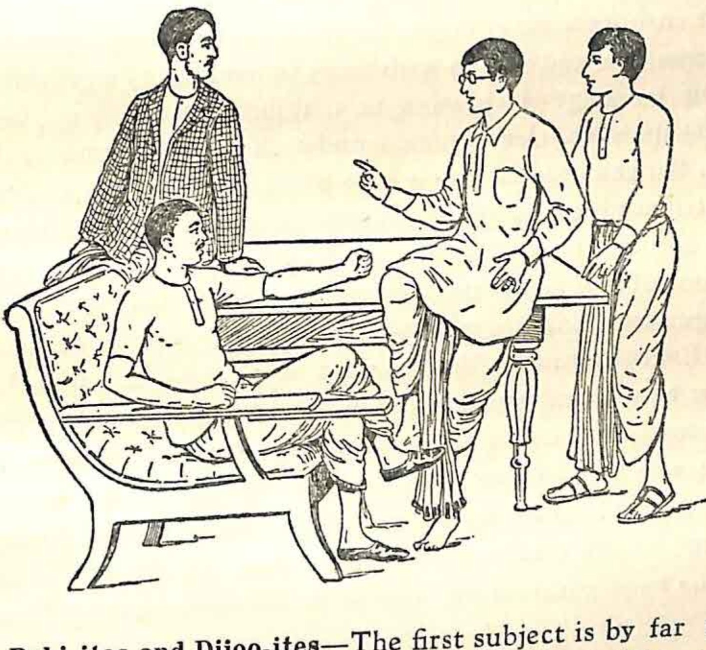
likes to have a little exercise. But lively interest is never absent when inter-ward matches take place, or odd matches, as between fat men and lean men, tall men and short men, married ones and bachelors, spectacled gentlemen and not-spectacled ones. The Eden Hindu Hostel boarder has too much of social life and facilities of recreation within the hostel itself to seek it elsewhere; hence we find that he cannot identify himself with clubs like the Calcutta University Institute or the Young Men's Christian Association, as many of the members of other hostels do.

Most hostels have their badminton clubs when they can spare a little open space; and regular physical exercise on parallel bars or with dumb-bells and Indian clubs is taken by many every evening.

Visits and Meetings—In the evening the student sometimes makes calls on his friends and relations. It is then that he indulges in the luxury of a little tiffin with a few friends in a restaurant, or of glass of iced *sherbet*. Perhaps he attends a meeting of students and residents from his own district. On Sundays he might occasionally drop in at the Brahmo Samaj Church to witness the evening service, but that is, it must be confessed, more out of curiosity and a desire to hear the music and singing than out of reverence and wish to profit by the prayers and sermons. He never fails to attend any important literary gathering which might be held in the evening. But generally after a short evening walk he prefers to come back to his friends, to chat and have a cup of tea with them.

Evening Discussions—The evening is one of the liveliest hours of the day in the hostel. Students are gathered in the corridors or meet in the apartments. There is no end of talk and discussion on all manners of topics, and joking and singing, in short, all the ways in which a party of young men left to themselves would spend an hour. The discussions are on such topics as the value of western and eastern ideas, on

various social questions, on music, on pictures and the Indian and Western styles of painting, on poets and writers in Bengali and English. Some of the favourite literary topics are Mr. Rabindra Nath Tagore and the late Mr. D. L. Roy as poets, the places of Hem Chandra Banerji and Michael Madhusudan Datta in Bengali poetry, the dramatic genius of the late Girish Chandra Ghosh, the humour of Mr. Amrita Lal Basu, and the late Navin Chandra Sen, the man and the poet, in his posthumous autobiography and in his poetical works.



Rabi-ites and Dijoo-ites—The first subject is by far the most popular one ; and there are '*Rabi-ites*' and '*Dijoo-ites*' in every hostel, as hostile to each other's opinions as were the Whigs and Tories of the past. There are neutral men who love to begin a quite innocent discussion in order to set the Rabi-ite and the Dijoo-ite against each other, and then enjoy the fun. In these corridor or common-room or chamber discussions round a cup of tea there is no strict

order or procedure, and no attention to the language used, Bengali and English and fragments of Sanskrit where suitable being mixed into a strange jargon interspersed with slang and conscious mistranslations of English and atrocious colloqualisms. But when the very subjects are treated by the same parties in the Hostel Debating Clubs, they strictly adhere to the sobriety of an academical discussion, to the unavoidable detriment of the liveliness which characterises the talk of the student in the language in which he thinks.

Argot—Most sections of people have their argot, and the students have theirs. The expressiveness of the slang terms must ensure the acceptance of a great many into the language of literature, and it is so with many Bengali slang words also. Slang language is always in a fluid state, being the very living speech of classes of men under changing circumstances. The Bengali student freely lays the English language under contribution for some of his most expressive slang terms, and indulges in most ludicrous malapropisms and mistranslations of words and phrases and proverbs from his mother-tongue into English, which are the delight of studentdom. An Englishman may easily understand *arguefy*, *gatheration* (for a compact crowd), *fatiguated*, and such like. But what can he make out for an English expression like *dove will graze** or *body's cloth*† or *finish your meal morning morning this night*‡ ? The student has a large stock of hybrid words, which he can invent whenever he likes. *Addify* and *addification* have got nothing to do with mathematical addition ;

* Literal translation of the Bengali proverb (*bhiṭāy*) *ghughu chorbe*—'the solitary dove will haunt his deserted homestead' ; it is used to imply that one will be in an inextricable quandary.

† *Body's cloth* is word-for-word translation of *gāyer kāpaṛ*—the *scarf* which is worn round the neck or is wrapped round the body as a cloak, after the Greek fashion, and forms part of the full dress of a Hindu.

‡ *Morning morning* is English for the words *sakāl sakāl*, which mean 'a little earlier than usual'. *Sakāl* means *early* as well as *morning*.

they simply mean *to enjoy a chat, to be engaged in careless talk with boon companions*, and come from the Bengali word *āḍḍā*, which means *a place where such a chat takes place*, or *the chats of intimate friends*—a word of evil sound to guardians and parents—and to which the English suffixes are added. The English verbs *to pass* and *to fail* are, when used in the past tense, treated just like Sanskrit verb-roots which are reduplicated in one of the past tenses : thus, *pa-pāss-a* (he passed), *pa-pess-atuḥ* (they two passed), *pa-pess-uḥ* (they passed) ; so *pa-fail-a, pa-fail-atuḥ, pa-fail-uḥ*. Even a very vernacular Bengali word *chhāṛā* (to give up, = Hindi *chhoṛnā*) is in the same way invested with the elaborate garments of Sanskrit inflections. Thus a student who gave up attending law-classes, said in good imitation Sanskrit—*law-class-aṁ chachhāṛa* (I have given up law-classes). To stand a treat to others is to be a *captain* to them (*kāpteni karā*) ; to get hold of a *captain* (*kāpten bāgāno* or *pākṛāno*) is to *patronise* * him, and some always try to be 'patrons' rather than 'captains'.

This digression on student slang is just by the way. The students talk and argue and discuss, but as usual no one is convinced, and all this leads to nothing. Those who imbibe new ideas do it quite unconsciously or after some mental shock when long formed or acquired opinions prove untenable. Some arrive at independent conclusions, many by association with friends. The student argues out a case in right earnest and establishes his proposition, but does not display any burning zeal for its promulgation. One who is absurdly enthusiastic is looked on with pity ; a crotchety zealot is an object of impatience, almost as much as a vulgar fanatic, who, however, cannot be met with in a Bengali student community. An idea is but an idea, and cannot but

* *Patron* and *patronise* in this sense are now slang words, perhaps as yet not well-known everywhere. The honour of inventing them belongs to the members of the Eden Hindu Hostel.

be modified by circumstances; the 'idea-monger' who ignores the limits of worldly circumstances is looked upon as an eccentric man and is called a '*cracked*' (meaning crack-brained one), a '**forty-nine**'*. The spirit of reform is not absent but it is never absurdly 'heroic', iconoclastic or 'Brahmoistic'. Quiet work, and the force of conveniency in the case of minute and inessential things, but no ardency and vehemence, which are taken to be sure signs of derangement of mental balance. The outward view-point is cynical and careless. As every human being has a natural tendency for the good, so the student tries to do good, and does it quite instinctively; but if you recommmend it to him with commonplace platitudes super-added, he will feel bored; if you persist in it, he will get disgusted with your preaching.

These chats and friendly conversations which form the universal attraction of hostel life usually extend from half past six or seven to eight or half past eight o'clock in the evening, but there is nothing to prevent any interesting talk springing up at any hour. After that, students drop off to study one by one. Some circles feeling little pressure of work, or in a particularly lazy mood, keep up their *conversazione* to a late hour in the night. If the College team wins a match, and the Superintendent is not a glum sort of man, they hold noisy demonstrations and bonfires.

The Evening Meal—The evening meal comes off at 9 or 9.30 p.m. after the evening roll-call. In all Hindu hostels there are separate dining halls for different castes, but strict adherence to this arrangement is not usual in many. The student finds ample time to take the evening meal in a deliberate fashion, and supper time is particularly favourable for animated discussions of all sorts. Indeed, nothing seems to give more animation than some solid or liquid food to

* An insane person is said in Hindu parlance to be affected by the *humour ventosus* (*bāyu, bā'i*), and there are 49 winds (*unapanchas bāyu*). A madcap is called a '*forty-nine*' by the students.

whet the energies and compensate the loss of them in the course of the talk. Thus, what are known as **'rainy season yarns'** (*āṣāṛhè galpa*) in Bengali are appreciated more when during a steady downpour on a gusty evening those who spin out these yarns have liberal supply of that Bengali delicacy—crisp parched rice and peas of various sorts, sprinkled with curry-powder and strong mustard oil and hot unripe chilipeppers, in a basket in their midst.

After the evening meal, serious study for an hour or two, and then to bed. There are few who do not burn the midnight oil before examinations. Some spend almost the whole night in study when the examination is near, and the chambers of such students are known as **'light-houses'**. But ordinarily every body is sleeping by eleven or twelve o'clock, except in the hot season, when sleep is often impossible. In the Eden Hindu Hostel when the weather is too stuffy many students sleep in the open corridors or in the quadrangle. On a full-moon night many might be awake enjoying its beauty.

The Cinema—Some evenings are spent (at least once a week) by almost all students in the cinematograph theatres. The cinema exhibitions have become quite an important element in the students' intellectual culture, and full use is made of the opportunities of amusement and instruction offered by them. Thanks to them, many students have been enabled to form acquaintance with some world books, and with works like *Les Misérables* and *Quo Vadis* ; and witnessing *Les Misérables* or Dante's *Inferno* represented by the cinematograph has given an impulse to the study of them by many students who could not otherwise be easily persuaded to read them.

The Bengali Theatre—The Bengali stage and (when English troupes acting Shakespeare dramas visit Calcutta) the local English stage are occasionally patronised by the students. A few students, however, affecting a puritanical

temper forego the pleasure of seeing a good play, but they have the decency at least as the theatre-goer will tell you in not becoming obnoxious by posing as an 'apostle of purity'. The Bengali public stage no doubt has many disagreeable features. But in one respect it can be compared with the Elizabethan theatre, in that it has during the half century of its life given rise to a number of actor-dramatists of high repute, two of them, the late Girish Chandra Ghosh, the master dramatist of Bengal, Mr. Amrita Lal Basu, Bengal's Molière, being unquestionably recognised to have obtained places in the front rank of Bengali poets and authors. Plays by these dramatists as well as by such eminent Bengali poets as the late Mr. D. L. Roy, Mr. Rabindra Nath Tagore, Pandit Khirod Prasad Vidyavinod, etc. and by other less eminent play-wrights are being constantly put on the Bengali stage. The student sees a play occasionally only, and he is not an inveterate play-goer. Bengali actors are inimitable in social dramas, comedies, farcical satires, etc., but in the heroic and tragic scenes in historical or classical plays, ranting and various flourishes take the place of good acting to the underlying absurdity of which the student is keenly alive. The 'heroic speeches of famous actors' form a stock subject for humorous caricature among the students. A new play, especially by a great writer, furnishes subject for discouse for some days, and those who have not seen it hasten to its performance if it is unanimously declared good, or at least manage to read it.

"Is-the's"—If the play becomes popular, some phrases or words which catch ear are in every mouth, and give an additional point to every day talk. Thus, for instance, some time ago when Mr. Amrita Lal Basu's brilliant little farcical comedy, *Khās Dakhal*, had been played, the two English words '*is-the*' with which a character in it, after the manner of many 'English educated' Indians, used to interlard his Bengali speeches as an unconscious flourish, took

the fancy of the audience so much that for weeks after students would never speak a sentence but put in a few '*is the*'s' in it after the manner of that character which was acted by the author himself.

It has become customary with most colleges to stage some drama every year. There are strictly hostel theatricals also ; but as few hostels can boast of open space for the stage and the auditorium, they can be said to take place only in the Eden Hindu Hostel and the Civil Engineering College Hostel at Sibpur. Hostel theatricals are, as a rule, in Bengali, whereas college theatricals may be either in Bengali or in English. Some popular play, preferably one by D. L. Roy or Girish Chandra Ghosh, is selected, and parts are distributed to all members of the hostel who have the slightest reputation for histrionic abilities. Preparation goes on with great gusto, and affords a welcome variety in the ordinary life of the hostel. Some are pressed in by their friends in spite of their own disinclination, while others are on the look-out for any small or unimportant parts which might be given to them so that they can show it off on the stage, and there are some thick-headed gentlemen who would subscribe handsomely if they were given the privilege of appearing on the stage as messengers or men of the mob with monosyllabic speeches.

Nick-Names—What is particularly remarkable among the members of a hostel is the feeling of comradeship and social equality. Popular men receive familiar nick-names by which they are universally known, and they are no longer '*So-and-so-Babu*', but *dādā* (elder brother), *māmā* (maternal uncle), *mez-dādā* or *sez-dādā* (second or third elder brother), *khokā* (baby !), *Pandit*, *Mollah*, *Doctor*, or even, in some circles, *śvaśur* (father-in-law !). After some intimacy, they call each other by familiar abbreviations of their names, like the English *Bob* for *Robert* or *Tom* for *Thomas*.

Sharing and Borrowing—If any one receives some good

thing from home, his 'seat' is besieged by his friends, and everyone has his share. They do not have the least bar of ceremony between themselves, and are frank and free with each other. When some one has got to go to some feast or to visit somebody or attend some function, and the ever-delaying *dhobi* has with him his best things, and his existing wardrobe is perhaps plain rather than rich or stylish,—and he has got to be dressed better than usual, he does not despair ; he goes out, as they say in the Eden Hindu Hostel, 'big game hunting' (*mṛgayā*), and is at liberty to beat out the contents of the clothes-chests of his friends and take what suits him best. Everyone is a 'captain' to his friends when he can. In everything this good fellowship is manifest, and they manage it in such a considerate way that the poor student whose means are slender and precarious, and who perhaps has to depend solely on a paltry sum which he earns by private tuition, can always feel at home among his fellows and join them with a clear conscience, if only he is blessed with the spirit of comradeship.

Frequently intimate friendships grow up in the hostel, and two students form a deep attachment to each other and never withhold their innermost secrets from each other. This sort of pure friendship glorifies their lives and binds them together in golden chains of love which nothing can break asunder.

After constant touch with various types of fellow-beings and with a spirit of conscious or unconscious accommodation to many of the foibles and humours of totally different characters, many of the angularities are worn off in the hostel into a uniformly sociable and reasonable student type. But a great deal, often a surprisingly great deal of the individuality of character and habits of thinking which have been formed for good in the student remains, and the student community presents various types strongly marked off from each other.

Types—Even the most erudite professor preceives the various types among his audience of students. There are thin pale students who are always attentive ; there are others who are always listless, and others again who will be rarely isolated from their respective circles, and are ever in a mirthful mood ; then there are the meek creatures, never answering a question, never lively if they can help it. The ideal type representing the best fruit of physical, intellectual and moral culture is very rare indeed, but there is plenty of what may be termed the *kalos kagathos* type, representing the old Athenian ideal of health and therefore comeliness in mind and body, as far as it is possible to find an ideal translated into life under various adverse circumstances.

The 'Sushil Subodh Bālak'—Of the many ordinary types of students, let us dispose of the 'good boy' first. The ideal school boy of the past, of whom every Bengali boy reads (and whom he is expected to admire and follow) in Madan Mohan Tarkalankar and Ishwar Chandra Vidyasagar's spelling books and primers, is but a *goody-goody*, as they say in English, who 'plies hard at his book', plays only for an hour in the afternoon, is ever bent on acquiring knowledge, and, although it is not written in the primers, on passing his examinations creditably.

Modern 'Good Boys'—But the modern 'good boy' who has any self-respect would now resent to be taken to be a *sushil subodh bālak* ('a good and clever boy') of that type. We have changed a great deal with the times, and with us our ideal, but still we find students whose life forms an exhibition of that ideal put into practice, although it is denied or not felt to be so. These dyspeptic book-worms have a horror of active sports. Instinct of self-preservation sometimes drives them to take exercise, but they cannot keep it up long. They can never be gifted with any intellectual catholicity, though a few of them might cling to some particular subject, Physics or Chemistry or History or some

language, and achieve academical distincion in that, and in that alone, and develop a contempt for all things which do not come under the scope of their studies. No one can be benefited by an hour's talk with such 'good boys'. Where their only concern is to obtain high honours at examinations, they are certainly in a worse way both as students and as men than those light-hearted 'fools' whom they despise. For your 'good boy' of this type who stands high in the pass-list and knows nothing beyond his text-books, not even how to enjoy a joke, often entertains a sense of lofty superiority over those who do not rise so high in the list and yet can be merry. When this is manifest, it is met with good-humoured scorn on the part of the others, who spare no available opportunity of poking fun at the expense of these 'good boys' with their monstrous oddities; and the two words *bhālo chhele* (*'good boy'*) when applied to a student are now looked on as conveying a doubtful compliment.

The Wit and the Prude—All hostels can boast of one or more wits, whose even very trifling sallies of humour convulse the other members of the hostel. The wit's way of putting things in a few pithy words is always final and conclusive. His friends shine elsewhere by letting off some of his brilliant expressions and repartees, and only with half as much grace, humour and spontaneity. The hostel prude who does not like what he calls 'obscene talk' dreads the wit most of all, as much as the opium-smoker who only wants a little quiet to obtain the full benefit of his intoxication is said to fear the wine-bibber who cannot enjoy himself unless he is boisterous. The wit ultimately succeeeds in converting the moralistic prude, whose very extravagance in condemning things like the stage and marriage at one breath and in trying to look glum and make futile attempts not to join others almost splitting their sides with laughter at some particularly good story or joke, has too much of the studied and insincere in it.

The 'Cad'—The wit is sometimes unconventional and broad in his talk, but his profanity is tolerated as it is flavoured by his humour. But when a brainless fool tries to outshine the wit by vulgarity he is called a *cad*. This eloquent English monosyllable has been naturalised into the Bengali student's vocabulary, and is used by him freely to qualify anything which is disgusting to him. A liar is a cad, and so is a snob, and a sneak. Anyone who tries to show himself off among his friends, and poses as a 'great-oneyer' in a company to attract attention is a cad. One slouching or slovenly in manners also gets this distinction, but not when he has a reputation for frankness.

The Poet—The wit as well as the poet are objects of pride and admiration in the hostel. For in addition to the wit we find often the poet also. Ten to one he is a man of some genius, and his compositions are perhaps welcomed in the leading Bengali journals. He is the hostel laureate, its official poet, whose services are ever ready to celebrate any special event, in satirising some *Chāliyāt* or snob who goes dangerously near making himself obnoxious, or in composing a prothalamic ode at the wedding of a friend, to be printed by subscription with all the elegance, the taste and resources the Calcutta Art Printers can command, and distributed among the marriage guests.

Married v. Single—Married students show a decent number in all hostels. There is perpetual feud of opinion between married students and bachelors. The former take a tone of condescension, and jestingly offer their heartfelt sympathy for those unfortunate minors (*nābālak*) who have no idea of 'the blessings of matrimony and love'. The latter either profess to bemoan their bad luck or characterise their friends as the tailless fox in the fable, and always try to waylay the eagerly-expected letters from their friends' wives, letting them have them after some tantalising. But although marriage during student life is getting more and

more into disfavour, more as a result of present economic conditions than of anything else, no one believes him who announces that he is going to live the life of single blessedness, for all turn very dutiful sons when their parents press them for marriage.

The Intellectual—The true poet mixes with his friends quite freely, and makes them feel that he is one of them. He teaches them to respect and appreciate poetry. But the gushing gentleman who feels quite sure that he has got the soul of poetry, and writes wretched rhymes and plagiarises from Rabindra Nath, jabbers of Shelley and Browning and Chandidas and Burns *ad nauseam*, talks in exalted tones about the ideal and genius and imagination and what not, and affects an artistic *négligé* about his dress and deportment, succeeds only in repelling honest people from the gay science of which he professes himself to be a votary. He is treated with delicate snubbing everywhere, but he is too much of a vain creature to detect it.

The Jolly Good Fellow—There are those students who from their frank and easy manners and cheerful *bonhomie* may be called "Jolly Good Fellows", *par excellence*. They are all healthy and never dyspeptic, ever ready to join in any rollicking fun or to play practical jokes, equally ready both to 'patronise' or stand 'captains', and not overfond of their books. They pass their examinations quite respectably, observe things with their own eyes, and can talk intelligently and intelligibly on all topics they can have any chance of being acquainted with. They form the very soul of hostel life. All that makes life in the hostel worth living is possible only on account of them. Their unfailing energies and resourcefulnesss make hostel functions successful. It is these students that spend nights by sick-beds, and volunteer at the first call whenever their help is required, as they are doing in relieving the distress caused by the recent floods in West Bengal. They all have a taste for active life, and

sportsmen invariably belong to this class. They may not be scrupulously nice and decorous in their manner ; they have no cowardly fear for their health, yet they always keep better than those who 'conserve their energies'. They have a great hatred for the sham, and are cynical rather than ardent.

The 'boisterous' or 'blataut' class may be said to form a section of this type, although there is no lack of blatant creatures among the snobs.

The Meek—The meek type is represented by a few. They are all in immense awe of the 'good boys' of the year and of past years, and whisper to each other when they see one of them. They enjoy a joke when they can understand it, and fear the snobs whose tinsel brilliance has power to awe these only and whom they take at their own valuation. But they uniformly follow the footsteps of the 'honest' or 'good fellow' class. They may be said to typify passive goodness among the student community, and they never belong to the city of Calcutta itself. Fortunately their number is small.

The Veteran—The 'Veteran' or 'hardend sinner' who quietly appears at the examinations every year and gets plucked with a cheerful mind and prepares without any fuss once more for the next year, and thus goes on untiringly for some years before he is finally successful, represents another variety of the 'good fellow' class. It is only his bad luck in not preparing well enough that gets him ploughed ; but it is impossible for a 'veteran' to be a 'good boy', for he is too generous-hearted for that.

The 'Chāliyāt'—Other types are too numerous to speak of. We can only mention the '*theatrical*', the '*heroic*' ever in an irate mood, the '*over-polite*', etc.. etc But we cannot forget to mention two other types—the *chāliyāt* and the fop. The *chāliyāt* or *chāloosh* is a decent man who unnecessarily gives himself the airs of a snob and tries to carry things off in a more dignified and rather patronising way ; he is so called because of his *chāl* or over-acted stylishness. The words echo *jāliyāt* or forger, and *jāloosh* or sparkle of a precious stone or a gaud. The *chāliyāt* is not an evil-tempered man, he is rather weak-minded, in as much as he craves a little attention to himself from those whom he comes into contact with. The *chāliyāt* and the fop types are often difficult to distinguish. The fop or dandy, also known as 'full-babu' and *jāmāi-bābu* or the new son-in-law, who as a rule goes dressed in his best when he pays his

first visits of ceremony to his new relations and *lakkā-pāyrā* or fan-tailed pigeon, when he is lean and thin and tall—having only 'length without breadth' and he is so careful about his person, his dress, his shoes, and is so deeply absorbed in them that one cannot mistake him. He is said to be always blowing off the dust from his dress. The student fop has a great deal of difference from others of the dandy class which consists mainly of petty clerks, more respectable shop-assistants and mechanics and the like, for his culture gives him some elegance which is not found in the others. His hair is cut in a peculiar way—which is known as a 'Nightingale's crest' (*bulbuler jhoonṭi*)—and he clips, almost shaves, the back part of his head and allows the locks to fall thick and long on his brow. They are often parted in various fashions, a common one being popularly known as a "bufflo's horns". But there is no need of going into the details of a dandy's style of adorning his person in Bengal ; the fop is after all but a good man with an extra amount of personal vanity.



BUFFALOES' HORNS

PROFESSOR MANMOHAN GHOSE*

(1869-1924)

When I think of my teachers, both at school and at college, I realise now, when it is more than half a century since I ceased formally to be a student, what great reasons I have to feel grateful to them. It was they who put us in the way of loving learning and scholarship and of trying to follow great ideals, to appreciate beautiful and noble things in life, and above all to try to live the good life. Now when I am fairly advanced in years, approaching my 77th birthday, the memory of my old teachers and professors fills me with a sense of sincere reverence and gratitude. I feel a great yearning to show them once again my fervent homage in our old Indian way, by bowing down to them and touching their feet. Reverence and salutation to all my teachers, and, among them, to Prof. Manmohan Ghose, of hallowed memory, go out with all the respect and affection of my heart in a profound obeisance.

Life is a texture of good and evil, of joys and sorrows, of blessings and misfortunes. Among the blessings that have been granted to me by Providence, I place at the forefront the opportunities I have had of coming in close touch with some of the greatest personalities as well as greatest teachers of our days. Prominent among them have been

---

* This is the second part of Professor Suniti Kumar Chatterji's article which appeared under the caption 'My Teachers—homage to their memory' in *The Education Quarterly*, Ministry of Education, Government of India, September 1966, New Delhi. In the first part of the article Prof Chatterji paid his homage to his teachers at the school (1899-1907), singling out among them, for special citation as an extraordinarily good and noble soul, "our *Head Pundit Mahashay*—our senior Sanskrit Teacher", to whom he had earlier paid his tribute in Bengali (see *ante*, হেড-পণ্ডিত মশায়, পৃঃ ১৫১-৫০). —*A. K. K.*

Rabindranath Tagore, Nandalal Bose, George Abraham Grierson, and teachers like Professors H. M. Percival and M. Ghose as well as Benoyendra Nath Sen and P. C. Ghosh at the Presidency College in Calcutta and Professors F. W. Thomas, Daniel Jones, E. A. Denison Ross, L. D. Barnett, Jules Bloch, Antoine Meillet, Paul Pelliot, and Jean Przylski in England and France. I was privileged to come in more or less intimate relationship with most of these great men, and from each of them I have received inspiration in different departments of life, which has remained a potent influence in the formation of my personality and character ever since. But when I think of my teachers, naturally I could try to recall what I received from them. Among my teachers at the college when I was in the formative period of my life during my teens, I think I might mention specially Prof. H. M. Percival, Prof. M. Ghose and Prof. Benoyendra Nath Sen. It is not that I did not receive any thing of great value from the others. But when I think of what has helped to make me that I am, in moulding the bent and proclivities of my mind, temperament and aspiration, I think I should mention first of all these three great teachers of mine. What I feel I received from them, as vivifying rays of light, to exalt my life and endow it with purpose, were the following :

> A spirit of dedication to serious and arduous work, as well as an endeavour to go deep down below the surface of things to find out the hidden sources not only of beauty and goodness but also of both understanding and aspiration.

Touch of the great masters

When I think of it all at the fag end of my life, I am filled with a great reconnaissance and reverence for these masters of mine, and also for all other great souls whose touch, direct and indirect, has enabled me to lift my mind and my heart up towards great things.

In my study of literatue and the experience of man's life, both inner and outer, apart from Rabindranath Tagore, the two great teachers of mine were Professor M. Ghose and Professor H. M. Percival. I was privileged to receive from both of them during my contact with them as a student, and also after I had ceased to study under them. But it was long after my student days in Calcutta, when I was in London as a Government of India scholar, I could contact once again Professor Percival, who had gone to take residence permanently in England after his retirement from service in India. Professor Percival was a Eurasian, or an Anglo-Indian, as our mixed population of European and Indian origin were politely described, but as I could find after close contact with him in London, he was in his culture and mental make-up hundred per cent Indian. He was a tall man, rather dark in colour, but he always stood and walked straight, he never stooped and we never saw him even when he sat in his chair to bend his back. He was, in fact, like a ship's mast or a straight tall pine tree, and with his bushy moustache below a straight nose and his piercing eyes he looked every inch of him a veteran military commander, who seemed to compel by his very presence the obedience and respect of all and sundry. He was a man of very few words, and in the class-room he very rarely smiled and when he did smile, for example, when reading with us a Shakespere play, it was said that the more careful and ardent students, who used to take down meticulously whatever would fall from his lips, would write down by the margin of the passage or line which provoked his smile "here Mr. Percival smiles". Professor Percival had several generations of students who sat at his feet, and so also had Professor Manmohan Ghose. The late Professor P. C. Ghosh was a great admirer of Mr. Percival, and in his affection for our great master he was more than a devoted pupil—he was almost an affectionate son. Professor P. C. Ghosh tried to

perpetuate Professor Percival's memory in various ways, particularly in trying to bring out from Calcutta editions of some of Shakespere's plays with Mr. Percival's notes and comments. It would be worth while to write in detail our reminiscences of Professor Percival, but that could be only in another context.

A rare poetic sensibility

As most of Professor M. Ghose's pupils will remember, he was rather a quiet and retired sort of man, and although he was easily approachable, both in the class-room and out of it, there was something unique in his personality and presence which did not encourage familiarity. From his abstract and detached air and a frequent distant look in his eyes, he compelled from us a certain reverent awe. In the class-rooms when we looked at him, we could not help having a feeling that with his pensive and sometimes wistful look, and his occasional detachment from the topic he was lecturing upon, he must have been under the burden of a great sorrow, some great suffering or frustration in life. Yet we could see that he was the gentlest of men, who allowed nothing to ruffle his temper. Endowed as he was with a rare poetic sensibility and imagination and gift of expression, our reading of English literature with him always used to be an uncommon treat, which we all would look forward to. His method of approach to poetry and other literature used to be somewhat different from that of the other great professor in the Presidency College, Mr. Percival. We had a feeling that Mr. Ghose, the poet, was more synthetic in his attitude, and Mr. Percival, the scholar, was more analytical. Each was in a way complementary to the other and we may well congratulate ourselves for having had the great good fortune of studying under these two men, who can be described as two of the greatest teachers in the annals of modern education in our country.

We read Shakespere's *King Lear* under both—with Professor M. Ghose for the B. A. Examination and with Professor Percival for the M. A. Examination. We had also read with Professor M. Ghose Emerson's *Representative Men*, but we got the exhaustive critical notes on the same book by Professor Percival, and it was unique how Professor Ghose succeeded in imparting to us a broad ensemble view of Emerson's philosophical ideas and concepts on the basis of this particular work, whereas Professor Percival's notes gave us a very detailed insight into Emerson's style and his background of scholarship and culture. Similarly we read Shakespere's *Merchant of Venice* with Mr. M. Ghose, but we could get Mr. Percival's notes and observations—frequently these were strikingly penetrating and original on characters and situations in the play.

Professor M. Ghose's enthusiasm for Greek literature and culture was contagious, at least so it was for me and for a few of our classfellows. With Professor Ghose his love of Greek was a passion. Frequently he would come to college by tram, and I noticed he used to bring with him some Greek classic, in prose or verse, to read on the way, or during intervals of work at college. Those were the days long before the publications of the Loeb Classical Library, in which have been published now almost the entire literatures of Greece and Rome with the Greek or Latin text and English translation printed on opposite pages. I could see that Professor Ghose had the Oxford Greek texts interleaved and bound with Bohn's English translation, and in this way he could get the text and the translation in a convenient single volume, for rapid or leisurely reading of the Greek text. All this care to have the text and translation together showed that his love of Greek literature was as much of the literary man as of the scholar of Greek.

Lovable simplicity

The real man reveals himself when he is out of harness, and the greatness of Professor M. Ghose was made clearer to us when we had occasion to meet him away from college, in his own home and study. It was very special good fortune for me to be able to see him at his house (at that time he was living in an old-fashioned small mansion at 55 Elliot Road—this building has now been replaced by another on the same site). I would go to his house frequently enough after college hours both when I was a senior M.A. student, and subsequently after my passing out of college. We did not have at that time (during 1909-13) much knowledge of his personal life. We knew that he was taken to England for studying when he was only eleven, and he was in one of the great English Public Schools, and after that he joined Oxford. Soon after he began his life in Oxford, he distinguished himself as a keen and discriminating student of literature, and made his mark in the Greek and Latin classics. In Oxford he made literary friendships with a number of prominent English writers and poets and art-lovers, among whom was Laurence Binyon, the distinguished poet, critic and historian of art, who edited a selection from Professor Ghose's English poems. After obtaining the highest degree from Oxford, he was taken into the Indian Educational Service, and he finally joined the Presidency College in Calcutta. I do not know the other details about his life and his career. But I could see, particularly during the evenings that I was privileged to spend with him at his home, when the real man and artist came out in all his lovable simplicity that it was rare good fortune for any one to have a sort of intellectual fellowship with him. These evenings have remained indelible in my memory, and they have had the greatest influence for good in the formation of my cultural outlook and the extension of my mental horizon. He was specially pleased with me,

probably because I evinced an interest in his favourite subject of Greek language and literature. I used to read with the greatest relish some of the greatest masterpieces of ancient Greek literature in English translation, particularly Homer, the Homeric Hymns, the three Tragic Poets, Herodotos, Pindar, Theokritos and the lesser lyric poets. Fragments from Sappho in the original Greek from Warton's edition which was lent to me by Professor Ghose, I got by heart. But I must confess that not being philosophically inclined I did not venture to read Plato. The fact that I was genuinely fond of Greek literature made him like me very much.

After I was formally taken to his place one afternoon by a fellow-student who used to visit him several times a week, he graciously took me in his entourage and later on into his confidence in matters connected with arts and letters. Talks with Professor M. Ghose over a cup of tea in his study enabled me to have a clear conception of literature and art. He would sometimes recite some great passage from Greek literature and explain it to me. I remember on one occasion he read to me a beautiful little lyric in Greek which was ascribed to Aesop, the Greek wise man and fabulist, and I liked it so much that I took it down in the original Greek and easily got it by heart, and I still remember it :

> *pos tis, aneu thanatou'se phugoi, bie*.... .
> "Who can escape thee, O life, let alone Death ?
> For many are the evils in thee, which are both difficult
> to bear or to shun.
> The joys in thee are the beautiful things in Nature—
> The Earth, the Sun, the Star, and the wheels of the
> Moon and the Sun.
> As for the rest, they are fears and torments,
> And if anyone enjoys a little happiness,
> Nemesis exacts a recompense."

Profound love for Greek Literature

Professor Ghose had that kind of profound admiration for Greek which characterised some of the great scholars and writers of Europe, for whom the love of Greek was the sole devotion in life. It is said that Anatole France, who was a writer of this type was once shown some very fine specimens of Chinese art in landscape painting. He was immensely moved, but he would not pay a divided allegiance to his beloved Greek, and he wanted to shut his eyes towards the beauties of what appeared to him to be the alien art of China ; and he declared, almost with a spirit of despair, his whole-hearted devotion : *pour moi, les Grecs suffisent* (for me, the Greeks are sufficient). Professor M. Ghose, however, had the catholicity and acceptance which are characteristics of the Indian mind. I was very much impressed by Chinese nature poetry, which I had read in translations, and as Professor M. Ghose appeared not to have known anything about it, I ventured to lend to my master Herbert Giles's "History of Chinese Literature", which gave translations of many beautiful pieces of Chinese poetry, so that he might read and compare it all with the great things of Greek literature. I was of course very keen to benefit from his reaction to Chinese literature. Professor Ghose read Giles's book carefully, and I was happy to find that he was very much impressed by the great quality of Chinese nature-poetry and he told me : "I am glad you gave me this book. Chinese poetry in its description of nature is really of the highest quality, and I must tell you that it can give points even to Greek literature in this matter—it even beats Greek literature."

Professor Ghose also encouraged and directed along fruitful channels my love for and pleasure in the plastic arts. It was he who first gave me an idea of the greatness of Greek art of both the classic and the pre-classic periods by showing me reproductions of sculptures, vasepainting and

coins, and by talking to me about them. He initiated me into such diverse expressions in art as Gothic sculpture, Italian painting of the *Quattrocento*, the Japanese wood-cuts of the *Vkiyo-ye* school and Chinese landscape painting. I have reasons to feel eternally grateful to Professor M. Ghose for the long afternoons and evenings which I used to spend at his house at Elliot Road, and sometimes I was so very much engrossed by what I was listening from him that I missed my last tram car for home and would tramp all the way back if I did not get a *ticca-gharry* (the ramshackle horse-carriages which were the only source of locomotion in Calcutta half a century ago when the trams ceased to run). As I have found it his scholarship and culture has been both a joy and source of happiness as much as an example and inspiration for me.

A rare poetic genius

And his heroism in family life ! It was plain that there was something wrong at home, and I gradually discovered that he had a sick wife, who frequently was off her head, and he had two little daughters whom he had to mother. Yet no word of complaint ever escaped from his lips. He was all sweetness as he was all light. Even when he was in the Presidency College, very much living, and moving amongst us, he seemed to us to be passing into a legend. And that was partly because of his two brothers Aravinda (Aurobindo) Ghosh and Barindra Ghosh. Barindra had already become an almost legendary figure when he was condemned by a British court in Calcutta to transportation for life in the Andaman Islands for his revolutionary activities to bring about the freedom of India from the British. Aravinda Ghosh (Sree Aurobindo) with his immense intellectual achievement, narrowly missed the same fate, and he found asylum with the French at Pondicherry where he later on became a *Yogi* and a religious teacher who was

worshipped like a veritable god on earth by his most ardent devotees. The general detachment of Professor M. Ghose from the affairs of the life around him, and his burying himself in his own studies, his poetical compositions, and his art collections, also made him for most of us a recluse living "far from the madding crowd" in a world of his own creation. We heard a story that Professor Ghose, because of his greatness in English poetry, had a chance of becoming the Poet-Laureate of England at the time when Robert Bridges was appointed to that office. That, perhaps, has no foundation in fact. But, it was certainly indicative of the very high estimation in which he was held by Englishmen who were connoisseurs of poetry.

His kindness to me expressed itself in the manifold ways in which he would give me of his best—in his genuine sympathy for me (he gave me a certificate which was exceedingly flattering, and I had a genuine pleasure and pride that it was a sincere expression of what he felt about me), and in his solicitude to give a definite shape to my thoughts and aspirations. He would honour me by reading to me some of his prose papers which he had to prepare for a little literary coterie of the highest order in Bengal, which was started at the residence of Rabindranath Tagore, where would be held discussions in which men like Rabindranath, his nephews Abanindranath and Gaganendranath, distinguished writers like Pramatha Chaudhuri (husband of Rabindranath's niece Indira Devi Chaudhurani), Indira Devi herself, some eminent European scholars and art-lovers of Calcutta, and a few others among the intellectual élite in Calcutta, would take part. It was of course an informal gathering of intellectuals and creative writers, too exalted for a young professor like me then just out of college. But these used to bring to me a whiff of mountain wind or sea breeze in my humdrum day-to-day life.

It was one of the greatest disappointments in my life

that after returning from Europe after three years, in 1922, reports of his serious illness prevented me from going to see him. How glad he would have been to hear from me that I had been to Rome and had also made my pilgrimage to Greece—had seen the Parthenon and Delphi, Olympia and Sparta, Tiryns and Mycenae ! How would I have loved to talk to him of my experiences, as I had the pleasure of doing to Prof. Percival in London. This disappointment is all the keener, because I was informed that he retained the same kindly feeling for me even when further serious mental disorder began to cloud his last days.

All homage to my great teacher, as he used to appear to us in our classes ; kind and gentle, erudite, yet of exceeding simplicity, whose luminous exposition of literature showed that we had a rare poetic genius and an inspired master in our midst. He was every inch of him a poet, a scholar, and a gentleman. May his memory for ever continue to be green for all of us who were his pupils, may his spirit be a beacon light for all of us in our striving for sweetness and light, and may the living presence of a true teacher continue to inspire us through his writings as a poet.

প রি শি ষ্ট ২

রবীন্দ্র-জীবনদেবতা

[সংযোজন]

"রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'-র কল্পনা" "চোদ্দ বছরের ছেলে" সুনীতিকুমারের "হৃদয়কে মনকে" আচ্ছন্ন করে, আর এই 'জীবন-দেবতা' নিয়ে তাঁর ভাবনার শুরু তখন থেকেই। একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা' নিয়ে লেখা সুনীতিকুমারের একটি প্রবন্ধ "রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা' " নামে প্রকাশিত হয় বাঙলা ১৩২৬ সালের 'শারদীয়া বসুমতী'তে। পরিণত বয়সের এই রচনাটি সুনীতিকুমারের রবীন্দ্র-জীবনদেবতা-বিষয়ক আযৌবন ভাবনা আর বিচারের পরিণত ফল। কিঞ্চিৎ পরিমার্জিত আর পরিবর্ধিত রূপে প্রবন্ধটি সুনীতিকুমারের অন্যতম প্রবন্ধ-সংগ্রহ 'সাংস্কৃতিকী' প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয় (১৩৬৮), পরে পুনর্মুদ্রিত হয় তাঁর 'মনীষী স্মরণে' প্রবন্ধ-সংগ্রহে (১৩৭৮)। ইংরিজিতে একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা' বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ না লিখলেও, রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক তাঁর দু-খানি ইংরিজি বইতে তিনি এ নিয়ে কিছু আলোচনা করেন (দ্রষ্টব্য *Rabindranath Tagore*, Marathwada University, 1965 ch. II, pp. 18-46; *World Literature and Tagore*, Visva-Bharati, 1971, pp- 175-203)। এর পরেও রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা' নিয়ে তাঁর ভাবনা চ'লতে থাকে। এরই পরিণামে, ১৯৭৬ সালের প্রথম দিকে, তিনি "রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা' আশয় করিয়া" একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ লেখবার সংকল্প করেন, আর তার জন্যে তৈরি হ'তে থাকেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ কবিতা উক্তি ব্যাখ্যান তিনি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য মনে করেন, তার একটি বিশদ তালিকাও তৈরি করেন। এইভাবে প্রস্তুত হ'য়ে, ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরে তিনি বই লেখাতে হাত দেন—বইয়ের নাম দেন 'রবীন্দ্র-জীবনদেবতা', তিন দিনে (৩, ৫, ৬ ডিসেম্বরে) লেখেন মোট পাঁচ পৃষ্ঠা (ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজ, এক পিঠ সাইক্লোস্টাইল-করা, তার উল্টো সাদা পিঠে বড়ো বড়ো অক্ষরে ঠাসা লেখা)। একখানি ভাঁজ-করা সাদা ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বইয়ের সূচীর একটা খসড়াও ক'রে ফেলেন কিন্তু চোখের ছানির কারণে বই লেখা বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। যতটুকু লিখেছিলেন, আমাকে প'ড়তে দেন। তাঁর সামনে ব'সে আমি পড়ি, তিনি শোনেন। পাণ্ডুলিপির চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ দিকে একটি পদ ('ইহাতে'), তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম দিকে কয়েকটি পদ ('আমরা দেখিতে পাই যে'), আর চতুর্থ অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি সংস্কৃত বাক্য ('আবীরাবীর্ম এধি') লেখকের নির্দেশে আমি পাণ্ডুলিপিতে নিজের হাতে যোগ করি। কয়েকটি বাক্যের গঠন বেশ জটিল, অর্থগ্রহ আয়াসসাধ্য। লেখক নিজেও শুনে বুঝতে পারেন, বলেন, পরে দেখে ঠিক ক'রে দেবেন। কিন্তু সে সময় আর পান না। সূচী বাদে পাঁচ পৃষ্ঠা লেখার সবটাই 'পরিচয়' পত্রের সুনীতিকুমার-স্মরণ-সংখ্যায় (১৩৮৪ বঙ্গাব্দ) ছাপা হয়। তাতে অনিবার্য কারণে বিস্তর ছাপার ভুল থাকে, একটু ছাড়ও যায়; তা ছাড়া, পরবর্তী অংশ আগে আর পূর্ববর্তী অংশ পরে, এ রকম বিপর্যয়ও ঘ'টেছে। বর্তমান সংকলনে সুনীতিকুমারের 'জীবন-কথা'র পরিশিষ্টে সংযোজন রূপে তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনদেবতা'-র (যতটুকু লিখেছিলেন তার) শুদ্ধ পাঠ (অর্থাৎ পাণ্ডুলিপিতে যেমনটি আছে) পরিবেষণ করা হ'চ্ছে, আর তার প্রথমে থাকছে তাঁর হাতে-লেখা সূচীর প্রতিলিপি। এই সূচী থেকে সম্পূর্ণ গ্রন্থের পরিকল্পনার একটি আভাস পাওয়া যেতে পারে॥

অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

জীবন-দেবতা

১। পরিচিতি

২। কবি-রবি-রুচি গীতি-(মূর্ত্তি)-গাথা-/ময়ী —

৩। উৎস — উষাঃ — উর্বশী - পুরূরবাঃ - বাক্

৪। প্রতিরূপ (প্রতিবিম্ব) —

Aphrodite — Hellas — Artemis

Pervigilium Veneris — Roma — Diana

Algernon Charles Swinburne —

Chorus in Atalanta in Calydon

Hertha, the Last Oracle

Ma'shūqah - Ibn al-ʿArabi,

Rābiʿah al-ʿAdawiya Jalaluddin Rumi Hāfidh Sa'adi

বাঙ্গালার কবি — Select Poems. Nūruddin Jāmi

৫। সুধী-বন্দিত —

অজিত চক্রবর্তী; বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর; প্রমথ চৌধুরী; কৃষ্ণ কৃপালনী

সুরেন্দ্রনাথ [illegible]; শশিকুমার [illegible]; [illegible]; সুধীন্দ্র [illegible]; সুকুমার সেন

Omit Quoting

Give only names

৬। কবি-কথন / কবি-ব্যাখ্যান

সমগ্র-সঞ্চয়ন হইতে

৭। লেখক-পরিচয় — রবীন্দ্র-[illegible] : [illegible]

॥ রবীন্দ্র-জীবনকথা ॥ (১) [illegible]

৩৭৮ বিশ্বসাহিত্যে, অর্থাৎ সুপ্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতি
— সুসভ্য, সভ্য, অর্ধসভ্য, অসভ্য — যে লিখিত ও মৌখিক সাহিত্য সৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছে
এবং যাহা একালে প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, বাল্যকাল হইতেই [illegible]
বিশ্বমানবের সৃষ্ট সেই সাহিত্যের প্রতি আমার মনে একটা আকর্ষণ রহিয়াছে। সাহিত্য,
শিল্প ও সঙ্গীত — এই তিনটি কলার (মানব-প্রতিভার) সাহায্যে মানুষ আত্মপ্রকাশ বা আত্মার সত্তার
(সে তিনটি) পূর্ণরূপ এবং অনুভূতি করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, ইহার প্রতি একটা সহজ
আগ্রহ আমার জীবন ব্যাপী রহিয়া গিয়াছে। এবং এখন নিজের জীবনের অবসানের সময়:
জীবনে আলো এবং মধুর উৎস যাহা খুঁজে পাইয়াছি তাহা প্রকাশ করিতে, তাহার জন্য
জীবনে [illegible] যত্ন সাধিত। কিন্তু সেই উচ্চ পর্যায় নিবেদন করিতেছি [illegible]
শিল্প সাহিত্য ও সঙ্গীত এই তিন [illegible] জীবনের মধুর [illegible] জন্য।
Ars longa, vita brevis — শিল্প ও জ্ঞান দীর্ঘকাল-প্রসারী, জীবন অনিত্য
তাহা হইলেও এই অনিত্য জীবনের অন্য কোনও লোভ নাই।

॥ রবীন্দ্র-জীবনদেবতা ॥

৩।১২।৭৬

বিশ্বসাহিত্যের, অর্থাৎ সুপ্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত সমগ্র মানব-জাতি—সুসভ্য, সভ্য, অর্ধসভ্য, অসভ্য মানব—যে লিখিত ও মৌখিক সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং যাহা এতাবৎ প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, এবং সেই বিধায় আধুনিক যুগের সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যার পাঠকের নিকট পহুঁছিয়াছে, বাল্যকাল হইতেই, বিশ্বমানবের সৃষ্ট সেই সাহিত্যের প্রতি আমার মনে একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছে। সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত— এই যে তিনটি কলার—কলা-ত্রয়ীর—মাধ্যমে মানুষ সারসত্যের বা শাশ্বত সত্তার অনুভূতি এবং উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, সে তিনটির প্রতি একটা সহজ আগ্রহ লাভ করিয়া জীবনে আমি ধন্য হইয়াছি। এবং এখন এই সাতাশি বৎসর বয়সে, জীবনের অবসানের সময়ে জীবনে ভালো এবং মন্দ উভয়ের মধ্যে যাহা পাইয়া বিদায় গ্রহণ করিব, তাহার জন্য জীবনের পরিচালক অজ্ঞাত অদৃশ্য শক্তির নিকট শেষ কৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি, শিল্প সাহিত্য ও সঙ্গীত এই তিন রস-বস্তুর দ্বারা জীবনকে মধুময় করার জন্য। Ars longa, Vita brevis—শিল্প ও জ্ঞান দীর্ঘকাল-প্রসারী, জীবন ক্ষণিকের—তাহা হইলেও এই ক্ষণিকের জীবনের জন্য কোনও ক্ষোভ নাই।

ক্ষোভ নাই—তাহার মুখ্য কারণ, রবীন্দ্রনাথের বিরাট শিল্পময় প্রতিভার, দর্শনময় ব্যক্তিত্বের, তাঁহার মতো সত্যদ্রষ্টা ঋষির বাণীর ও জীবনের স্পর্শ—এবং আশীর্বাদও আমি আমার জীবনে কিঞ্চিৎ পরিমাণে পাইয়া গেলাম। যাহা পাইয়াছি, যাহার দ্বারা জীবন ধন্য হইয়াছে, তাহার কথা সংক্ষেপেও বলিতে গেলে সময়ে কুলাইবে না। যাহা লিখিয়া ও ছাপিয়া গেলাম, তাহার মধ্যেই যাহা পাইয়াছি তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় হয়তো পাওয়া যাইবে। বহু অস্পষ্টতা আছে, পুনরুক্তি আছে—যাহার দ্বারা হৃদয় মন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে তাহার পূর্ণ প্রকাশের অক্ষমতা নিজেকেই পীড়া দিতেছে। প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে ভালো লাগে, সেইজন্য বৃদ্ধ বয়সের অক্ষমতা সত্ত্বেও শেষ কথা রূপে না

বলিয়া—পুনরুক্তি না করিয়া—পারি না। সেইজন্য আবার এই প্রসঙ্গের অবতারণা, যাহা বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথেরই দিব্য দান রূপে পাইয়াছি।

* * *

প্রসঙ্গ হইতেছে রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা" আশয় করিয়া। একটি বিষয় যেটির সম্বন্ধে আমি পূর্বে একাধিকবার লিখিয়াছি ও বলিয়াছি এবং যাহা অন্ততঃ দুই একজন বিদগ্ধ সাহিত্যরসিকের অনুমোদন পাইয়াছে (এবং সেই অনুমোদনই আমাকে এই বিষয়ের আলোচনায় সাহসী করিতেছে), প্রথমেই তাহার অবতারণা করিব। রবীন্দ্রনাথকে পণ্ডিত বিচারশীল সুসাহিত্যিক মাত্রেই বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ও শ্রেষ্ঠ মহাজন বলিয়া স্বীকার করিবেন। সুপ্রাচীন, প্রাচীন, মধ্য যুগের, আধুনিক কালের তাবৎ সাহিত্য-সর্জনার মধ্যে যেগুলি মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে, বিশ্বসাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডার রূপে যে সকল সাহিত্য-রচনা বহু বর্ষ ধরিয়া একটি সমগ্র জাতির মধ্যে উদ্ভূত সাহিত্য-সম্পুট বলিয়া গৃহীত, অথবা কোনও একজন বিশিষ্ট সাহিত্যরথীর স্বকীয় সাহিত্যসর্জনা রূপে বিদ্যমান, সেইরূপ বিভিন্ন যে কয়েকটি প্রধান জাতি-নিবদ্ধ বা জাতি-সৃষ্ট সাহিত্য-গ্রন্থনা তথা ব্যক্তিগত কবি বা সাহিত্যস্রষ্টার স্বকীয় রচনা, সেগুলির মধ্যে মাত্র দশটিকে, আমার জ্ঞান-গোচর মতো, আমি মুখ্য স্থান দিই। শত শত সহস্র সহস্র সাহিত্য-কৃতির মধ্যে, বিগত তিন হাজার বছর ধরিয়া, অর্থাৎ মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ বর্ষ হইতে এখন পর্যন্ত, এই তিন সহস্রক ধরিয়া এগুলি এখনও কার্যকর হইয়া বিদ্যমান, এবং সর্বাপেক্ষা অধিক মানব-সন্তানের পক্ষে তাহাদের মানসিক ও আত্মিক, ভৌতিক ও তাত্ত্বিক এবং জাগতিক ও নান্দনিক, এক কথায়, সমগ্র মানবিক চিন্তা, বিচার ও প্রকল্পের অক্ষয় মধুভাণ্ডার স্বরূপ হইয়া আছে। এই সকল সাহিত্য-সম্পুট ও সাহিত্য-রচনা ছাড়িলে আধুনিক মানুষের এক দণ্ডও চলে না। এই রচনাগুলির মধ্যে যেগুলি প্রাচীনতম, সেগুলি তাহাদের প্রচলিত রূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এখন হইতে তিন হাজার বৎসর পূর্ব হইতে, এবং এখনও এগুলির পঠন পাঠন ব্যাখ্যান বিচার আলোচনা কোথাও-না-কোথাও পূর্ণভাবে বিদ্যমান। যদিও এইগুলির কতকগুলির উৎস বা প্রাচীনতর রূপ এখনও [এখন হইতে] চারি পাঁচ ছয় সাত হাজার বৎসর পূর্বেকার অধুনালুপ্ত সুপ্রাচীন সভ্যতার যুগে প্রচলিত ছিল, এবং প্রস্তর ও মৃত্তিকার উপরে এবং বৃক্ষত্বক্ ও পশুচর্মের ও পশুর

অস্থির উপরে নানা প্রাচীন লিপিতে উৎকীর্ণ এই সমস্ত সুপ্রাচীন সাহিত্যের আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধার হইয়াছে, এবং বিশিষ্ট পণ্ডিতমহলে সেগুলির চর্চা এখন নিবদ্ধ—মূল রচনা এখন সাধারণ্যে সুলভ বা সহজবোধ্য হয় নাই,—তাহাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে সেগুলি আর গণ্য নহে। যেমন প্রাচীন খাল্‌দীয় (সুমেরীয় ও আক্কাদীয়) লিপিতে লিখিত অনুশাসন, বাবিলনীয় ও আসিরীয়, ইলামীয় অনুশাসন, নানা যুগের প্রাচীন মিসরীয় অনুশাসন ও লেখ, কানিসীয় বা হিত্তী জাতির অনুশাসন, প্রাচীন চীন (শাঙ, চৌ যুগের অস্থি ও ব্রোঞ্জ ফলক ও ব্রোঞ্জ পাত্রের উপর উৎকীর্ণ লিপি), আমেরিকার প্রাচীন মায়া ও আস্তেক ও অন্যান্য ভাষার লেখ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এখন মানবসমাজে প্রচলিত ও বহুল-পঠিত যে দশটি শ্রেষ্ঠতম বা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ গ্রন্থ বা লেখ-সম্পুট বিদ্যমান আছে, পূর্বেই যাহা বলিয়াছি, আমার বিচার মতো, সেগুলি হইতেছে এই কয়টি, এবং বাঙ্গলা ও ইংরেজি ভাষায় নিবদ্ধ রবীন্দ্ররচনাবলী সেগুলির মধ্যে অবম, চরম এবং পরম। এই দশটি গ্রন্থ-সম্পুট ছাড়া নানা জাতির মধ্যে প্রচলিত আরও কতকগুলি অতি উচ্চ কোটির গ্রন্থরাজি আছে, বিশ্বসাহিত্যে যেগুলির স্থান অতি উচ্চে। তবে আমার মনে হয়, নিম্নে প্রদত্ত এই দশটি প্রধানতম বিশ্বসাহিত্য-সম্পুটের পরেই সেগুলির উল্লেখ করিতে হয়। যদিও বহু প্রখ্যাত সাহিত্য-রসিকদের মতে, আমার দ্বারা নির্দিষ্ট দশ প্রস্ত বা দশ দফা প্রধান বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে এক পংক্তিতে (এমন কি কোথাও বা আরও উচ্চ মর্য্যাদার) স্থান পাইবার যোগ্য। লাতীন প্রবাদ আছে—de gustibus non est disputandum, অর্থাৎ "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ ॥"

বিশ্বসাহিত্যের দশটি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থসম্পুট—

[১] প্রাচীন ভারতের মহাকাব্যদ্বয়, মহাভারত ও রামায়ণ ; ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদ—নির্বাচিত সূক্তাবলী ; প্রাচীনতম ষোলখানি উপনিষদ্ ; এবং কালিদাসের গ্রন্থাবলী (কাব্য ও নাটক)। খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতক হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্য্যন্ত—এই ১৪০০ বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় নিহিত ভারতীয় আর্য্যজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি।

[২] প্রাচীন গ্রীসের মহাকবি হোমরের নামে প্রচলিত দুই মহাকাব্য ইলিয়াদ ও ওদিস্‌সি, হোমরের রচিত বলিয়া প্রচলিত ৩৩টি দেবগাথা

ও দেবস্তুতি, এবং ইলিয়াদ ও ওদিস্‌সি এই দুই মহাকাব্যের পরিশিষ্ট রূপে প্রচলিত কতকগুলি অর্বাচীন গ্রীক কাব্য ; গ্রীক মহাকবি হীসিওদ-রচিত কৃষিজীবন-বিষয়ক ও দেবতা-বিষয়ক পুরাণকথার কতকগুলি কাব্য ; এবং গ্রীসের ট্রাজিক নাট্যকার আয়স্‌খুলস্‌, সোফোক্লেস্‌ ও এউরিপিদেস্‌-এর উপলব্ধ নাটকাবলী। খ্রীষ্ট-পূর্ব ৯০০ হইতে ৩৫০ পর্য্যন্ত প্রাচীন গ্রীসের আহৃত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক দান।

[৩] যিহুদী জাতির প্রাচীন পুরাণ, ও ধর্মশাস্ত্র। হিব্রু ভাষায় রচিত মহাগ্রন্থ 'বাইবল', খ্রীষ্টপূর্ব দশম হইতে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক পর্য্যন্ত শেমীয় যিহুদী জাতির প্রধানতম ধার্মিক ও সাহিত্যিক দান।

[৪] পারস্যের ঐতিহাসিক মহাকাব্য 'শাহ্‌নামা', মহাকবি ফিরদৌসী কর্তৃক প্রায় ৬০,০০০ ফারসী ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে নিবদ্ধ—ইহাতে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ পর্য্যন্ত প্রাচীন কালের পুরাণকথা ও বীরগাথার পরবর্তী পরিবর্তিত রূপ আধুনিক পর্য্যায়ের ফারসী ভাষায় রচিত হইয়া আছে।

[৫] ব্রিটেনের কেল্‌তিক আর্য্যজাতীয় খ্রীষ্টান রাজা আর্থর-এর ও তাঁহার সভার বীরগণের কাহিনী। আর্থরের জীবৎকাল খ্রীষ্টীয় ৫০০র কিছু পর পর্য্যন্ত। সেই সময় হইতেই, এবং তাহার পূর্ব হইতেই, কেল্‌তিক জাতির দুই শাখা ওয়েল্‌শ্‌ ও আইরিশ্‌-দের কিছু বীর-কাহিনী, রাজা আর্থরের জীবনী, তাঁহার বিখ্যাত গোলটেবিল সভার যোদ্ধগণের শৌর্য্য ও প্রেমগাথা, যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুকালে তাঁহার শোণিত যে পাত্রে রক্ষিত হইয়াছিল—এই সমস্ত, এবং অন্য কথা লইয়া মহাভারতের মতো বিরাট কথাসম্পুট, যেটি পূরা হইতে ১০০০ বৎসর লাগিয়াছিল (৫০০-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ), এবং যাহার বিভিন্ন উপাখ্যান পশ্চিম ইউরোপের এই কয়টি ভাষায় রচিত কাব্যে ও গদ্যগ্রন্থে রক্ষিত আছে—প্রাচীন আইরিশ্‌, প্রাচীন ওয়েল্‌শ্‌, মধ্যযুগের লাতীন ফরাসি ইংরেজি প্রভাঁসাল ইতালীয় স্পেনীয়, এবং মধ্যযুগের জর্‌মান।

[৬] নগরবাসী মুসলমান আরব-সভ্যতার মহাভারতের মতো বিশাল কথাগ্রন্থ 'অল্‌ফ্‌ লয়্‌লহ্‌ ওঅ লয়্‌লহ্‌' ('সহস্র রজনী ও এক রজনী'—সংক্ষেপে 'আরব্য রজনী')—খ্রীষ্টীয় ৮০০-১৬০০র মধ্যে ইরাক, শাম বা সিরীয়া এবং মিসরে সংগ্রথিত হয়।

[৭] ইংরেজ মহাকবি উইলিয়াম শেক্স্পিয়র্-এর ৩৭ খানি নাটক ও অন্য কাব্যগ্রন্থ (১৫৬৪-১৬১৬)।

[৮] জর্মান কবি, লেখক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যোহান ভোল্ফ্‌গাঙ্গ্ ফন্ গ্যোটে (১৭৪৯-১৮৩২)—তাঁহার গদ্য ও পদ্য রচনাবলী, নাটকাবলী, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক লেখসমূহ।

[৯] রুষ লেখক, ঔপন্যাসিক ও ধর্মনেতা ল্যেভ নিকোলাইভিচ্ টল্স্টয় (১৮২৮-১৯১০)—তাঁহার নানাবিষয়ক রচনাবলী, বিশেষতঃ তাঁহার বিরাট উপন্যাস Voina I Mir "যুদ্ধ ও শান্তি"।

[১০] আধুনিক ভারতের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)।

এই সকল গ্রন্থসম্পুট এবং লেখকের সম্বন্ধে আমার ইংরেজি গ্রন্থ World Literature and Tagore-এ (বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, শান্তিনিকেতন, ১৯৭১, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৩৫) কিছু আলোচনা করিয়াছি। এই দশ প্রস্ত বিশ্বসাহিত্যগ্রন্থ ছাড়া বিশ্বমানবের মধ্যে প্রচারিত অন্য প্রায় তাবৎ শ্রেষ্ঠ পুস্তকের সম্বন্ধেও কিছু কিছু উল্লেখ ও বিচার ইহাতে আছে। অন্য লেখাতেও কিছু অবতারণা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

তবে একটি বিষয় লইয়া আবার দুই চারিটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই যে দশ প্রস্ত প্রধান বিশ্বসাহিত্য-সম্পুটের কথা বলিলাম, সেগুলির প্রত্যেকটি এক একটি সুসভ্য জাতির, ক্বচিৎ বা (রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত পরিভাষায়—ভারতবর্ষের বা পশ্চিম ইউরোপের মতো বিভিন্নভাষাভাষী "মহাজাতি"র) বহুবর্ষব্যাপী কৃতির—ধ্যান ধারণা চিন্তা বিচার বিবেচনা কৃত্য নির্ণয়ের—ফল। মানবজাতির—বিশ্বমানবের—অন্তর্গত এই সব জাতি বা মহাজাতির মধ্যে একটা মৌলিক মানব-সাধারণ ঐক্য ও ভাবসাম্য আছে—সেই ঐক্য বা ভাবসাম্যের বাহ্য প্রকাশ নানাবিধ এবং আপাত-দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু মূল তত্ত্বের মধ্যে যখন আমরা অবগাহন করি, তখন সকল বিরোধের সমাধান হয়। সব দেশেরই চিন্তাশীল মানুষ মানবজাতির চেষ্টা এবং কর্মপ্রেরণার মধ্যে এক মৌলিক একতারই সন্ধান পাইয়াছে, তাহার ফলে লাভ করিয়াছে এই ঐক্যের আধারে পরস্পরের সম্বন্ধে জ্ঞান, সেই জ্ঞান হইতে শ্রদ্ধা, প্রীতি, চিত্তের প্রসার, শান্তি, শাশ্বত সত্তা বিষয়ে চেতনা। "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"। যা আছে, সেই একমাত্র বিদ্যমান সদ্ বস্তু, তাহাকে জ্ঞানী ব্যক্তি নানাভাবে

বর্ণনা করেন। এই বহুধা বর্ণন, নানাভাবে সার বস্তুকে দেখা,—সেটি বিভিন্ন জাতি ও মহাজাতির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য যে বিচিত্রতা আছে তাহার মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভিতরে এক, বাহিরে অনেক, নানা।

সেই হেতু আমরা দেখিতে পাই যে, এই দশটি বিশ্বসাহিত্যের গ্রন্থসম্পুটের মধ্যে, জাতি ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে এক এক প্রকারের কথাকেই বা আদর্শকেই প্রধানতম বা মুখ্যতম বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে।

৫।১২।৭৬

প্রাচীন ভারতের বেদ উপনিষদ্ মহাভারত কালিদাসের অন্তর্নিহিত বাণী ও শিক্ষা যাহা পৃথিবীর তাবৎ মানবসন্তানের পক্ষে গ্রহণযোগ্য, তাহার একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য, একটি স্বকীয়তা ও সেই স্বকীয়তার প্রকাশক নাম-রূপ আছে, তাহাই যেন ভারতের বেদ উপনিষদ্ মহাভারত কালিদাসের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান, চিন্তাজগতের সেই স্বকীয়তা তাহার নিজ নামের গৌরবের মধ্যেই বিদ্যমান, ভারতের এই সমগ্র প্রাচীন গ্রন্থরাজি-ই সেই স্বকীয়তার প্রকাশ-ভূমি ও ব্যাখ্যান-ক্ষেত্র। একটি বা দুইটি সর্বজনগৃহীত শব্দ মূল মন্ত্র বা বীজশব্দবৎ—যেন সেই বিশ্বন্ধর শব্দের মধ্যেই সব কথা ধরা হইয়া আছে, যে শব্দের ব্যাখ্যার যেন অন্ত পাওয়া যায় না। ভারতীয় সভ্যতার প্রকাশক এই গ্রন্থনিচয়ের মূল কথা "ঋত" এবং "ধর্ম" এই দুইটি শব্দের মধ্যেই যেন নিহিত আছে, এবং "তৎ সৎ", "সচ্চিদানন্দম্", "রসো বৈ সঃ", "আবিরাবীর্ম এধি" প্রভৃতি কতকগুলি ভাবগর্ভ বাক্যখণ্ডেও তাহার মূলমন্ত্রের প্রকাশ নিহিত। "ঋত, ধর্ম, তৎ সৎ, একং সৎ, রসো বৈ সঃ"—এইরূপ গভীরার্থক শব্দ বা বাক্যের অন্ত পাওয়ার চেষ্টা ভারতীয় দর্শনের অতন্দ্র সাধনার কথা—ভারতের সংস্কৃতির, সত্যদর্শনের বা ঋতস্তরতার বাঙ্‌ময় প্রতীক। সেইরূপ প্রাচীন গ্রীসের হোমর হীসিওদ প্রমুখ কবি এবং আয়স্‌খুলস্ সোফোক্লেস্ এউরিপিদেস্ প্রমুখ নাট্যকারগণ তাঁহাদের রচনায় যেভাবে গ্রীসের আত্মার প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা Hubris বা অহঙ্কার হইতে মুক্ত থাকা, Philosopheia বা জ্ঞানান্বেষণ, Zeus বা জ্যোতির্ময় আদিদেবের চেতনা, এবং তাঁহার Dike বা পরমদেবতার দেশনা—এই সবের সাধনার শব্দগুলি তাহার প্রতীক।

৬। ১২। ৭৬

যিহুদীদের শাস্ত্রসম্পুট 'বাইবল' মহাগ্রন্থের তেমনি প্রতীক শব্দ হইতেছে Yahweh—যিহুদী ধর্মের পরব্রহ্ম—Yahweh শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে Ehyeh asher Ehyeh—ইংরেজিতে I am that I am— অর্থাৎ "আমি আছি বলিয়াই আছি", অথবা I shall be that I shall be অর্থাৎ "আমি যেমনটি হইব তেমনটিই হইব"—শাশ্বত সত্তার স্থিতিময় অথবা গতিময় প্রকাশ। এই কতকটা নির্গুণ Yahweh-র সগুণ প্রকাশ হইতে[ছে] El বা Elohim অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বর রূপে, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, পবিত্র হইতেও পবিত্রতম, পাপের শাস্তিদাতা, অথচ করুণাময়। Yahweh এবং Elohim এই হিব্রু "বাইবল" গ্রন্থের মূলমন্ত্র। তদ্রূপ অন্যান্য বিশ্বসাহিত্য-গ্রন্থ-সম্পুটের একশব্দময় বা একবাক্যখণ্ডময় মূল মন্ত্রের মধ্যে বিদ্যমান—যেন [?যেমন] মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপের "আর্থর-কথা"র প্রতিপাদ্য নারীপ্রেম এবং আর্ত-রক্ষার আধারে প্রতিষ্ঠিত, ঈশ্বরাবতার যীশুর পাপীর ত্রাণকারী শোণিত-পাত্র Holy Grail-এর সন্ধানে উৎসর্গীকৃত Knighthood বা ক্ষাত্রধর্মের আদর্শের উপর। শেক্স্পিয়রের সাহিত্যসাধনা তাঁহার নাটকাবলী ও কবিতা এবং গানে রূপ পাইয়াছে, তাহা হইতে মানবচরিত্রের জটিলতা, এবং সেই জটিলতার অভ্যন্তরে বিদ্যমান এক অজ্ঞাত ঐশী শক্তি যাহার হাতেই মানবজীবন গঠিত হয়, তাহার পরিবর্তনে মানবের কোনও হাত নাই (There's a divinity that shapes our ends, / Rough-hew them how we will,—)। গ্যেটের জীবনের মূলকথা যেন এই দুইটি মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—Das Ewig-Weibliche /Zieht uns hinan (The Eternal Woman[ly] draws us upwards), and মৃত্যুকালে অন্য প্রসঙ্গে তিনি যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই যেন ছিল গ্যেটের জীবনের প্রধান প্রেরণা এবং সাধনা—Mehr Licht (আরও আলো!)।

এই দশদফা বিশ্ব-সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়, এবং প্রত্যেকটির মূলমন্ত্রের কথা আমার World Literature and Tagore গ্রন্থে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। উক্ত পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তাঁর সমগ্র রস-সর্জনার আভ্যন্তর কথারও আলোচনার চেষ্টা করিয়াছি, এবং সেখানে আমার যাহা মনে হইয়াছে তাহা নিবেদন করিয়াছি,—তাঁহার কাব্যে কবিতায় গানে, তাঁহার গদ্যরচনায়

দেশনায়, তাঁহার গাথায় সূক্তে গীতে তাঁহার মনের ও প্রাণের যে অনুভূতির এবং উপলব্ধির কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টিকে এমন সুন্দর মহনীয় মনোরম আত্মারামময় করিয়া তুলিয়াছে, তাহা এক-কথা[য়] হইতেছে তাঁহার অপূর্ব চিন্তাভিব্যক্তি—"জীবন-দেবতা"।

কালিদাসের শকুন্তলা সম্বন্ধে গ্যোটে যে অনবদ্য সূক্তটি জর্মান ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন, সেটি রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা"র কল্পনার সম্বন্ধে শতগুণে প্রযোজ্য—এবং "জীবন-দেবতা" আরও বিরাট, আরও মহান্, আরও বিশ্বগ্রাহী।

"If thou wilt have the blossoms of the early year,
and the fruits of its decline,
If thou wilt have what charms and enchants,
If thou wilt have what satisfies and nourishes,
If thou wilt combine Heaven and Earth
in one single name,
I would name thee, O Sakuntala, and
then all will be said."

পরিশিষ্ট ৩

তিনখানি চিঠি

সুনীতিকুমার তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে দেশ-বিদেশের নানা জাতির মানুষের কাছ থেকে অসংখ্য চিঠি পেয়েছেন, চিঠি লিখেছেনও তিনি অসংখ্য—ইংরিজিতে (কিছু ফরাসিতেও), বাঙলাতে, হিন্দীতে। তাঁকে যাঁরা চিঠি লিখেছেন তাঁদের মধ্যে নামী মানী জ্ঞানী গুণী লোক যেমন ছিলেন, তেমনি সাধারণ মানুষও ছিলেন। এমন কি, পাড়াগাঁয়ের দরিদ্র বালক, ইস্কুলে প'ড়ছে, সেও তাঁকে চিঠি লিখেছে তাঁর অটোগ্রাফ চেয়ে, কিংবা তার ইস্কুলের পাঠ্য বই চেয়ে অথবা কোনো শব্দের অর্থ জানতে চেয়ে। অনেকের চিঠিতে অনেক রকমের উদ্ভট প্রশ্নও থাকতো। সুনীতিকুমার প্রত্যেকটি চিঠিরই উত্তর দিতেন, প্রত্যেকের জিজ্ঞাসাকেই মর্য্যাদা দিতেন, ছোটো বা অজ্ঞ মনে ক'রে কাউকেই উপেক্ষা ক'রতেন না। তাঁকে চিঠি লিখে কেউ উত্তর পান নি, এমন ব্যতিক্রম যদি ক্বচিৎ ঘ'টেও থাকে তো বুঝতে হবে সে-চিঠি তাঁর হাতে পড়ে নি, কিংবা তাঁর অনুপস্থিতিতে কাগজপত্রের স্তূপের মধ্যে চাপা প'ড়ে গিয়েছে, তাঁর নজরে পড়ে নি। কেবল চিঠির জবাবে নয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়েও তিনি চিঠি লিখেছেন—মনের খুশিতে, জানতে, জানাতে। ইংরিজি ১৯১৯ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রা করার পর সুনীতিকুমার দেশের বাইরে থেকে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে কয়েকখানি চিঠি লেখেন। তাঁর প্রথম চিঠি পেয়ে চৌধুরী মহাশয় সুনীতিকুমারকে "ঘন ঘন" এমনি "জলজ্যান্ত চিঠি" লেখবার তাগাদা দিয়ে লেখেন: "তোমার চোখে কানে এবং মনে যা ধরা পড়ে, তুমি অমনি খুঁটিয়ে আমাকে লিখো; সেই চিঠি শুনেই সবুজ দল চোখে বায়স্কোপ দেখতে পাবে।" সুনীতিকুমারের লেখা এরকম তিনখানি চিঠি 'সবুজ পত্র'-এ ছাপাও হয়। সুনীতিকুমারের লিপিকুশলতার তারিফ ক'রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন: "সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত, লিপিবাচস্পতি কিংবা লিপিসার্বভৌম কিংবা লিপিচক্রবর্তী।"

সুনীতিকুমারের প্রয়াণের পরে, বাঙলা ১৩৮৪ সালের 'পরিচয়' পত্রের সুনীতিকুমার-স্মরণ-সংখ্যায়, তাঁর লেখা বাঙলা ইংরিজি কতগুলি চিঠি ছাপা হয় (অন্যত্রও দু' একখানি ছাপা হ'য়েছে)। এগুলির মধ্যে নয়খানি শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারকে লেখা। এই নয়খানি বাঙলা চিঠির মধ্যে থেকে তিনখানি আমরা এই সংকলনে পুনর্মুদ্রিত ক'রছি (মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে, আর প্রয়োজনবোধে কিছু পাদটীকা যোগ ক'রে, বানান যেমন আছে তেমনি রেখে)। ১৯৩২-এর ২৯ এপ্রিল থেকে কয়েক বছর দেশপ্রেমের অপরাধে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার ইংরেজের বন্দিশালায় আটক ছিলেন। এই সময়ে গোপালবাবু আর সুনীতিকুমারের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হ'ত, সুনীতিকুমার কয়েক বার বন্দিশালায় গিয়ে গোপালবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন (দ্রষ্টব্য গোপালবাবুর লেখা "বন্দীর বন্ধু" প্রবন্ধ, 'পরিচয়', সুনীতিকুমার-স্মরণ-সংখ্যা, পৃঃ ৩১-৪৪)। বন্দী আর 'বন্দীর বন্ধু' উভয়ের চিঠিই কর্তা ব্যক্তিরা যথাবিধি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প'ড়ে দেখে চিঠির কপালে censored and passed ছাপ মেরে তবে ছাড়তেন। পুনর্মুদ্রিত তিনখানি চিঠির প্রত্যেকটির কপালেই এই ছাপ মারা আছে॥

অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

॥ শ্রীঃ ॥

কলিকাতা
৩ সুকিয়াস রো
৪।১২।৩২

CENSORED AND PASSED
Commandant Buxa Detention Camp

প্রীতিভাজনেষু,

গোপাল বাবু, আপনার দুইখানি পত্র এবং আমার instructions (আপনার research বিষয়ক) আপনার নিকট পহুঁছানোর সংবাদ যথাকালে পাইয়াছি—কিন্তু নানা ঝঞ্ঝাটে ছিলাম বলিয়া উত্তর দিতে দেরী হইয়া গেল। ইহার জন্য আমি মনে মনে বিশেষ অনুশোচনা অনুভব করিতেছি, আপনাকে চিঠি না দেওয়া, বিশেষ যখন এরূপ অবস্থায় বন্ধু ও আত্মীয়গণ হইতে এত দূরে রহিয়াছেন, একটা অপরাধ ও কর্ত্তব্যের ক্রটী বলিয়া মনে করি। যাহা হউক, আপনি কিছু মনে করিবেন না।

শান্তিপুর হইতে আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, বোধ হয় পূজার পরেই, ত্রয়োদশীর দিন, তাহার পরে আমাদের খবর আপনি খুব সম্ভব পান নাই। শান্তিপুরে পুরাণ পরিষদের বার্ষিক সভার কার্য্য সম্পন্ন করিলাম।—"পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করি, সেটি পৌষ মাসের ভারতবর্ষে বাহির হইবে। শান্তিপুর হইতে আমরা যাই নবদ্বীপে। নবদ্বীপে একটী বিকাল ও একটী রাত্রি ছিলাম, তৎপরদিন সকালে নবদ্বীপ হইতে কাটোয়ার দক্ষিণে শ্রীখণ্ডগ্রামে আসি। নবদ্বীপে ঐ অল্প সময়েরই মধ্যে কতকগুলি জিনিস দেখা গেল। এক বাউল বাবাজী নিজেকে চণ্ডীদাস বলিয়া পরিচয় দিয়া, নিজ শক্তি বা বৈষ্টবীটীর "রামী রজকিনী" নাম দিয়া এক "চণ্ডীদাস আশ্রম" তুলিয়া বসিয়াছেন—বৈষ্ণব পদাবলী বা সাধনমার্গ কিছুই জানেন না—চণ্ডীদাসের নামে কোনও সম্প্রদায়ও নাই, তবে তাঁর আখড়ায় "চণ্ডীদাস আর রামী" (অর্থাৎ তিনি স্বয়ং আর তাঁর বষ্টুমী) ইঁহাদের দুইজনকে দেখিবার জন্য ভক্তমণ্ডলীকে বড় সাইনবোর্ড যোগে আহ্বান করিতেছেন। আখড়া বা

আস্তানাটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটু জায়গায়, ইঁটের একটী কুঠরীতে অন্য অন্য দেবতার সঙ্গে নিজের ও নিজের পূর্ব্বকালের (অধুনা গতাসু) একটী বষ্টুমীর মানুষের আকারের রঙচঙে মাটীর মূর্তিও রাখিয়াছেন, ভক্তদের ভক্তির অর্ঘ্য দুই চারি পয়সা থালায় পড়িতেছেও। পাশে বড় একটি খড়ের ঘরে তিনি থাকেন ; রাঙ্‌তা লাগানো উঁচু এক কাঠের সিংহাসনে বসিয়া গম্ভীর ভাবে একতারা বাজাইতেছেন, এক পাশে একটু নীচে কাঠের চৌকীতে বসিয়া তাঁহার রামী (ইনি হইতেছেন Rami III, ইঁহার আগে আর দুইটীকে পর পর বাবাজী পরলোকের দ্বার পর্য্যন্ত পহুঁছাইয়া দিয়াছেন) খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছেন, আর এক পাশে আর দুটী বাবাজী ভক্ত খোল বাজাইয়া দোহারের কাজ করিতেছে—এই অবস্থায় ইঁহাদের দর্শন ঘটিল, সন্ধ্যার দিকে। বেশ picturesque দৃশ্য, খড়ের ঘরের পটভূমিকার উপর। বাবাজী আর তাঁর রামী ও ভক্তদ্বয় সকলেই আলখাল্লা পরা, মাথার লম্বা চুল ঝুঁটী বাঁধা—কৃষ্ণচূড়া করিয়া বাঁধা, পুরুষ কয়টীর লম্বা দাড়ী। ইচ্ছা ছিল, ইহাদের আরও খবর লই, সময়াভাবে হইয়া উঠিল না। ভবিষ্যতে দেখিতে হইবে। রাত্রে ছিল রাধারমণ আশ্রমে (ললিতাদেবীর সমাজবাড়ীতে) শারদ রাসোৎসব। ললিতাদেবীর পরিচয় জানেন, চরণদাস বাবাজীর শিষ্য, সখীভাবে সাধনা করেন, স্ত্রীলোক (ব্রজগোপী) সাজিয়া থাকেন ; সন্ধ্যায় আশ্রমমন্দিরে যাইয়া খানিক ভাগবত কথকতা শুনিলাম, কীর্ত্তন শুনিলাম। রাত্রি দশটার পরে রাধার অভিসার অভিনীত হইবে—মন্দিরের শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহকে বাহিরে বাগানবাড়ীতে আনিয়া একটী কুঞ্জ সৃষ্টি করিয়া সেখানে রাখা হইবে, শ্রীরাধার মূর্তি ও তাঁহার সখীদের মূর্তি শুক্ল অভিসারিকার বেশে সাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণের কাছে আনা হইবে, সঙ্গে কীর্ত্তন চলিবে—বহু রাত্রে কীর্ত্তনের পরে আবার মূর্তিগুলি মন্দিরে যথাস্থানে রাখিতে হইবে—ইহাই হইল অনুষ্ঠান। এই ব্যাপার দেখিতে রাত্রি প্রায় এগারোটায় আবার আশ্রমে আসি। ভীষণ ভীড়, মেয়ে পুরুষ, বাল বৃদ্ধ, বৃদ্ধা তরুণী, ভদ্র ইতর, ভক্ত পাষণ্ড, সাধু ভণ্ড, সচ্চরিত্র লম্পট—সকলে ঠেলাঠেলি করিতেছে। ভীড়, মানুষের গায়ের ঘাম, ধাক্কাধুক্কি, ইত্যাদির মধ্য দিয়া, দূর হইতে কীর্ত্তনের দলের মধ্যে যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্বতঃ-ই "শিব শিব" নাম মুখ দিয়া বাহির হইল ; ললিতাদেবী শ্বেত বা শুক্লাভিসারিকার বেশে, কীর্ত্তন করিতে করিতে বাইজীদের মত "ভাও বাত্‌লানো" ভাবে অঙ্গভঙ্গি করিয়া

নাচিতেছেন,—তাঁহার পরণে সাদা মলমলের ঘাগরা সাড়ী ওড়না, তাহাতে সাদা জরীর পাড়, হাতে গহনা, নাকে বেসর, নথ ও নাকছাবী, প্রৌঢ় বয়সের gross চেহারার পুরুষ, চোখে কাজল, মুখে সকালের কামানো সত্ত্বেও দাড়ীর রেশ—আর গায়ে তিনি শিশি দুই অতি উগ্র গন্ধের এসেন্স ঢালিয়াছেন,—ভীড়ের গন্ধের সঙ্গে মিশিয়া অতি নির্মমভাবে এই কড়া এসেন্সের গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রকে আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল; সঙ্গে আটজন বৈষ্ণব বাবাজী সাদা কাপড়ে মেয়ে সাজিয়া এক একটী সখীর মূর্ত্তি লইয়া উদ্দণ্ড নাচিতেছেন—রাধাকে লইয়া কৃষ্ণের কাছে ইঁহারা যাইতেছেন। গানের পদটী মন্দ নহে—"জয় জয় জয়। কুঞ্জে বিজই॥ বৃকভানু সুকুমারী।"—কিন্তু এতগুলি পুরুষের মেয়ে সাজিয়া ওইভাবে erotic symbolism-এর সমস্ত দ্যোতনার সহিত নৃত্য—এ আমার ভাল লাগিল না। শিব শিব, শঙ্কর মহাদেব,—এ আমার জগৎ নহে,—আমি ব্রাহ্মণ, আমি পুরুষ, আমি জ্ঞানমিশ্র ভক্তি চাই,—এভাবে religious abandon আমার কাছে অত্যন্ত বিসদৃশ লাগে। বৈষ্ণব ভাবের অনেকগুলি অঙ্গ আমায় মুগ্ধ করে, কিন্তু এইভাবে মধুর রসের সাধনা দেখিয়া আমার গা ঘিণ্-ঘিণ্ করিতে থাকে। আর একটা জিনিস দেখিলাম, সে সম্বন্ধে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে—সাধারণ জনসমাজে রসকীর্ত্তন করা। মধুর রসের অন্তরঙ্গ সাধনা হয় তো খুবই গভীর ও আধ্যাত্মিক ব্যাপার, অনেক ভক্ত বৈষ্ণব ইহাতে বাস্তবিকই বিমল আধ্যাত্মিক আনন্দ পান, কিন্তু যেখানে অশিক্ষিত অজ্ঞ জনসাধারণ বসিয়া দুইটী উপদেশের মত কথা, বিনয়-কথা চায়, সেখানে তাহাদের সামনে ঘটা করিয়া আদিরসাশ্রিত আধ্যাত্মিকতার উৎস খুলিয়া দিলে বিপদ ঘটে পদে পদে। যা হোক, ব্যাপারটী দেখিয়া মনে বেশ একটা আঘাত লাগিল, একটা জুগুপ্সার ভাব আসিল, সাবেক কালে শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কেন বৈষ্ণব জনসাধারণকে প্রশ্রয় দিতেন না তাহার একটুখানি ইঙ্গিত পাওয়া গেল। আথেন্স-এর জেউস্ বা হেলিওস্ বা আথেনে দেবতার ভক্ত শিক্ষিত কোনও প্রাচীনযুগের গ্রীকের কাছে, এশিয়া মাইনর হইতে আগত কোনও অ-হেল্লেনীয় দেবতার নারীবেশী ছিন্ন-মুষ্ক পূজকদের উদ্দণ্ড বাদ্য ও নৃত্য দর্শনে কিরূপ জুগুপ্সার ভাব উদয় হইত, তাহার একটা আভাস বারবার মনের মধ্যে যেন আসিতে লাগিল।

শ্রীখণ্ডে গিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আর একটী দিক দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। এই

গ্রামটী অতি প্রাচীন। এই গ্রামের প্রাচীন বৈদ্য জমিদার বংশে চৈতন্যদেবের সময়ে এক ভাই মুকুন্দ ছিলেন নবাব সরকারের কর্ম্মচারী, অন্য ভাই নরহরি ছিলেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, চৈতন্যদেবের পরমভক্ত। নরহরি সরকার ঠাকুর গ্রামের বাহিরে "বড়ডাঙ্গা" (বটগাছ এখানে অনেকগুলি আছে) নামক স্থানে সাধনভজন করিতেন। এখন বৎসর বৎসর অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশীর দিন তিনদিনব্যাপী উৎসব হয়। শ্রীখণ্ড একটী বিখ্যাত বৈষ্ণব কেন্দ্র, উক্ত জমীদার বংশের মুকুন্দের সন্তান প্রায় ৫০ ঘর এখনও বিদ্যমান। একটী টোল আছে, একটী এণ্ট্রান্স স্কুল আছে। বৈদ্য জমীদার বংশের উপাধি রায় বা ঠাকুর। শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর এই বংশের একজন প্রধান—বেশ পণ্ডিত, সজ্জন, বিখ্যাত কীর্ত্তনিয়া। শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ ঠাকুর বড় পণ্ডিত,—ঠিক আমাদের বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মত সরল, উদার, অমায়িক, এবং বৈষ্ণব ও সংস্কৃত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। ইঁহাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়া একটী পরম লাভ। কি অমায়িক ব্যবহার, আর কি বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও সৌজন্য। এখানে আমাদের পুঁথি খোঁজা সার্থক হইল, একখানি প্রাচীন গ্রন্থের পুঁথি খুঁজিতেছিলাম, এখানকার কবি গোপালদাসের লেখা "রসকল্পবল্লী" বলিয়া অলঙ্কার ও প্রাচীন পদাবলীর সংগ্রহের গ্রন্থ, ১৬৬০-১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের রচিত—পাওয়া গেল। ইঁহাদের আগ্রহে ও হৃদ্যতায় বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া গত ৭।৮।৯ই অগ্রহায়ণ বড়ডাঙ্গার উৎসব দেখিতে যাই, দুই রাত্রি উৎসবক্ষেত্রে কাটাই। সে এক অতি চমৎকার অভিজ্ঞতা—পরে সে বিষয়ে লিখিব। শ্রীখণ্ড হইতে সিউড়ী; সিউড়ী থেকে নিকটে বক্রেশ্বরতীর্থে যাই—শিব আর দুর্গার ক্ষেত্র, কতকগুলি hot springs আছে, দ্রষ্টব্য স্থান। সিউড়ীতে লাভপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিথি ছিলাম, তাঁহার সঙ্গে লাভপুরে আসিলাম, সেখান হইতে কীর্ণাহার হইয়া চণ্ডীদাসের ভিটা নান্নুর দেখিয়া আসিলাম। তারপরে বোলপুর লাইনে আমেদপুর ষ্টেশন হইয়া বাড়ী।

ইহাই হইল আমার এবারকার পূজার ভ্রমণ। এই আট দশ দিন ধরিয়া। চণ্ডীদাস সম্পাদন করিতেছি*, নান্নুর ও বাঁকুড়া যাওয়া আবশ্যক। বাঁকুড়া

* সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস-পদাবলী' প্রথম খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে ১৩৪১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। "অবশিষ্ট অংশ" প্রকাশিত হয় নাই।—অ।

বিষ্ণুপুর পোখরনা সোনামুখী—এগুলি মনে করিতেছি বড়দিনের ছুটীতে যাইব। মাঝে বড়ডাঙ্গার মেলাও দেখা হইল। সুতরাং দুঃখ করিবার কিছু নাই।

বাড়ীতে স্ত্রী উপর্য্যুপরি দুইবার পড়িলেন, খুবই ভুগিলেন—inflamation of the glands of the breasts, আনুষঙ্গিক জ্বর। সেজো ভাইয়ের স্ত্রী typhoid ও pneumoniaতে যমে-মানুষে টানাটানি করিয়া বাঁচিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র খুন্নুর typhoid; একটী কন্যার বহু দিন ধরিয়া কানের পুঁজে প্রথমা কন্যা পুঁটুর [সুধা *] মত mastoid abscess হইবার আশঙ্কা ছিল, উপস্থিত ভাল। নীরদ বাবুর [শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী] ভাই জরমানী ফেরত ডাক্তার [ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী], pediatrician (নূতন কথাটী শিখিলাম—অর্থ, ছেলেদের চিকিৎসক)—তিনিও দেখিয়াছিলেন। পুঁজটা উপস্থিত নাই। আর একটি মেয়ে, মুকি [শ্রীমতী রুচি বন্দ্যোপাধ্যায়], জ্বরে কয়দিন শয্যাশায়ী ছিল, উপস্থিত ভাল। এইভাবে সংসার চলিতেছে। ইতিমধ্যে কোনও ক্রমে গৃহারম্ভটী সারিয়া ফেলিলাম. পাঁজি-নির্দ্দিষ্ট ভাল দিন দেখিয়া জমিতে পূজা হোম করা হইল, মঙ্গলেষ্টক স্থাপন হইল, পঞ্চরত্ন পঞ্চশস্য পোতা হইল। এখন নুন-টুন সব হইল, চারিটী পান্তা হইলেই হয়; গৃহারম্ভ হইল, টাকা হইলে এখন বাড়ী তৈয়ারী আরম্ভ করা যায়। ইচ্ছা হয় গরম দুধ জামবাটী করিয়া ফুঁ দিয়া দিয়া খাই—ইচ্ছা আছে, ফুঁও আছে, কেবল দুধ আর বাটী নাই। আমার অবস্থা তাই। বাড়ীর plan, fresco কোথায় হইবে, কোথায় গ্যাসের ষ্টোভ থাকিবে, এই সব লইয়া জল্পনা কল্পনা বাদ-বিতণ্ডা চলিতেছে। কিন্তু টাকা নাই—ধার করিয়া না পাইলে বাড়ীর ভীত্-ই শুরু করা যাইতেছে না। এবার হেড এক্‌জামিনার করিল ইণ্টারমিডিয়েটে—পদোন্নতি, তবে আয়ে প্রায় ৪০০৲ কম; দীনেশবাবু আবার ম্যাট্রিকে বাঙ্গালার হেড এক্‌জামিনারে বহাল হইলেন। রবীন্দ্রনাথ ৯ই নভেম্বর হইতে সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিবেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু [রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র] কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। সজনী 'উপাসনা' পত্রের সম্পাদক হইয়াছেন মাসিক ২০০৲ বেতনে—পত্রিকা-খানি একজন ধনশালী ব্যক্তি লইয়াছেন, তিনি একটী প্রেস করিয়া সংস্কৃত বই

* "সুধা ছিল আমাদের প্রথম সন্তান, সাত বৎসর বয়সে [২২ আগষ্ট ১৯৩০] ম্যাষ্টয়েড অ্যাবসেস্-এ (কানের পাশে হাড়ের মধ্যে ফোড়া) বহু কষ্ট পেয়ে মারা যায়।" (দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ', প্রকাশ ভবন, কলিকতা-১২, ১৯৬৪, পৃঃ ৬৬০, পাদটীকা।)—অ।

মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত ছাপাইতেছেন, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মহাভারতের ন্যায় রামায়ণের একটী অনুরূপ সংস্করণের ভার লইয়াছেন। উপাসনার নূতন নামকরণ হইবে "বঙ্গশ্রী"। সজনীর পূরা হাত থাকিবে, "শনিবারের চিঠি" চালাইবারও অধিকার থাকিবে। আশা হয়, ঐ পত্রিকাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মমতের অনুকূল একটী সাহিত্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিবে।

চুটকী খবর ঢের আছে, ভাল, মন্দ, হাস্যকর, করুণ। সব লেখার স্থানাভাব, সময়াভাব। আমি শারীরিক ভালই আছি। আপনি কেমন আছেন। Downhearted থাকিবেন না,—কর্ম্মবাদী হিন্দুর কাছে সব suffering-এর অর্থ আছে। আরব্ধ গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করুন। আপনার Grammar of Noakhali Dialect—University Press-এ ছাপা হইতেছে, সমস্তটীর তিনটী প্রুফ আমি দেখিয়া দিয়াছি, প্রথম ফর্ম্মার print order কাল দিলাম। মাস দুই আরও লাগিবে সবটার ছাপা সম্পূর্ণ হইতে। ৫০ খানি off-print-এর ব্যবস্থা করিতেছি। একেবারে তৈয়ারী প্রবন্ধ পাঠাইব। আপনি notes সংগ্রহ করিয়া যান। চিঠিপত্র না পাইলে দুঃখিত হইবেন না,—আমার কাজ ও বাজে ঝঞ্চাট ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে—কিন্তু চিঠি লিখিবার সময় পাই বা না পাই, প্রত্যেক দিন আপনাকে স্মরণ করি। আপনি ছাড়া পাইয়া আপনার প্রবৃত্তির অনুকূল গৃহীত গবেষণার কাজে আবার লাগিয়া গিয়া দেশের সেবা করুন, ইহাই অহরহঃ ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতেছি। চোখের সংবাদে উদ্বিগ্ন আছি—বাড়ীতে কাহাকেও বলি নাই, সে সম্বন্ধে লিখিবেন। এক কথায়, শরীর সম্বন্ধে সাবধানে থাকিবেন। বাড়ীর সংবাদ নিয়মিত পাইতেছেন তো? সেদিন সাধুর* সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম—সব সংবাদ ভাল। শুভাশীর্ব্বাদ জানিবেন। ইতি ১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯। শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসুনীতিকুমার।

[চার পৃষ্ঠার এই চিঠির শেষে চতুর্থ, দ্বিতীয় আর প্রথম পৃষ্ঠার মার্জিনে কয়েকটি অতিরিক্ত বাক্য লেখা আছে। সেই বাক্যগুলি চিঠির শেষে তুলে দিচ্ছি।—অ]

[চতুর্থ পৃষ্ঠার বাঁ দিকের মার্জিনে—]

অস্পৃশ্যতা আন্দোলন কংগ্রেসের বাবুরা যে ভাবে করিতেছেন তাহাতে দেশের

* গোপালবাবুর অগ্রজ, জেঠুতো ভাই, প্রফুল্ল হালদার। (গোপালবাবুর আর এক জেঠুতো ভাই, তাঁর "দাদা", বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙ্গীন হালদার।)—অ।

cultureটা নষ্ট হইবে আশঙ্কা করি—পরের চিঠিতে এ বিষয়ে আপনাকে লিখিব।

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার বাঁ দিকের মার্জিনে—]

কলিকাতায় খুব জোরে "চিত্রা" সিনেমায় 'চণ্ডীদাস' (সবাক্ ফিল্ম) চলিতেছে। "দ্বাদশ গৌরবময় সপ্তাহ"। অতি বাজে wretched film. অথচ যে ভাবে গড্ডলিকা-প্রবাহ চলিতেছে তাহাতে দেশের culture-এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত হতাশ হইতে হয়। "বারান্তরে আলোচ্য"।

[প্রথম পৃষ্ঠার বাঁ দিকের মার্জিনে—]

শীত কেমন? কলিকাতায় বেশ শীত আজ দুই তিন [দিন] হইল পড়িয়াছে।

[প্রথম পৃষ্ঠার শিরোদেশে—]

রীসার্চের কাজের যাহা যাহা তৈয়ারী হইয়াছে পাঠাইবেন। বইগুলি যাহা লইয়াছিলেন পড়িয়া উঠিতে পারিলেন? রামায়ণ, হোমার?

শ্রীসুনীতি।

SUNITI KUMAR CHATTERJI

CENSORED AND PASSED
Commandant
Buxa Detention Camp

CALCUTTA
3, Sukias Row, P. O. Beadon St.
February 24, 1933.

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার জানুয়ারীর চিঠি যথাসময়ে পাইয়াছি, কিন্তু যেন বরাবরই হইয়া থাকে, আজ লিখি কাল লিখি করিয়া উত্তর দেওয়া হয় নাই। কাল আপনার একখানি পত্র পাইলাম, তাহাতে কিন্তু $30\frac{2}{33}$- তারিখ দিয়াছেন। ৩০শে জানুয়ারীর নয় তো? যাহা হউক, এবার আর দেরী না করিয়া পত্র লিখিতে বসিতেছি। আপনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা, ও সেইসঙ্গে আমার কতক-গুলি প্রবন্ধের off-print হয় আজ না হয় কাল ডাকযোগে যাইবে। আপনার কাছে কত দিনে পহুঁছাইবে জানি না। আপনি আশা করি মোটামুটি শারীরিক কুশলে আছেন। মানসিক অবসাদটুকু যাহাতে না আসে। আমি

খালি ভাষাতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে বলি না। বড় বড় খানকতক বই তো সঙ্গে আছে, সেইগুলি আদ্যন্ত পড়িয়া ফেলিবার এই এক সুযোগ। atmosphere of pure study আমাদের কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? আমার নিজের বাড়ীতেও ঠাসাঠাসি গাদাগাদির মধ্যে নানা রকম ক্ষুদ্র পারিবারিক অশান্তির মধ্যে ঐ atmosphere আছে একথা আমি বলিতে সাহস করি না। আপনার মধ্যে যে শক্তি আছে তাহার দ্বারা কাজ হইবেই—বড় জিনিস আপনি দিয়া যাইতে পারিবেন। আপনার মুদ্রিত প্রবন্ধ ও গবেষণাতে তাহার আভাস আছে। কিন্তু খালি ভাষাতত্ত্ব তো নয়। সাহিত্যক্ষেত্রে আপনি কিছু নিশ্চয়ই দিবেন। সেটা গবেষণার চেয়েও বড় কথা। আপনি যে লিখিয়াছেন—"আমার মনের সরসতা ও স্বচ্ছন্দতা একটুও নষ্ট হয় নাই।" এই তো চাই—আপনি বিশেষ আনন্দের কথা শুনাইয়াছেন।

আপনার চিঠির প্রশ্ন বা আলোচনাগুলি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া তাহার পরে অন্য বিষয়ের উল্লেখ করিব। সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায় প্রকাশিত অমূল্য বাবুর "বাঙ্গালা ছন্দের মূলসূত্র" প্রবন্ধটী আমার মতে বাঙ্গালা ছন্দ সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত আলোচনা।* সম্প্রতি পণ্ডিচেরী হইতে শ্রীমান্ দিলীপ রায় "বিচিত্রা" পত্রে এই প্রবন্ধের খুঁত ধরিয়াছেন, ইহাকে "ন-স্যাৎ" করিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সে সমালোচনা পড়িবার ধৈর্য্য আমার ছিল না, তিনি যদি কিছু কাজের কথা বলিয়া থাকেন, অমূল্য বাবু স্বয়ংই তাহার খণ্ডন বা মণ্ডন করিবেন। আপনার প্রথম জিজ্ঞাস্য—(১) Initial strees-এ স্বর দীর্ঘীকৃত হয় কিনা। আমার প্রথম প্রথম ধারণা ছিল যে স্বর দীর্ঘীকৃত হয়। কিন্তু লণ্ডনে Experimental Phonetics বিভাগে আমার উচ্চারিত "রামা, রাধা, দাদা", প্রভৃতি শব্দের চিত্রলিপি গ্রহণ করিয়া হিসাব করিয়া দেখিয়া, স্বরাঘাত সত্ত্বেও 'রাধা' ও 'রামা'র 'রা' বা 'দাদা'-শব্দের প্রথম 'দা'-অক্ষরটী, দ্বিতীয় অক্ষরের চেয়ে হ্রস্ব,—বেশী নয়, অল্প হ্রস্ব। শেষ অক্ষরটীই দীর্ঘতর। আমার ধারণা যে ভুল তাহা

---

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের "বাংলা ছন্দের মূলসূত্র" বাঙলা ১৩৩৯ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হয়, পরে ঐ বৎসরই পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়। তার পর থেকে, পরিবর্ধিত আকারে, বইখানির বহু সংস্করণ এযাবৎ প্রকাশিত হ'য়েছে (প্রকাশক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।—অ।

যন্ত্রসাহায্যে প্রমাণিত হইল। স্বরাঘাত থাকিলে স্বরটী পূর্ণরূপে উচ্চারিত হয়—ব্যস্, এই পর্য্যন্ত ; স্বরধ্বনির দীর্ঘ হইবার আবশ্যকতা নাই। ঢাকা ও অন্যান্য পূর্ব্ববঙ্গীয় জেলার কথায় স্বরাঘাত উপান্তেই পড়ে বলিয়া বিশ্বাস। কিন্তু এ বিষয়ে ও প্রাদেশিক Intonation বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান এতাবৎ হয় নাই। "চলিত ভাষা"র Intonation লইয়া আমার Bengali Phoneic Reader-এ [University of London Press, London, 1928] অল্পকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। যে পথে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে সে পথের কিছু সন্ধান মিলিবে Palmer-এর Spoken English-এর মত বইয়ে—যদি বলেন তো ঐ বইখানি পাঠাইয়া দিই। দীর্ঘত্ব স্বরাঘাত-জনিত নহে ; স্বরাঘাতের প্রভাবের ফল মোটামুটি বিদিত। প্রাদেশিক বাঙ্গালা ভাষায় ও চলিত ভাষায় স্বরাঘাতের কার্য্যকলাপ অবস্থান ইত্যাদি ভালো করিয়া আলোচনা করিবার বস্তু। উপস্থিত এ বিষয়ে হাত দিতে সাহস হইতেছে না, কারণ নানা কাজে সময় যাইতেছে, আত্মসমাহিত হইয়া বসিতে পারিতেছি না।

(২) Noakhali Vocabulary এখন পাঠাইবেন না, পরে লইব। Grammar of the Noakhali Dialect শেষ প্রুফ দেখিয়া দিয়াছি, ছাপা হইলেই পাঠাইয়া দিব।* Phonetic Sketch of the Noakhali Dialect-এর off-print বোধ হয় ইউনিভার্সিটীতে পাইব না, খোঁজ করিয়া দেখিব, পরে পাঠাইয়া দিব।† বিদ্যাপতি ও গোপীচাঁদ বোধ হয় যেন ইউনিভার্সিটীতেই দিয়াছি, এ বিষয়েও তত্ত্ব লইয়া লিখিতেছি।‡

---

* *A Skeleton Grammar of the Noakhali Dialect of Bengal* by Gopal Haldar, Journal of the Department of Letters, Calcutta University, Vol. XXIII, 1933, pp. 1-38.—অ।

† *A Brief Phonetic Sketch of the Noakhali Dialect of South-Eastern Bengali* by Gopal Haldar, Journal of the Department of Letters, Calcutta University, Vol. XIX, 1929, pp. 1-40.—অ।

‡ শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের গবেষণামূলক নিবন্ধ *Gopichand Legend* ১৯৩০ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ নিখিল-ভারত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌ সম্মেলনে (All-India Oriental Conference) পঠিত হয়, প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে ঐ সম্মেলনের কার্য্যবিবরণীতে (Proceedings and Transactions of the Sixth All-India Oriental Conference)। সুনীতিকুমারের প্রেরণায় আর পরিচালনায় বাঙলা ভাষা আর বাঙালী সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর গবেষণার (অসমাপ্ত

(৩) আপনার দাদার সম্ভাব্য বিবাহ সম্বন্ধে আপনি লিখিয়াছেন। আপনার দাদাকে নানা বিষয়ে ঠাট্টা করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে আমার একটী গভীর শ্রদ্ধা ও হিতৈষণা আছে, শুভ অবসর পাইলে তাঁহাকে সংসারী করাইতে আমার চেষ্টার ত্রুটী হইবে না।

"বঙ্গশ্রী" মোটের উপর আমার ভালই লাগিয়াছে। কতকটা deliberately কাগজখানিকে bright করা হয় নাই। যেখানে লেখকের একান্ত অভাব, সেখানে নূতনত্ব করা বিশেষ কঠিন। যাহা হউক, আমার বিশ্বাস কাগজখানি ভালই দাঁড়াইবে। আপনার লেখা দেওয়া যদি নিষিদ্ধ না হয়, সাহিত্য বা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু লেখা দিন না কেন? ছোট গল্প তো লিখিয়াছেন—তাহাও দিতে পারেন।

বাড়ীর সমস্ত কুশল। বাবা ভাল আছেন। সেজো ভাই সুজ্যোতি ঢাকায় কিছু কালের জন্য বদলী হইয়াছে, সে এখন সপরিবারে সেখানে। ছোট ভাই বাসন্তী অজীর্ণ রোগে বড়ই ভুগিতেছে। ছেলেরা সকলেই নানা রকম পীড়ায় অল্প বিস্তর কষ্ট পাইয়াছে, উপস্থিত সকলেই ভাল। নীরদ বাবুর ভ্রাতা ডাক্তার ক্ষীরোদ বাবু যিনি জারমানী হইতে শিশুচিকিৎসায় পারদর্শী হইয়া আসিয়াছেন তাঁহার চিকিৎসায় আমার ছেলেপিলেদের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

নীরদ বাবু মাঝে বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন ভাল হইয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালীত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধ ফাল্গুনের বঙ্গশ্রীতে দেখিবেন। আশ্চর্য্যের কথা, ঢাকায় মোহিতবাবু নীরদের বাঙ্গালীত্ব সম্বন্ধে অভিমত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই স্বীকার করিয়াছেন।

একটা গভীর পরিতাপের সংবাদ খবরের কাগজের মারফত নিশ্চয়ই আপনার গোচরে আসিয়াছে—আমাদের রবীন্দ্র মৈত্র আর নার নাই। আজ কয় দিন হইল রঙ্গপুরে গিয়া হঠাৎ একদিনের malignant malaria-য় প্রাণ দিয়াছে। সন্দেহ হয়, suppressed small-pox হইয়াছিল। বাঙ্গালীর জীবনে বঙ্গসাহিত্যে রবির এই অকালমৃত্যু কি পরিমাণ হানি করিয়া গেল অনুমান করিতে পারেন। রবির চরিত্রমাধুর্য্য ব্যক্তিত্ব বন্ধুত্ব লেখনীশক্তি

গবেষণার) কথা গোপালবাবু লিখেছেন তাঁর সদ্য-প্রকাশিত 'রূপনারাণের কূলে'-র দ্বিতীয় খণ্ডে (পুঁথিপত্র, ৯ অ্যাণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৯, এপ্রিল ১৯৭৮, পৃঃ ১৮৮-২১৮)। —অ।

সমস্তই আমাদের কাছে বিশেষ গর্ব্বের ও গৌরবের বস্তু ছিল। আমরা সকলেই বিশেষভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। শনিবারের চিঠির একখানি রবীন্দ্র মৈত্র সংখ্যা বাহির করিবার কথা হইতেছে—তাহাতে কেবল রবি সম্বন্ধে কথা থাকিবে, তাহার লেখা প্রবন্ধ কবিতা আদি যাহা পাওয়া যায় তাহাও বাহির হইবে।*

কিছু দিন পূর্ব্বে আপনার মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে সংবাদ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আবার দুই চারি দিনের মধ্যে একবার যাইব। তিনি ও আপনার ভ্রাতৃদ্বয় ভালই আছেন। রঙ্গীন বাবুর চিঠি পান?

আমার কাজ বিশেষ অগ্রসর হইতেছে না। নূতন বাড়ীতে—তাহা ভাড়া করা বাড়ীই হউক অথবা তৈয়ারী বাড়ী—তাহাতে না গেলে কাজ করা কঠিন। অথচ ভাড়া বাড়ীতে যাওয়ার অন্তরায় বুঝি, এবং নূতন বাড়ী করিবার টাকা জোটানো মুস্কিল। এদিকে বাড়ীতে ভীষণ স্থানাভাব। আমাকে ছাড়িবেও না, কিছু করিতে দিবেও না। আমার যত বই স্তূপাকারে জমা হইয়া আছে,—ব্যবহার করিবার, বই বাহির করিয়া রাখিবার স্থান নাই।

শীঘ্রই ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার কাগজ আসিতে আরম্ভ করিবে—এবার আমায় ইণ্টারমিডিয়েটে পরীক্ষায় বাঙ্গালার হেড এগ্‌জামিনার করিয়াছে। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তিন বৎসর পরে আবার তিনি ম্যাট্রিকের হেড-এগ্‌জামিনার হইলেন। আমার পদবৃদ্ধি, কিন্তু প্রায় ৪০০৲ আয়ের হ্রাস। (এ সংবাদ ইতিপূর্ব্বে কি আপনাকে দিয়াছি?) এবার নাকি ২২,০০০ ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতেছে, ইণ্টারে ৮,০০০। পতঙ্গের দল বহ্নিতে ঝাঁপ দিতে আসিতেছে। ভদ্রলোকের ছেলের কি আর উপায় নাই?

আমি জানুয়ারীর ২৬শে হইতে দিন দশেক বাঁকুড়া জেলায় কতকগুলি স্থান দেখিয়া আসিলাম। চণ্ডীদাস বাঁকুড়া ছাতনার লোক, এই মত প্রচারিত হইয়াছিল, রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি ও শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা ১৩৩৩ সালের প্রবাসীতে এ বিষয়ে লিখিয়াছিলেন। নান্নুর দেখিয়া আসিয়াছি,

* দ্রষ্টব্য 'শনিবারের চিঠি', ফাল্গুন ১৩৩৯। এই সংখ্যাতে সুনীতিকুমারের লেখা "রবি মৈত্র" প্রবন্ধটি ছাপা হয়। প্রবন্ধটি তাঁর 'মনীষী স্মরণে' প্রবন্ধ-সংগ্রহে পুনর্মুদ্রিত হ'য়েছে।—অ।

ছাতনা যাওয়াও অবশ্য কর্ত্তব্য, নহিলে চণ্ডীদাস পদাবলী সম্পাদনের কার্য্য যাহা আমরা হাতে লইয়াছি তাহা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু সঙ্গে ছিলেন। আমরা দুই দিন বিষ্ণুপুরে তিন দিন বাঁকুড়ায় (মধ্যে একদিন ছাতনায় ও নিকটের একটী গ্রামে এবং শুশুনিয়া পাহাড়ে) ও পরে সোনামুখী ও পোখরণা এই দুইটী স্থানে থাকিয়া, পুঁথির খোঁজ করিয়া আসিয়াছি। হরেকৃষ্ণ বাবু আরও দুই চারিটী স্থানে গিয়াছিলেন। পোখরণা সম্বন্ধে ক্ষুদ্র একটী পরিচয় ফাল্গুনের বঙ্গশ্রীতে দিয়াছি।*

গাঁয়ে গাঁয়ে এইরূপে ঘুরিতে আমার বেশ লাগে। কিন্তু একটা বিপদ আমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িতেছে, ভদ্রলোক বা শিক্ষিত লোকের সঙ্গে পরিচয় হইলেই, হয় স্থানীয় ক্লাবে বা লাইব্রেরীতে নয় ইস্কুলে বক্তৃতা দাও, না হয় ফিরিয়া গিয়া স্থানের সম্বন্ধে কিছু লেখা চাই। দেশে বহু স্থানে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রাচীন কীর্ত্তি প্রচুর, এবং সে সম্বন্ধে লেখা বা সেগুলির সম্বন্ধে দেশের লোককে সচেত করিয়া দেওয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য, এই কার্য্য করিতে সমর্থ হইলে। বিষ্ণুপুর খুব চমৎকার লাগিল। খ্রীষ্টীয় ১৬/১৭/১৮ শতক, এই সময়েই বিষ্ণুপুরের উন্নতি। এই সময়ের পাথরের গড়, ১২।১৪টী চমৎকার মন্দির, ইহা ভিন্ন স্থানীয় শিল্প—রেশমের কাপড়, শাঁখের কাজ (ঢাকার দস্তুরমত rival—শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, ঢাকাই শাঁখের চুড়ির মহাজন বিষ্ণুপুরে আসিয়া এখানকার কারিগরদের দ্বারায় কাজ করাইয়া লইয়া কলিকাতায় ও অন্যত্র বিক্রয় করে), পিতলকাঁসার কাজ, তামাক—শহরটিকে একটী শিল্পের আভিজাত্য দিয়াছে। আর বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত ; ধ্রূপদ খেয়াল পাখোয়াজ বীণ স্বরোদ সেতার এসরাজ—এ সবে আধুনিক বাঙ্গালার সঙ্গীতের নেতা হইতেছে বিষ্ণুপুর। এহেন শহরও এখন dwindling moribund. ম্যালেরিয়া একটা প্রধান কারণ। ভ্রমণকাহিনী ভবিষ্যতে লিখিব।

আপনি আজকাল কি পড়িতেছেন—বড় বই ? আমি Burton's Arabian Nights একটু একটু পড়িতেছি। A great book, this *Alf Layla wa Layla* (Thousand Nights and a Night)—তবে mundane বই ; আরব সভ্যতা নিজেকে উজাড় করিয়া এই বইয়ে ঢালিয়াছে—খ্রীষ্টীয় ৮০০ হইতে ১৫০০ পর্য্যন্ত এই সাতশ বৎসরের মধ্যে যে culture, ইরাকে সিরিয়ায়

* 'প্রাচীন বঙ্গের পুষ্করণা জনপদ', বঙ্গশ্রী, ফাল্গুন ১৩৩৯, পৃঃ ১৩৫-৩৬। —অ।

ও মিসরে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার চমৎকার একটা চিত্র এই বইয়ে। আর একখানা বই উপস্থিত নাড়াচাড়া করি—হোমারের অডিসী। এই সব পুরাতন জিনিস লইয়াই দিন গেল।

আপনি Romain Rolland-এর রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনী পড়িয়াছেন? অতি অপূর্ব্ব বই, যদি বলেন তো পাঠাইয়া দেই। Rolland-র বিবেকানন্দের জীবনী আরও সুন্দর বই, আমি ঐ বই এখনও পড়ি নাই, তবে সজনী ঐ বইয়ে এখন মশগুল হইয়া আছে।

আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণের নকল এখনও শেষ হইল না। তবে সিকি আন্দাজ শেষ করিয়া আনিয়াছি। বাকীটুকু কবে ছাপাখানায় দিবার অবস্থায় আনিতে পারিব জানি না।*

সুকুমার বাবু [অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন] বেশ কাজ করিতেছেন, বৈষ্ণব সাহিত্য লইয়া। প্রবোধবাবু [অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ১৮৯৮-১৯৫৬] প্রাচীন ভারতের আর্য্য ও অনার্য্য যুগ লইয়া খুব মূল্যবান্ suggestion কতকগুলি দিয়া গুটী দুই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এগুলি Indian Historical Quarterly-তে বাহির হইবে।† একটা চিন্তা আমার মাথায় কয় মাস হইতে ঘুরিতেছে। Polyglottism in Ancient India. ফারসী ভাষা এদেশে আসায় আমরা বলি "হাট-বাজার, লোক-লস্কর, রাজা-বাদশা, ধন-দৌলত" ইত্যাদি; ইংরেজীর আগমনে—"বাক্স-পেঁটরা"। সমার্থক দুইটা শব্দ দুই বিভিন্ন ভাষা হইতে মিলাইয়া একটী শব্দ। প্রাচীন ভারতেও ছিল। যথা—"কার্ষা-পণ" ("কার্ষা"—প্রাচীন পারসীক "কর্ষ"+ভারতীয় austric-মূল "পণ", দুইয়ের অর্থ কোনও রকম reckoning of value); "গচ্ছপিণ্ড" (>গাছ+হিন্দী পেঁড়—tree), ইত্যাদি। কতকগুলি সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ পাইতেছি যাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীন ভারতে একাধিক ভাষা জনসমাজে প্রচলিত ছিল—আমাদের উত্তর ভারতে; এবং অনার্য্য (কোল, দ্রাবিড়)+আর্য্য, আর্য্য+অনার্য্য, ভারতীয়+বিদেশীয় প্রভৃতি নানাভাবে সমার্থক শব্দ মিলাইয়া সৃষ্ট সমস্তপদ আজকালকার মতই ব্যবহৃত হইত। এখন সে সব শব্দ বহুশঃ মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। ইহাদ্বারা প্রমাণ হয় যে যীশু

* 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ, ১৯৩৯। —অ।

† দ্রষ্টব্য *Indian Historical Quarterly*, Vol IX, 1933, pp. 253-65.—অ।

খ্রীষ্টের যুগের এদিক পর্য্যন্তও উত্তর ভারতে অনার্য্য ভাষারও বহুল প্রচার ছিল।*

কাজের তাড়া—বা আলস্য—এবং সময়াভাব ছাড়া আপনাকে চিঠি দিবার আর কোনও বাধা নাই। চিঠি লেখায়—বিশেষতঃ উত্তর দানে আমার গাফিলী আমার বন্ধুরা সকলেই জানেন। তবে যখন লিখি, চিঠি বড়ই হইয়া পড়ে। যাহা হউক, আপনার সমস্ত কুশল একান্ত প্রার্থনীয়। পত্র দিবেন—সময়মত। ইতি ১২।১১।৩৯। শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

॥ শ্রীঃ ॥

D. O. No.........

CENSORED AND PASSED

D.I.G., I.B., C.I.D , BENGAL [?]

Councils of Post-Graduate Teaching in Arts and Science

Asutosh Building

Calcutta

শ্রীপঞ্চমী (সরস্বতী পূজা)

১৩৪২।

প্রিয়বরেষু,

আপনার ৮।১০।১৯৩৫-এর সুদীর্ঘ পত্র, এবং তৎপরে লিখিত পোষ্টকার্ড উভয়ই যথাসময়ে পাইয়াছি। ছোট একখানি পোষ্টকার্ড মাঝে লিখিয়াছিলাম, আপনার পোষ্টকার্ড পাইবার পূর্ব্বে, খুব সম্ভব সে পোষ্টকার্ড আপনি পান নাই। আগে আপনার এম্-এ পরীক্ষার কথাটা কহিয়া লই। আপনার পত্রপাঠে

* ১৯৩৩ সালের ২৭-২৯ ডিসেম্বরে বড়োদায় অনুষ্ঠিত সপ্তম নিখিল-ভারত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ সম্মেলনে (All-India Oriental Conference) বাক্‌তত্ত্ব ও ব্যাকরণ বিভাগের অধিবেশনে সুনীতিকুমার Polyglottism in Indo-Aryan বিষয়ে একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। এই নিবন্ধটি তাঁর *Indo-Aryan and Hindi* বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৬০) দ্বিতীয় পরিশিষ্ট রূপে মুদ্রিত হয় (পৃঃ ২৮৮-৩০৩)।—অ।

বুঝিলাম, Ancient Indian History and Culture-এর প্রতি আপনার মমতা বেশী হইলেও, উপস্থিত General History-র জন্যই আপনি প্রস্তুত হইতে চাহেন, ১৯৩৭ সালে পরীক্ষা দিবার জন্য। আমি এই মতের পূর্ণ অনুমোদন করি। এখন কি কি গ্রূপ লইবেন, একটু স্থির করিয়া লইয়া আমায় জানাইলে, আমি ইতিহাসের অধ্যাপকদের কাছে উপদেশ লইব (ইতিমধ্যেই দুই চারি জনের সঙ্গে আমি কথা কহিয়াছি), কোন্ কোন্ বই অবশ্যপঠিতব্য। নোটও সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিব—তবে আজকালকার ছেলেরা অধ্যাপকের মুখে শুনিয়া যে নোট লিখিয়া লয় তাহার দ্বারা কোনও কাজ হয় কি না জানি না—সাধারণতঃ এই সকল নোট এত ভুলে ভরা থাকে যে সে নোট পাঠ করা মানে নষ্টকোষ্ঠি উদ্ধার করা। আপনার সমস্ত শুভানুধ্যায়ী সুহৃৎ ও আত্মীয় আবার এই নূতন করিয়া এম্-এ পরীক্ষা দেওয়ার সংকল্পে আনন্দিত হইবেন। আপনি পরীক্ষা দিবার জন্য নিশ্চয়ই প্রস্তুত হইতে থাকুন। আপনার উত্তর পাইলে, বিভিন্ন group সম্বন্ধে আমি সন্ধান লইয়া bibliographical মন্তব্য পাঠাইব।

বিলাতে [ব্রিটেনে আর ইউরোপের অন্য কয়েকটি দেশে] এবার মাত্র দুই মাস সাত দিন ছিলাম—বোম্বাই-ভেনিস ও ভেনিস-বোম্বাই জাহাজে ২০।২১ দিন কাটানো ছাড়া। Self-confidence লইয়া ফিরিয়াছি, ইহা দেখিয়া,—যে, ইউরোপের প্রায় সমস্ত কেন্দ্রে, যেখানেই ভারতীয় আধুনিক ভাষায় একটুখানি চর্চা আছে, সেখানেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সম্মানের সহিত উল্লিখিত হয়। আমার কাজের সঙ্গে অনেকে পরিচিত—তাহা অবশ্য আমার পক্ষে আনন্দের কথা—কিন্তু আরও বেশী আনন্দের কথা, সুকুমার, আপনি, মনোমোহন ঘোষ,—আপনাদেরও অনেকে চেনে, আপনাদের গবেষণার আদর করে। বের্লিন-এ ভাগনর, পারিসে ব্লক, লণ্ডনে টার্নার—ইঁহারা প্রশংসার সহিত সুকুমার ও আপনার গবেষণার উল্লেখ করিয়াছেন। "কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর"—আপনি মুক্তি পাইয়া আবার পূর্ণ উৎসাহে কাজে নামিবেন, আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করিবেন, আমরা এই আশায়ই আছি। ইউরোপে অনেকগুলি সমব্যবসায়ীর সঙ্গে, সাধারণ শিক্ষিত বহু লোকের সঙ্গে আলাপ করিলাম। দেখিলাম, আলোচনাশক্তিতে, সমীক্ষায়, বৈদগ্ধ্যে,

বুদ্ধিমত্তায়, আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষাসম্পন্ন যুবক যাহারা, তাহাদের অন্য জাতির প্রথম শ্রেণীর যুবকদের কাছে অবনতমস্তক হইবার তেমন কোনও কারণ নাই। ইহাও জাতির দিক হইতে self-confidence লইয়া ফিরিবার আর একটা কারণ। পথেঘাটে, পথচলতি লোকেদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের ধরণ ধারণ দেখিয়া, ইউরোপের জনসাধারণ সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব লইয়া ফিরিয়া আসা সম্ভব হইল না। জার্মানী ও ইটালীতে মনে হয় স্বাধীনচিন্তা-শক্তিযুক্ত মানুষ নাই—অন্ততঃ স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণের কোনও অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয় না। রুষদেশের অবস্থা মনে হয় আরও শোচনীয়। বড় বড় democratic কথার আড়ালে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে নূতন পোষাকে সেই পুরাতন czarism চলিতেছে—বাহির হইতে খুঁটিনাটী দুই চারিটী কথার আড়ালে এইটীই মনে হয়। আমি সমস্ত কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাগজে লিখিব—দ্বীপময় ভারত ভ্রমণের মত করিয়া। "প্রবাসী"তে দুই বার দুইটী প্রসঙ্গ বাহির হইয়া গিয়াছে—কিন্তু কয় মাস ধরিয়া বন্ধ আছে—একটী মহিলার ইউরোপ ভ্রমণের কথা বাহির হইতেছে। কেদারবাবু বলিয়াছেন আগামী বৈশাখ হইতে আমার জন্য "প্রবাসী"তে একটু করিয়া স্থান করিয়া দিবেন। দুইটী প্রসঙ্গ অমুদ্রিত অবস্থায় উঁহাদের আপিসে জমা আছে—ভেনিস পর্য্যন্ত পঁহুছানোর কথা ও ভেনিস হইতে ভিয়েনার পথের কথা, এবং ভিয়েনায় Freud-এর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা। Freud-এর সঙ্গে আধ ঘণ্টা ধরিয়া চমৎকার interview হইয়াছিল—আমি তাহার সব কথাই লিখিয়াছি—রথীনবাবু পড়িয়া খুব খুশী হইয়াছেন (অবশ্য আমার সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব তাঁহার খুবই আছে)। ভিয়েনা ও বুদাপেশৎ এবং প্রাগ ও বেলিনের কথা সব খুঁটিনাটীর সঙ্গে লিখিব। তবে দেখিতেছি শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।*

---

* ১৯৩৫ সালে তাঁর ইউরোপ-ভ্রমণের বিবরণ সুনীতিকুমার "পশ্চিমের যাত্রী" নাম দিয়ে লেখেন, এর প্রথম দুই কিস্তি ১৩৪২ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী' পত্রিকার শ্রাবণ আর ভাদ্র সংখ্যায় ছাপা হয়। আশ্বিন থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত 'প্রবাসী'র সাত সংখ্যায় সুনীতিকুমারের "পশ্চিমের যাত্রী" ছাপা বন্ধ থাকে, তার জায়গায় ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসুর কন্যা দুর্গাবতী ঘোষের "পশ্চিমযাত্রিকী" ছাপা হয়। পরের বছরে (১৩৪৩) 'প্রবাসী'র বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সুনীতিকুমারের "পশ্চিমের যাত্রী"র পরবর্তী দুই কিস্তি ছাপা হয় (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় থাকে ভিয়েনায় অধ্যাপক ফ্রয়েড-এর সঙ্গে সুনীতিকুমারের সাক্ষাৎকারের কথা)। "পশ্চিমের যাত্রী"র পরবর্তী কিস্তিগুলি

ব্যক্তিগত ও আমাদের ভাষাতত্ত্বগোষ্ঠীগত আশা ও আত্মবিশ্বাস লইয়া ফিরিয়া আসিলেও, মোটের উপরে সমগ্র জাতি সম্বন্ধে বাহির হইতে আশার কথা কিছুই লইয়া আসিতে পারি নাই, বরঞ্চ দেশে দিন দিন যাহা দেখিতেছি তাহাতে আরও pessimistic হইয়া পড়িতেছি। অবশ্য বাহিরেও আশার কিছু দেখিলাম না—এমন কিছু অন্যত্র দেখিলাম না যাহার জন্য মনে মনে একটা হিংসা হয়। সর্বত্র এক ভাব—কি করিয়া অপরকে দাবাইয়া নিজের সুবিধা করিয়া লইব। ভবিষ্যৎ culture of humanity সম্বন্ধে আমার বড় আশা নাই। একধর্ম্মরাজ্যপাশে (ধর্ম্ম অর্থে culture) সমগ্র মানবজাতিকে বাঁধিবার স্বপ্ন যাঁহারা দেখেন, তাঁহাদের কল্পনাশক্তি অসাধারণ। তবে আমার মনে—বয়সের দোষে বোধ হয়—বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে নিহিত সৎ, চিৎ ও আনন্দময় সত্তার উপর বিশ্বাস আসিতেছে, তাই মানবজাতির বিশেষতঃ ভারতীয় মানবের, হিন্দু মানবের, বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের এই বিষম আপৎ-কালেও একটা stoicism born of faith আসিতেছে, তাহারই প্রসাদে এই ভাব মনে জাগে—

যং লব্ধ্বা চাঽপরং লাভং মন্যতে নাঽধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাঽপি বিচাল্যতে ॥

(যে জিনিস পাইলে অন্য লাভকে তাহার চেয়ে বেশী বলিয়া মনে হয় না, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে গুরু দুঃখেও মানুষকে টলায় না।) যাত্রীসহ জাহাজ ডুবিতেছে, ভূমিকম্পে নগরকে নগর ধ্বংস হইতেছে—আমি আমার একার জন্য অথবা আমার পরিবারবর্গের জন্য ক্ষোভ করি কোন্ লজ্জায়?

কিন্তু pessimism আসিলেও হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে চাহি না। যথাসাধ্য কার্য্য করিয়া যাইতে চাই। এই কাজের মধ্যেই আনন্দ, ইহার মধ্যেই মানবজীবনের সার্থকতা, এই কাজের দ্বারাই আমরা in tune with Infinity থাকিতে পারিব। কথাটা গীতার কর্ম্মবাদের মত শুনায়; কিন্তু মানুষের পক্ষে এমন বলদায়ক এমন সত্য পথ আমি আর পাই নাই। "ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ", এবং "যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং, যেন সর্বমিদং ততম্। স্বকর্মণা

ছাপা হয় 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে (১৩৪৩-৪৪)। "পশ্চিমের যাত্রী" পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স থেকে, পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হয় মিত্র ও ঘোষ থেকে।—অ।

তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।" Heart within, God overhead—আমি যে যোগ্যতা লইয়া আসিয়াছি, তাহারই সাধনা করিয়া যাইতে চাহি; অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গবেষণা, যথাশক্তি সমাজসেবা। হয় তো সমস্তটাই ভস্মে ঘী ঢালা; বাঙ্গালী হিন্দু জাতিরই অস্তিত্ব থাকিবে কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আসিতেছে, তখন বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব লইয়া আলোচনা নিষ্ফল আলোচনা, ভবিষ্যৎ দেখিয়া হিসাব করিলে। কিন্তু তবুও কাজ করিয়া যাওয়া ভিন্ন আর কোনও পথ দেখি না। ছেলেবেলায় একটী গানের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম, গানটীর অন্তর্নিহিত ভাবটী বেশ লাগে, বোধ হয় আপনিও গানটী জানেন—এই গান হইতে একটু মানসিক শক্তি পাই—

আঁধারেতে ভয় করি না, আঁধার আমি বাসি ভালো।
আঁধার দেখ্‌লে মনে পড়ে, শ্যামা মা মোর এম্‌নি কালো॥
ভয়ের আকার দেখ্‌লে পরে, ডাকি আমার শ্যামা মারে,
ভয়ের মাঝে দেখ্‌তে যে পাই মায়ের রাঙা পায়ের আলো॥

God fulfils himself in many ways—ইত্যাদি।

যাক্, আবল-তাবল নানা বাজে কথা বকিয়া গেলাম। কাজের কথায় আসা যাক্। আপনার thesis আমার কাছেই আছে, systematic ভাবে দেখা হয় নাই, পাতা উলটাইয়া দেখিয়াছি মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় যখন তিন কপি টাইপ করা নহিলে লইবেন না, তখন আপাততঃ উহা মুলতবীই রহিল। আপনি ছাড়া পাইলে তবে উহার সদ্‌গতি হইবে।

উপস্থিত তো ১৯৩৭-এ ইতিহাসের জন্য প্রস্তুত হইবেন। পড়াশুনা আর কি করিতেছেন? আমার O. Henry কি আপনার কাছে আছে? আপনি ইলিয়াড ওডিসি দুইটাই শেষ করিয়াছেন—গ্রীক ট্রাজিক কবিদের ধরুন না কেন? Everyman's Libraryতে শস্তায় Aeschylus, Sophocles, Euripidesএর সমস্ত নাটক পাওয়া যাইতে পারে। আপনি Euripides পড়িয়া নিশ্চয়ই এক অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিবেন। পড়া আছে নিশ্চয়ই। Shaksphereকেও ছাড়িবেন না। যতটা সংসারবিষবৃক্ষের মধুর ফল আস্বাদ করা যায়—কাব্যামৃতরসাস্বাদন করিয়া।

উপস্থিত ব্যসনের মধ্যে আমাকে আবার নূতন করিয়া গ্রীক শিল্পের চর্চ্চায় পাইয়া বসিয়াছে। যত বয়স হইতেছে, গ্রীক জাতির immeasurable

superiority ততই যেন মনকে অভিভূত করিতেছে। আর কিছুই অতটা ভাল লাগে না। অবশ্য আমার কাছে সব culture, সব ধর্মের মূল্য আছে। মেক্সিকো আর একটী ব্যসন—প্রাচীন এবং আধুনিক। যদি আমি আমেরিকায় যাইবার সুযোগ পাই, সংযুক্ত রাষ্ট্র ছাড়িয়া মেক্সিকো দেখিব।*

এবার মহীশূরে অষ্টম Oriental Conference হইল। আমাকে Section for Indo-Aryan Languages (Modern)-এর শাখা সভাপতি করিয়াছিল। অবনী ঠাকুর মহাশয়কে Fine Arts বিভাগের সভাপতি করে, কিন্তু তিনি যাইতে না পারায় তৎস্থলাভিষিক্ত শাহেদ সুহরাবর্দী, বাগীশ্বরী প্রফেসর, নিযুক্ত হন। ইতিহাস বিভাগে রাধাকুমুদ মুখুজ্যে হন—তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র একদিন থাকিয়া পুনরায় নিখিলভারতীয় হিন্দুমহাসভার অধিবেশনে যোগ দিতে যান, তাঁহার অভাবে ডাক্তার হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী শাখার কাজ চালান। নৃতত্ত্ববিদ্যায় প্রথম রমাপ্রসাদ চন্দ নির্বাচিত হন, তিনি যাইতে না পারায় ডাক্তার পঞ্চানন মিত্রকে অনুরোধ করে, এবং তিনিও অপারগ হওয়ায় পরে একটী পারসী ভদ্রলোক আহূত হন। এবারে মহীশূর ও কর্ণাটক একটু দেখা হইল। গতবার আমরা দ্রবিড় বা তামিল দেশ দেখি †; অন্ধ্র দেশও একটু দেখিয়াছিলাম, কেরলও দেখিয়াছিলাম ; এবার

* আমেরিকার পেন্‌সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল অভ্‌ সাউথ এশিয়া স্টাডীজ-এ অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রিত হ'য়ে সুনীতিকুমার ১৯৫১ সালের আগস্ট মাসে বিমানে আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করেন, সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত আমেরিকায় কাটিয়ে সেখান থেকে মেক্সিকো যান। মেক্সিকোতে এক মাস থেকে ফিলাডেলফিয়াতে ফিরে আসেন, তারপর ৩১ মার্চ দেশে। দেশে ফিরে সুনীতিকুমার বাঙলাতে, 'আমেরিকা-যাত্রা' (শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫৯), 'আমেরিকা' (শারদীয় জনসেবক, ১৩৫৯), 'আমেরিকায় প্রবাসের কথা' (শারদীয় জনসেবক, ১৩৬০), 'মেক্সিকো-যাত্রা' (দেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬০), 'মেক্সিকোতে রবীন্দ্র-সাহিত্য' (শনিবারের চিঠি, রবীন্দ্র-সংখ্যা বৈশাখ ১৩৬৭), প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাঁর আমেরিকা যাত্রা আর প্রায় ছয় মাস কাল আমেরিকায় অবস্থানের আর এক মাস মেক্সিকো ভ্রমণের কথা লেখেন (ইংরিজিতেও দুইটি প্রবন্ধে লেখেন—*Mexico and India*, Hindusthan Standard, Puja Annual, 1952, আর *Mexico—The India of the New World*, Manjari, May 1954)। বাঙলা প্রবন্ধগুলির মধ্যে তিনটি তাঁর 'পথ-চল্‌তি' প্রথম খণ্ডে পুনর্‌মুদ্রিত হয়, আর একটি পুনর্মুদ্রিত হ'য়েছে তাঁর 'মনীষী স্মরণে' বইতে।—অ।

† ১৯২৯ সালে "পূজার ছুটিতে দুইজন বন্ধুর সহিত" সুনীতিকুমার দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করেন

কর্ণাটক হইল। মাদ্রাজে একদিন,—স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে অবস্থান করিয়া কাটানো যায়। তারপরে একরাত্রি বাঙ্গালোরে গিয়া থাকি ; বাঙ্গালোর শহরটা একটু দেখি। Conference উপলক্ষ্যে মহীশূরে তিন দিন অবস্থান করি। শহর ইচ্ছামত ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা হয় নাই, তবে যতটা দেখিয়াছি, খুবই চমৎকার লাগিয়াছিল। মহীশূর রাজ্যের দক্ষিণপূর্বে কাবেরীর প্রপাত আছে, শিবসমুদ্রম্ falls, দেখিতে গিয়াছিলাম ; সেই জলপ্রপাত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ করিয়া সমস্ত মহীশূর রাজ্যে বিতরিত হইতেছে। বৈদ্যুতিক শক্তি বিনা পয়সায় সংগৃহীত হয় বলিয়া মহীশূরের নগরগুলিতে বিদ্যুতের আলোর ছড়াছড়ি। মহীশূর রাজধানীর লাগাও চামুণ্ডীগিরি নামে একটী পাহাড় আছে, তাহার চূড়া রাজার কুল-দেবতা মহিষাসুরমর্দিনী চামুণ্ডা দেবীর মন্দির, আর একটী বিরাট পাথরের বৃষভ বা নন্দীর মূর্তিও এই পাহাড়ে আছে—প্রত্যহ সমস্ত পাহাড়টী আলোকমালায় সজ্জিত হয়। ষ্টেট হইতে একটী বিজলীর বাতীর কারখানা খোলা হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত রাজ্যে যত bulb প্রভৃতির আবশ্যক সব তৈয়ারী হয়। আমাদের সভা জমিয়াছিল বেশ। আমরা সকলেই state guest হইয়া ছিলাম। আমাদের স্থানীয় ইউরোপীয় হোটেলে রাখিয়াছিল। উটাকামন্দ হইতে সপত্নীক নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী আসিয়াছিলেন। ঢাকা হইতে সুশীল দে (সস্ত্রীক), রমেশ মজুমদার, হরিদাস ভট্ট, নলিনী ভট্টশালী (সস্ত্রীক)—ইনি ভারত পরিক্রমা করিয়া বাড়ী ফিরিলেন ;—কলিকাতা হইতে প্রবোধ বাগচী, প্রিয়রঞ্জন সেন, নারায়ণ বন্দ্য, হেম রায়, সভ্রাতৃক হেম রায়চৌধুরী, আমি, ইস্‌লামিক বিভাগের সিদ্দিকী, শাহেদ সুহরাবর্দি। সুহরাবর্দির সঙ্গে বহুপূর্বে বের্লিনে আমার পরিচয় ছিল, এবারও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আরও সুযোগ হইল। লোকটী বাস্তবিকই cultured, শিক্ষায়, মনে, ব্যবহারে। মহীশূরে একটী বিরাট বাঁধ তৈয়ারী

(দ্রষ্টব্য সুনীতিকুমারের 'ভিক্ষুক' প্রবন্ধ, উদয়ন, আশ্বিন ১৩৪০ ; 'পথ-চল্‌তি', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫৭-৬৪)। এই "দুইজন বন্ধু" হ'লেন সুনীতিকুমারের "ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার" আর তাঁর দাদা "পাটনার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙ্গীন হালদার"। অনেক কাল পরে হ'লেও,গোপালবাবু এই ভ্রমণের কথা লিখে বাঙালী পাঠককে পরিতৃপ্ত ক'রেছেন (দ্রষ্টব্য 'রূপনারাণের কূলে', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৮৯-৩১৫ ; পৃঃ ২৮৯-এর পংক্তি ২৫-এর মুদ্রিত পাঠে বন্ধনীর মধ্যে '১৯২৮-এ'-র স্থলে '১৯২৯-এ' পাঠ্য)।—অ।

করিয়া দিয়া যান বিখ্যাত দেওয়ান স্যর এম্ বিশ্বেশ্বরায়া ; এই বাঁধের গঠন-কার্য্যে একজনও ইংরেজ বা অন্য বিদেশীর সাহায্য লওয়া হয় নাই। কাবেরীর স্রোত বাঁধিয়া এই বাঁধ ; ইহার নাম হইয়াছে "কৃষ্ণরাজ সাগর"; বাঁধ হইতে জল লইয়া, ঢালু জমীতে সমতল কয়েকটী ক্ষেত্র কাটিয়া "বৃন্দাবন" নামে এক সুন্দর বাগান তৈয়ারী হইয়াছে, তাহাতে শত শত ফোয়ারা আছে ; ফোয়ারার ভিতরে বিজলীর আলোর খেলার দ্বারা fairy landএর সৃষ্টি হয় ; এখানে আমাদের একদিন চা-পানের ব্যবস্থা হয়। এই বৃন্দাবনের পথে, এক জায়গায় মহীশূরের আধুনিক এক ভাস্কর দ্বারা প্রস্তুত একটী কাবেরী মূর্তি—কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত—স্থাপিত করা হইয়াছে, বাঁধের জল আসিয়া দেবীর হস্তে ধৃত ঘট উপছাইয়া পড়িতেছে—সরকার হইতে পুরোহিত নিযুক্ত আছে, কাবেরী দেবীর পূজা করিয়া যায়। আমরা সোমনাথপুরের মন্দির (খ্রীঃ ১২৬৮ সাল), সেরিঙ্গাপট্টন দুর্গ ও হাইদর টীপু প্রভৃতির কালের ইমারত, বেলুর ও হালেবিদের মন্দিরসমূহ (খ্রীঃ ১২ শতক) দেখিয়া আসি। হোইসাল শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন ; কারুকার্য্যের বাহুল্য অসাধারণ, পাথরের উপরে সোনারূপার মত সূক্ষ্ম কাজ ; বিস্মিত ও অভিভূত হইতে হয়—কিন্তু এই শিল্পে মহাবলিপুর (বা গ্রীক) ভাস্কর্য্যের সেই উদার ভাব নাই। অত্যন্ত মসলাদার রান্না ;—খানিক দেখিলে আর ভাল লাগে না। প্রবোধ বাগচী, প্রিয়রঞ্জন সেন ও আমি শৃঙ্গেরীতে গিয়া শঙ্করমঠ (সারদাপীঠ) দেখিয়া আসি। আজকাল সর্বত্র বাসের কল্যাণে ভ্রমণ অতি সহজ হইয়া গিয়াছে।

Conference-এ আমার Section-এ প্রবন্ধ অতি অল্প ছিল। হিন্দী Stress-এর উপরে একটী প্রবন্ধ ছিল, সেটী ছাপা হইবে না বলিয়া অভিমত দিয়া আসি—বাজে, elementaty প্রবন্ধ ; আধুনিক ব্রজভাষা কবি একজনের উপর একটী প্রবন্ধ—চলনসই ; Gilchrist (Fort William College-এর) জীবনী ও কার্য্যাবলী অবলম্বনে। প্রিয়রঞ্জন বাবুর লেখা ; মহমূদ গজনীর সময়ে হিন্দী কবিতার একটী উল্লেখ, মুসলমান ঐতিহাসিকদের বইয়ে—হেম রায় এটী বাহির করিয়াছেন ; আর উর্দূতে তিনটী প্রবন্ধ ছিল,—হাইদরাবাদ-দক্‌খিন-এর অধ্যাপক মুহিউদ্দীন কাদরীর লেখা, লখনৌ-এ উর্দূ সাহিত্যের পত্তন ; সব্‌বর্ নামে হাইদরাবাদ-এর আর একজন লেখকের লেখা, দক্ষিণাঞ্চলে কি করিয়া স্থানীয় দখনী হিন্দুস্থানী সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা কমাইয়া দিয়া, উত্তর

হইতে আগত দিল্লীর হিন্দুস্থানী সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইল, অষ্টাদশ শতকে,—তাহার ইতিহাস। আর তৃতীয় উর্দূ প্রবন্ধটী ছিল একজন উর্দূ কবি সম্পর্কে। তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমার শাখার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল। আমার "সভাপতির অভিভাষণ" সবটা পড়ি নাই ; সংক্ষেপে, অনেক ছাড় দিয়া পড়ি। আমার বক্তব্য ছিল এই : ভারতীয় আধুনিক আর্য্যভাষার আলোচনা কি উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত? এই আলোচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ; সম্প্রতি এই আলোচনা অবলম্বন করিয়া কে কে ভাল কাজ করিয়াছেন ; আমাদের কি কি আবশ্যক, এই বিদ্যার প্রসার ও উন্নতির জন্য ; জনসাধারণকে আমরা এই বিদ্যার মারফৎ কিভাবে সাহায্য করিতে পারি।

আমি আমার অভিভাষণ ছাপাইতে দিয়াছি, Journal of the Department of Lettersএর জন্য, প্রুফ আসিয়াছে, ছাপা হইলেই আপনাকে একখণ্ড পাঠাইয়া দিব।* আমি অন্য প্রবন্ধ একটী পড়িয়াছিলাম, Linguistics Section-এ (অধ্যাপক সুকঠানকর—পুণা ভাণ্ডারকর ইন্‌স্‌টিট্যুটের—এই শাখার সভাপতি ছিলেন)—"চক্রবাক, কৃকবাকু, বক, কলবিঙ্ক পক্ষী, অশোক-রাজ্ঞী কালুবাকি"—এই শব্দগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে। এই শব্দগুলি Austric-মূলক। এই আলোচনা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।†

আমি আর একটী বিষয়ের অবতারণা করি। আমারই Section-এ, মুখেমুখে এ বিষয়ে বলি, আমার অভিভাষণেও এ বিষয়ে আলোচনা করি। বিষয়টী হইতেছে "চালু হিন্দুস্থানী"। কেতাবী হিন্দুস্থানী—হিন্দী ও উর্দূ—কতকগুলি কারণে অত্যন্ত দুরূহ ভাসা ; grammatical gender, oblique forms of the noun, plural form of verbs, passive construction

---

* দ্রষ্টব্য *The Study of New Indo-Aryan*, Presidential Address delivered before the Section for Indo-Aryan Languages at the eighth All-India Oriental Conference, Mysore, December 30, 1935, Journal of the Department of Letters, Calcutta University, Vol. XXIX, 1937, pp. 1-32.—অ।

† দ্রষ্টব্য *Non-Aryan Elements in Indo-Aryan*, Journal of the Greater India Society, Calcutta, Vol III, No. I, 1936, pp. 43-49. প্রবন্ধটি সুনীতিকুমারের নির্বাচিত ইংরিজি প্রবন্ধাবলীর একটি খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হ'য়েছে (দ্রষ্টব্য *Select Papers*, Volume Two, People's Publishing House. New Delhi-55, May 1979, pp.253-59)।—অ।

of the transitive verb past tense ইত্যাদি। এ সব ঝঞ্ঝাট এবং অনাবশ্যক রীতি বাদ দিয়া, "চালু হিন্দুস্থানী" ভারতের প্রকৃত রাষ্ট্রভাষা রূপে বিদ্যমান। "মৈঁনে ভাত খায়া, হম্‌নে (বা হম্‌লোগোঁনে) রোটী খাঈ, তীন রোটীআঁ খাঈঁ" স্থলে এই চালু হিন্দুস্থানীতে আমরা বলি—"হম্ ভাত খায়া, হম্‌লোগ রোটী খায়া, হম্‌লোগ তীন রোটী খায়া।" সাধু হিন্দী-উর্দূতে "মৈঁ আয়া—হম্ আয়ে, মৈঁ খাউংগা—হম্ খাএংগে" বলে, চালু হিন্দুস্থানীতে সকলেই বলে "হম্ আয়া, হম্‌লোগ আয়া, তুম আয়া, আপ আয়া, আপলোগ আয়া, হম্ খাএগা, হম্‌লোগ খাএগা, তুম, আপ, আপলোগ খাএগা"। এই হিন্দী বা হিন্দুস্থানী আমাদের কষ্ট করিয়া শিখিতে হয় না; এই হিন্দুস্থানীর সাহায্যে বাঙ্গালী ব্যবসা বা তীর্থ করিতে গিয়া পাটনা কাশী, প্রয়াগ লখনৌ, কানপুর আগরা, মথুরা দিল্লী, জয়পুর লাহোর সব জয় করিয়া আসে, কোথাও আটকায় না। দক্ষিণে পণ্ডিচেরীতে তামিল মুসলমান আমাদের সঙ্গে এই চালু হিন্দুস্থানীই বলিয়াছিল, আপনার মনে থাকিতে পারে। আমি প্রস্তাব করি—এই চালু হিন্দুস্থানী—Current Hindustani, "Basic Hindustani" যখন ভারতবর্ষের *de facto* Lingua Franca, তখন ইহাকে মানিয়া লইতে বাধা কি?*—অনেকে আমার এই প্রস্তাব সানন্দে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; বিশেষতঃ জন কয়েক কন্নাড়ী হিন্দী প্রচারক। কলিকাতায় আমার এক ছাত্র, দিল্লীবাসী মুসলমান—শুদ্ধ উর্দূর অধিকারী, সেও এই বিষয়ে উৎসাহী হইয়াছে, Calcutta Review-তে এ সম্বন্ধে তাহার এক প্রবন্ধ বাহির হইতেছে।†

আশা করি আপনি শারীরিক কুশলে আছেন। আমি নিজে ভালই

---

* ভারতের ভাষা-সমস্যা, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন আর জাতীয় সংহতি বিষয়ে সুনীতিকুমার ইংরিজিতে বাঙলায় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন, ইংরিজিতে বাঙলাতে বইও লিখেছেন—স্বাধীনতার আগে, স্বাধীনতা লাভের পরেও। এ বিষয়ে তাঁর সর্বশেষ বিশদ আলোচনা *India: A Polyglot Nation and its Linguistic Problems* vis-a-vis *National Integration* নামে পুস্তিকার আকারে বোম্বাই-এর Mahatma Gandhi Memorial Centre থেকে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হ'য়েছে।—অ।

† দ্রষ্টব্য *Towards an Indian Lingua Franca* by M. Hamidullah, B. A., The Calcutta Review, April, 1936, pp. 49-62.—অ।

আছি, তবে বাড়ীতে গত ৫।৬ মাস ধরিয়া ক্রমাগত অসুখ বিসুখ লাগিয়াই আছে—আমার স্ত্রীর, আমার শাশুড়ীর ; ছেলেরাও ভাল নাই। বাদল ভাল পড়াশুনা করিতেছে, গত বৎসর ইস্কুলে প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে। আপনার কুশল সংবাদ দিবেন। সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ডের অভিষেকের শুভ মুহূর্তে আশা করি—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—যে আপনি যেন মুক্তিলাভ করেন।

[প্রথম পৃষ্ঠার মাথায় লেখা—]

সময় মত পত্রের উত্তর দিবেন, কুশল সংবাদ জ্ঞাপন করিবেন। ইতি।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প রি শি ষ্ট ৪

সুনীতিকুমারের আঁকা ছবি

ভাষাতত্ত্বের সাধক আমার বাবা শ্রীসুনীতিকুমার নীরস ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকে প্রাণবন্ত করে গেছেন তাঁর নিজের অন্তরের শিল্পপ্রেমিকতা দিয়ে। কোন দেশের ভাষা নিয়ে গবেষণা ক'রতে হ'লে, সে দেশের ইতিহাস ভূগোল শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি সংস্কৃতির সব কিছুই তাঁর কাছে অপরিহার্য্য চর্চার বিষয় হ'য়ে প'ড়ত ; বিশেষ ক'রে সে দেশের ভাস্কর্য্য শিল্প ও সাহিত্য। শিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগ দেখে মনে হয় ভাষাতত্ত্ব ছিল তাঁর পেশা, কিন্তু জীবনের আসল রস ছিল শিল্পচর্চায়। শিল্পচর্চা ও ছবি আঁকার ব্যাপারটা ছিল একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব জিনিস,—কোথাও এর প্রচার হ'য়েছে ব'লে আমাদের জানা নেই। জানি না কেন নিজের এই প্রতিভার তেমন মূল্য তিনি দেন নি। বাবার আঁকা বেশ কিছু ছবি আছে, তবে তিনি রং তুলি দিয়ে আঁকেন নি। পেনসিল কিংবা কলমের টানে যে-সব ছবি এঁকে গেছেন তাতে বলিষ্ঠ রেখাচিত্রের ছাপ চিনে নিতে ভুল হয় না। কখনও আঁকতেন নিজের খেয়ালের বশে ; কখনও বা আমাদের আবদার মেটাবার জন্য।

শিল্পের প্রতি বাবা একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব ক'রতেন। প্রাচীন গ্রীক শিল্পের নিরলঙ্কার সৌন্দর্য্য যেমন তাঁকে মুগ্ধ ক'রত, দক্ষিণ ভারতের কারুকার্য্যময় মূর্তি স্থাপত্য অথবা আফ্রিকার সহজ সরল শিল্পসৃষ্টি দেখেও তিনি তেমনই আনন্দ লাভ ক'রতেন। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট ক'রত এবং এক অনাস্বাদিত আনন্দে তাঁকে ভরপুর ক'রে দিত। নন্দলাল বসুর পাথরে খোদিত হরপার্বতীর মূর্তির সামনে দাঁড়ালে, বাবা ব'লতেন, "আমার উপাসনার কাজ হয়।" তাঁর আঁকা রেখা চিত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি হরপার্বতী ও নানা বিষয়ের ছবি। হরপার্বতীর ছবিগুলিতে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের প্রভাব বেশ দেখতে পাওয়া যায়—এ ছাড়া বাবা ঘোড়ার ছবি আঁকতেও খুব ভালোবাসতেন, জানি না অবনীন্দ্রনাথের কথা মতো উঠমুঠ ঘোড়া আঁকায় বাবা এমন পারদর্শী হ'য়ে উঠেছিলেন কি না। কলমের একটানে বেগবান্ ঘোড়ার ছবি আঁকতেন, আমাদের আব্দারে চক দিয়ে মেঝেতে আঁকতেন নৃত্যরত গণেশ, বানর, কুমীর, উট, হাতি, বল্লমধারী সৈনিক, কমণ্ডলু হাতে সন্ন্যাসী, ইত্যাদি। ছবি এঁকেছেন কলেজ জীবনে, শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাটকের, "বিশেষতঃ 'চন্দ্রগুপ্ত'· ·অভিনয়ে প্রাচীন ভারতীয় আর প্রাচীন গ্রীক পোশাক, মায় যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র-বর্ম প্রভৃতি, পুরানো ছবি আর ভাস্কর্য্য দেখে তৈরী করার চেষ্টা" ক'রেছিলেন। যে নিষ্ঠার সঙ্গে ভাষার বিশ্লেষণ, গবেষণা এবং তার উন্নতির চেষ্টা বাবা ক'রে গিয়েছেন, সেই একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে যদি শিল্পচর্চা ক'রতেন হয়তো বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত সুনীতিকুমারের অন্যতর পরিচয় আমরা পেতাম॥

নীলা মুখোপাধ্যায়



হর-পার্বতী


21. 8. 46.



सन्यासी

22·9



প্রাচীন তামিল উপাখ্যানের রাজকুমারী নর্'-চোনৈ এবং রাজা চেরন্' অতন্'   ফেব্রুয়ারি ১৯১১

গ্রন্থপঞ্জি

[১৯৭০ সালে 'জিজ্ঞাসা' *Suniti Kumar Chatterji : The Scholar and the Man* নামে একখানি বই প্রকাশ করেন। এই বইখানিতে অধ্যাপক সুনীতিকুমারের রচনাবলীর একটি তালিকা ছাপা হ'য়েছে ; তালিকাটি, বলা বাহুল্য, অসম্পূর্ণ। বইখানি প্রকাশের পরে সুনীতিকুমারের অনেক পূর্বপ্রকাশিত রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৭০ সালের পরেও সুনীতিকুমারের বহু রচনা প্রকাশিত হ'য়েছে। স্থানাভাবে তাঁর সমস্ত রচনার সম্পূর্ণ তালিকা এখানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এখানে কেবল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সুনীতিকুমারের রচনার একটি তালিকা দেওয়া হ'ল (ছাপতে গিয়েছে এমন গ্রন্থও এই তালিকায় ধরা হ'য়েছে)।—অনিলকুমার কাঞ্জিলাল]

Books and Monographs

1. *The Origin and Development of the Bengali Language*, Parts I and II. First edition, Calcutta University, 1926. Reprint by Microfilm-Xerography by University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan, 1966.

Offset reprint, Parts I and II, George Allen & Unwin Ltd, London, 1970.

Part III, Supplementary, Additions and Corrections etc., first edition, George Allen & Unwin Ltd, London, 1972.

2. *Bengali Self-Taught*, by the natural method, with phonetic pronunciation, in Marlborough's Self-Taught Series, London, 1927.

3. *A Bengali Phonetic Reader*, University of London Press, London, 1928.

4. *Indo-Aryan and Hindi* : Two courses of lectures delivered before the Research and Post-Graduate Department of the Gujarat Vernacular Society (now Gujarat Vidya Sabha) of Ahmedabad. First edition, Gujarat Vernacular Society, 1942 ; second edition (revised and enlarged), 1960, Firma K.L. Mukhopadhyay, 257B Bipin Bihari Ganguli Street, Calcutta-12 ; reprinted 1969.

5. *Languages and the Linguistic Problems*: Oxford Pamphlets on Indian Affairs, No 11, Oxford University Press, 1943 ; third edition, 1945.

6. *The National Flag*: A selection of papers—cultural and historical, Mitra and Ghosh, 10 Shyama Charan De Street, Calcutta-12, 1944.

7. *Kirāta-jana-kṛti—The Indo-Mongoloids: their contribution to the history and culture of India*, based upon Pratibha Devi Lectures, delivered at Jorhat, Assam, in 1947, published in 1951 by the Asiatic Society, 1 Park Street, Calcutta-16. Revised and enlarged edition, Asiatic Society, December, 1974.

8. *The Place of Assam in the History and Civilisation of India*: Banikanta Kakati Memorial Lectures, delivered before the University of Gauhati in 1954, published by Gauhati University, Assam, 1955 ; reprinted 1970.

9. *Africanism: the African Personality*, Foreword by Sarvepalli Radhakrishnan, Bengal Publishers Private Ltd., 14 Bankim Chatterji Street, Calcutta-12, 1960.

10. *Indianism and the Indian Synthesis*: The Kamala Lectures for 1947, delivered before Calcutta University and Visva-Bharati in August 1959, published by Calcutta University in 1962.

11. *Languages and Literatures of Modern India*, Foreword by C. P. Ramaswami Aiyar, Prakash Bhavan, 15 Bankim Chatterji Street, Calcutta-12, 1963.

12. *Dravidian*: A course of three lectures on Dravidian origins and on modern Dravidian literature, delivered before Annamalai University in February 1963, published by Annamalai University, 1965.

13. *Rabindranath Tagore*: Three lectures delivered before Marathwada University at Aurangabad in October 1963, published by Marathwada University, 1965.

14. *The People, Language and Culture of Orissa*: Artavallabha Mahanti Memorial Lectures, First Series,

delivered at Bhubaneswar in December 1964, published by the Orissa Sahitya Akademi, Bhubaneswar, 1966.

15. *Religious and Cultural Integration of India: Atombapu Sarma of Manipur*: being the Pandita-raja Atombapu Sarma Memorial Lectures delivered at Imphal, Manipur, March 29-30, 1965, published by the Atombapu Research Centre, Imphal, Manipur, 1967.

16. *Phonetics in the Study of Classical Languages in the East*: Sri Nijalingappa Extension Lectures 1967 at the University of Bangalore on 8th and 9th March 1967, published by the University of Bangalore, 1967.

17. *Guru Gobinda Singh*: Written in connexion with the third birth centenary celebrations of Guru Gobinda Singh at Panjab University, Chandigarh, published by Panjab University, Chandigarh, 1967.

18. *Balts and Aryans: in their Indo-European Background*: Based upon a course of lectures at the Autumn Session of the Indian Institute of Advanced Study at Simla in October 1966, published by the Indian Institute of Advanced Study, Simla, April, 1968.

19. *India and Ethiopia: from the 7th century B. C.*: Based upon a paper prepared for the 27th International Congress of Orientalists at Ann Arbor, Michigan, U.S.A. in August 1968, published by the Asiatic Society, Calcutta-16, Asiatic Society Monograph Series No. 15, 1968 (issued 1969).

20. *World Literature and Tagore*: Nripendra Chandra Banerji Memorial Lectures, delivered before Visva-Bharati on 27 and 28 April 1968, published by Visva-Bharati, Santiniketan, in 1971.

21. *Iranianism: Iranian Culture and its impact on the world from Achaemenian times*: Paper read on September 3, 1966 at the World Congress of Iranologists, August-September 1966, in Teheran, Iran, published by the Asiatic Society, Calcutta-16, 1972.

22. *Select Papers*, Volume One, a selection of 13 papers,

People's Publishing House (P) Ltd , Rani Jhansi Road, New Delhi-55, 1972.

23. *Jayadeva*, Sahitya Akademi, New Delhi, 1973.

24. *India : A Polyglot Natian, and its linguistic problems* vis-á-vis *National Integration*, Mahatma Gandhi Memorial Lecture Series-3, published by Mahatma Gandhi Memorial Research Centre, Bombay-2, 1974.

25. *A Shortened Arya Hindu Vedic Wedding and Initiation Ritual*, compiled, arranged, translated and annotated by Suniti Kumar Chatterji, Jijñāsā, Calcutta-9, July 1976.

26. *The Rāmāyana : Its Character, Genesis, History, Expansion and Exodus : A Résumé*, Prajñā, 77/1 Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9, 29 May 1979.

27. *Select Writings*, Volume One, comprising 16 papers. Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 5 Ansari Road, New Delhi-2, May 1978.

28. *Select Papers*, Volume Two, comprising 19 papers. People's Publishing House (P) Ltd., New Delhi-55, May 1979.

29. *New and Modern Indian Literatures and the Romances of Medieval Bengal (Gauḍa-Vanga-Ramyakathā) :* Dr. Biman Behari Majumdar Memorial Lectures Fourth Series, delivered before the Asiatic Society on 16 & 17 January, 1975, Asiatic Society, Calcutta-16 (in the press).

30. *Select Papers*, Volume Three, comprising 15/16 papers, Prajñā, 77/1 Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9 (in press).

Editions

1, *Varṇa-ratnākara* : The oldest text in Maithili, edited in collaboration with Babua Misra, with a study of its language by Suniti Kumar Chatterji, published by the Asiatic Society, Calcutta-16, 1940.

2. *Ukti-vyakti-prakaraṇa* : The oldest document in Kosali or Awadhi, edited by Muni Sri Jinavijayaji, with a

study of the language by Suniti Kumar Chatterji, Singhi-Jain Series, Bombay, 1953.

3. *A Middle Indo-Aryan Reader* : compiled, edited and annotated, in collaboration with Prof Sukumar Sen in association with Gokuldas De, Calcutta University, 1953, Part 1 (Texts), Part II (Notes). Completely revised, brought up to date and edited and annotated in collaboration with Prof Sukumar Sen, 1957, 1960 ; revised fourth edition, Part I (1970), Part II (1972).

বাঙ্গালা

পুস্তক ও পুস্তিকা

১। বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথম সংস্করণ ১৯২৯।১৩৩৬। এতে ছিল দুটি পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৪।১৩৪০। প্রথম সংস্করণের দুটি, আর অতিরিক্ত তিনটি পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধের সংগ্রহ। (এই তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে দুটি, 'বাঙ্গালা-ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' আর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', পুনর্লিখিত ও পরিবর্ধিত। এই দুটি আদৌ 'বাঙ্গালা ভাষার কথা' ও 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' নামে, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের সহযোগিতায় সম্পাদিত এবং সেন রায় অ্যাণ্ড কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত ছাত্রপাঠ্য সাহিত্য-সংকলন 'সাহিত্য-শিক্ষা'র পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়; প্রবন্ধ দুটি একত্রে 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারেও উক্ত প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচারিত হয়।) তৃতীয় সংস্করণ ১৯৩৬।১৩৪৩। দ্বিতীয় সংস্করণের পাঁচটি প্রবন্ধ ছাড়াও, এতে আরও একটি প্রবন্ধ স্থান পায়।

সংশোধিত অষ্টম সংস্করণ ১৯৭৪।

২। পশ্চিমের যাত্রী। ১৯৩৫ সালে ইউরোপ ভ্রমণের বিবরণ। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বে, মাসিক পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত

হয়—কিয়দংশ 'প্রবাসী'-তে (১৩৪২, ১৩৪৩) ও অধিকাংশ 'ভারতবর্ষ'-এ (১৩৪৩-৪৪)।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৪৫। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা। পরবর্তী সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত। চতুর্থ মুদ্রণ ১৩৭২।

৩। ভারত-সংস্কৃতি। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। 'বৈশাখ ১৩৪৫ সালে "জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য" নাম দিয়া সাতটি প্রবন্ধের সংকলন এবং জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ সালে "ভারত-সংস্কৃতি" নাম দিয়া আটটি প্রবন্ধের সংকলন' প্রকাশিত হয়। 'প্রথম পুস্তকখানির তিনটি সংস্করণ হয়, দ্বিতীয়খানির মাত্র একটি।' পরে, ১৩৬৪ সালে, 'এই দুইটি পুস্তকের প্রবন্ধগুলিকে একত্র করিয়া "ভারত-সংস্কৃতি" নামে' মিত্র ও ঘোষ থেকে 'প্রকাশিত করা' হয়। 'কেবল "জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য" পুস্তকের "ভিক্ষুক" প্রবন্ধটি বাদ দেওয়া' হয়। (এই 'ভিক্ষুক' প্রবন্ধটি পরে 'পথ-চল্‌তি' প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়।) পরিবর্ধিত আকারের এই 'ভারত-সংস্কৃতি'র পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত (দ্বিতীয়) সংস্করণ ১৩৭০ সালে মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের অন্তর্গত দুইটি প্রবন্ধ ('এশিয়া-খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব' ও 'বৃহত্তর বঙ্গ') এই সংস্করণে গৃহীত হয় নি; তৎপরিবর্তে পূর্বপ্রকাশিত নোতুন দুটি প্রবন্ধ ('গোসাঁই তুলসীদাস' ও 'কবি তানসেন') অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে। বর্জিত প্রবন্ধ দুটি 'সাংস্কৃতিকী' দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

৪। বৈদেশিকী। নূতন সংস্করণ। প্রথম খণ্ড। প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

পূর্বপ্রকাশিত আটটি উপাখ্যানের সংকলন রূপে এর প্রথম সংস্করণ বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে ১৩৫০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় (পুনর্মুদ্রণ ১৩৫৪)। এই সংস্করণের আটটি উপাখ্যানের মধ্যে পাঁচটি আর পূর্বপ্রকাশিত নোতুন তিনটি, একত্রে আটটি উপাখ্যান নিয়ে নোতুন সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রকাশ ভবন থেকে ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ অপেক্ষিত।

৫। রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ। প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

'১৯২৭' সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে

'মালয়-দেশ, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপ, আর শ্যাম-দেশ ভ্রমণের' সচিত্র বিবরণ। এই ভ্রমণের বিবরণ (শ্যাম-দেশ ভ্রমণের বিবরণ বাদে) 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'দ্বীপময় ভারত' নামে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় (ভাদ্র ১৩৩৪-চৈত্র ১৩৩৫ ; পৌষ ১৩৩৬-আশ্বিন ১৩৩৭ ; বৈশাখ ১৩৩৮-আশ্বিন ১৩৩৮)। পরে, ১৩৪৭ সালে, এই ভ্রমণ-বিবরণ ঐ নামেই ('দ্বীপময় ভারত') পুস্তকাকারে কলিকাতার বুক কোম্পানি লিমিটেড থেকে প্রকাশিত হয়। শ্যাম-দেশ ভ্রমণের বিবরণ এর অনেক পরে, ' "বিশ্বভারতী পত্রিকা"তে সাত ক্ষেপে' প্রকাশিত হয় (১৩৫৭ কার্তিক-পৌষ ; ১৩৬০ বৈশাখ-আষাঢ় ; ১৩৬৮ শ্রাবণ-আশ্বিন, কার্তিক-পৌষ, মাঘ-চৈত্র ; ১৩৬৯ বৈশাখ-আষাঢ়, শ্রাবণ-আশ্বিন)। সমগ্র 'দ্বীপময় ভারত' এবং 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'তে প্রকাশিত শ্যাম-দেশ ভ্রমণের বিবরণ, একত্রে, 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ' নামে, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে, ১৩৭১ সালে প্রকাশ ভবন থেকে প্রকাশিত হয়। পুনর্মুদ্রণের কাজ চলছে।

৬। ইউরোপ ১৯৩৮। ১৯৩৮ সালে ইউরোপ ভ্রমণের বিবরণ। মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। প্রথম খণ্ড ১৩৫১। দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৫২।

৭। ভারতের ভাষা ও ভাষা-সমস্যা। বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা, সংখ্যা ৪। বিশ্বভারতী, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ ১৩৫১। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৬।

৮। সাংস্কৃতিকী। প্রথম খণ্ড। বাক্-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। চৈত্র ১৩৬৮।

বারোটি পূর্বপ্রকাশিত রচনার সংগ্রহ। প্রায় প্রত্যেকটি রচনাই অল্প-বিস্তর সংশোধিত।

৯। সাংস্কৃতিকী। দ্বিতীয় খণ্ড। বাক্-সাহিত্য। কার্তিক ১৩৭২।

এগারোটি পূর্বপ্রকাশিত রচনার সংগ্রহ। অধিকাংশই অল্প-বিস্তর সংশোধিত। এগুলির মধ্যে 'এশিয়া-খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব' আর 'বৃহত্তর বঙ্গ', এই দুটি পূর্বে 'ভারত-সংস্কৃতি'তে সংকলিত হ'য়েছিল। 'ভারত-সংস্কৃতি'র দ্বিতীয় (১৩৭০ সালের) সংস্করণে রচনা দুটি গৃহীত হয় নি, তৎপরিবর্তে অন্য দুটি রচনা স্থান পেয়েছে। 'পশ্চিম আফ্রিকার

সংস্কৃতি ও ধর্ম' প্রবন্ধটি পূর্বে 'বৈদেশিকী'র পুরানো সংস্করণে 'যোরুবা জাতির সংস্কৃতি ও ধর্ম' নামে পুনর্মুদ্রিত হ'য়েছিল।

১০। পথ-চল্‌তি। প্রথম খণ্ড। গ্রন্থ-প্রকাশ, ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫। বৈশাখ ১৩৬৯।

তেরোটি পূর্বপ্রকাশিত রচনার সংগ্রহ।

১১। পথ-চল্‌তি। দ্বিতীয় খণ্ড। গ্রন্থ-প্রকাশ। আষাঢ় ১৩৭১।

পনেরোটি পূর্বপ্রকাশিত রচনার সংগ্রহ।

১২। মনীষী স্মরণে। পঁচিশটি পূর্বপ্রকাশিত রচনার সংগ্রহ। জিজ্ঞাসা। ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। চৈত্র ১৩৭৮।

প্রত্যেকটি রচনাই অল্প-বিস্তর সংশোধিত। তিনটি অন্য দুখানি সংকলন থেকে গৃহীত।

১৩। বাঙ্গালা ভাষা-প্রসঙ্গে। জিজ্ঞাসা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২।

সাতাশটি পূর্বপ্রকাশিত রচনার সংগ্রহ। প্রত্যেকটিই সংশোধিত, কোনও-কোনওটি পরিবর্ধিত। তিনটি পূর্বপ্রকাশিত অন্য গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

১৪। সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস। জিজ্ঞাসা। ডিসেম্বর ১৯৭৬।

পাঁচটি পূর্বপ্রকাশিত রচনার সংগ্রহ। তিনটি অন্য দুখানি সংকলন থেকে গৃহীত।

১৫। জীবন-কথা। জিজ্ঞাসা। ২৬ নভেম্বর ১৯৭৯।

* * *

১৬। ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম সংস্করণ ১৩৩৯। তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫।১৩৫১।

১৭। সংক্ষিপ্ত ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৫২। দশম সংস্করণ ১৩৬১।

১৮। সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৩৬৩।

১৯। সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ: নবীন সংস্করণ। আদ্যন্ত পুনর্লিখিত। প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। সংশোধিত সংস্করণ ১৩৬৭, ১৩৬৮, ১৩৬৯, ১৩৭০।

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৭১। বাক্‌-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো,

কলিকাতা-৯। সংশোধিত সংস্করণ, ১৩৭২, ১৩৭৪, ১৩৭৫, ১৩৭৬, ১৩৭৭, ১৩৭৯।

২০। *Primary English Grammar in Bengali* (বাঙ্গালা ভাষায় প্রাথমিক ইংরেজি ব্যাকরণ)। 'পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক নির্দিষ্ট পাঠক্রম ধরিয়া' পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের নিম্নশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, কলিকাতা। ১৯৫০।

২১। মধ্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ। শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলালের সহযোগিতায়। বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। প্রথম খণ্ড: ১৯৭৩, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৪; সংশোধিত সংস্করণ ১৯৭৫, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৬, ১৯৭৮। দ্বিতীয় খণ্ড: ১৯৭৪; সংশোধিত সংস্করণ ১৯৭৬, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৭, ১৯৭৮।

২২। লঘু বাঙ্গালা ব্যাকরণ। শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলালের সহযোগিতায়। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। ১৯৭৫, ১৯৭৭, ১৯৭৮। পুনর্মুদ্রণের কাজ চ'লছে।

[এই তালিকায় আরও যোগ করা যেতে পারে—ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য 'সরল শিশুবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', 'শব্দশাস্ত্র-প্রবেশিকা: নবীন বাঙ্গালা ব্যাকরণ', অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের সহযোগিতায় রচিত 'আশুবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', 'ছাত্রবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', 'প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ', 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও রচনা প্রবেশিকা' প্রভৃতি কয়েকখানি ব্যাকরণ-রচনা-বিষয়ক বই, অধ্যাপক বসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগিতায় রচিত 'বাঙ্গালা রচনা প্রবেশিকা', শ্রীগোপাল হালদার মহাশয়ের সহযোগিতায় রচিত 'নিম্ন-মাধ্যমিক ব্যাকরণ ও রচনা', এবং অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের সহযোগিতায় প্রস্তুত কয়েক খণ্ড সাহিত্য-সংকলন ('পাঠ-মালা', 'সাহিত্য-শিক্ষা', 'সাহিত্য-সংগ্রহ')।]

সম্পাদিত গ্রন্থ

১। পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্সুম্প্সাম্-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ। বাঙ্গালা অনুবাদ ও উক্ত পাদ্রির বাঙ্গালা-পোর্তুগীস শব্দ-সংগ্রহ হইতে নির্বাচিত শব্দাবলী

সমেত মূল পোর্তুগীস গ্রন্থের যথাযথ পুনর্মুদ্রণ। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক ভূমিকাসহ সম্পাদিত ও অনূদিত। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত 'প্রবেশক' (পৃঃ ৵০-২॥০)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩১।১৩৩৮।

২। হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ৭৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে বাঙ্গালী জাতির শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ড। বিভিন্ন লেখকের ১৪টি প্রবন্ধের সংকলন। ১৩৩৮।

দ্বিতীয় খণ্ড। বিভিন্ন লেখকের ২৬টি প্রবন্ধের সংকলন, তৎসহ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনীপঞ্জি ও লেখপঞ্জি। ১৩৩৯।

৩। চণ্ডীদাস-পদাবলী। প্রথম খণ্ড। বিস্তৃত পাঠভেদ-নির্দেশ সহ বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদসমষ্টির সংকলন। সম্পাদকীয় ভূমিকা সহিত। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা-৬। ১৩৪১।

৪। বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী। তিন খণ্ড। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত। মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সংরক্ষণ সমিতি।

প্রথম খণ্ড : সাহিত্য। ১৩৪৪ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড : সমাজ। ১৩৪৫ ॥ তৃতীয় খণ্ড : শিক্ষা ও বিবিধ। ১৩৪৬ ॥ প্রথম খণ্ডের 'ভূমিকা' শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত।

৫। চরিত্র-সংগ্রহ। বাঙ্গালা জীবন-চরিত ও আত্ম-চরিত থেকে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত কতকগুলি রচনার সংগ্রহ। সম্পাদক-কৃত টীকা-টিপ্পনী সহ। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ১৩৪৭। বইখানির বহু পুনর্মুদ্রণ হ'য়েছে।

৬। হরপ্রসাদ-রচনাবলী। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সমগ্র বাঙ্গালা রচনার সংগ্রহ। শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলালের সহযোগিতায় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত। সম্পাদকীয় ভূমিকা (শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত) ও টীকা সহিত। প্রকাশক শ্রীপ্রিয়দর্শী

বন্দ্যোপাধ্যায়। ঈস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী, বুক্‌স্ অ্যাণ্ড পাব্‌লিকেশন্‌স্, ৬৪ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

প্রথম সম্ভার। অগ্রহায়ণ ১৩৬৩॥ দ্বিতীয় সম্ভার। পৌষ ১৩৬৬। (পরবর্তী খণ্ডগুলি প্রকাশিত হ'তে পারে নি।)

৭। রামেন্দ্র-রচনা-সংগ্রহ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের নির্বাচিত রচনার সংগ্রহ। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল কর্তৃক নির্বাচিত ও সম্পাদিত। সম্পাদকীয় ভূমিকা সহিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা-৬। চৈত্র-১৩৭১।

हिन्दी

पुस्तक और पुस्तिका

१। 'राजस्थानी भाषा'। राजस्थान विश्वविद्यापीठ उदयपुर के अन्तर्गत "महाकवि सूर्यमल आसन" से ता० २७, २८ और २९ जनवरी १९४७ ई० को दिये गये तीन भाषण। राजस्थान विश्वविद्यापीठ महाराणा भूपाल प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान, उदयपुर १९४९।

२। 'भारत की भाषाएँ और भाषा सम्बन्धी समस्याएँ'। डा० महादेव साहा द्वारा मूल बंगला मे अनूदित। हिन्दी भवन। जालंधर और इलाहाबाद। प्रथम संस्करण १९५१। संशोधन तथा संयोजन सह द्वितीय संस्करण १९५७।

३। 'ऋतम्भरा'। ११ निबन्धों का संग्रह। साहित्य भवन लि०, इलाहाबाद। प्रथम संस्करण १९५१। द्वितीय संशोधित संस्करण १९५८।

४। 'भारतीय-आर्य भाषा और हिन्दी'। राजकमल प्रकाशन। दिल्ली-पटना। प्रथम संस्करण १९५४। द्वितीय संस्करण १९५७। तृतीय, परिवर्धित संस्करण १९६३।

५। 'भारत में आर्य और अनार्य'। नागपुर में दिनांक २७ से

३० जुन १९५५ तक दिये गये व्याख्यानों का संग्रह । मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषत्, भोपाल। १९५९।

६। 'हिन्दी पाठमाला'। श्रीरेवतीरञ्जन सिंह के साथ। आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस। बम्बई-कलकत्ता-मद्रास। बंगला, असम और उड़ीया संस्करण। प्रथम भाग १९५०। द्वितीय भाग १९५३। तृतीय भाग १९५८। चतुर्थ भाग १९५८। बहुत से पुनर्मुद्रण।

७। 'हिन्दी व्याकरण प्रवेशिका'। श्रीरेवतीरञ्जन सिंह के साथ। आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस। प्रथम संस्करण १९५५।

In Urdu Translation

1. *Bikhré Warq*, translation by Sri Santi Ranjan Bhattacharya of eight Bengali articles, Maktaba-i-Jamiah Ltd., New Delhi, 1968.

In Gujarati Translation

1. भारतीय आर्यभाषा अने हिन्दी।

Translation of *Indo-Aryan and Hindi*, by Dr Bhogilal J. Sandesara, Gujarat Vidya Sabha, Ahmedabad, 1952.

(ইংরিজি Jayadeva বইখানির গুজরাটী আর অসমিয়া ভাষায় অনুবাদ সাহিত্য অকাদেমী থেকে প্রকাশিত হ'য়েছে, বাঙলা অনুবাদের কাজও সম্পূর্ণ-প্রায়।)

জীবনীপঞ্জি : সংক্ষিপ্ত

১৮৯০ : জন্ম ২৬ নভেম্বর (১২৯৭ বঙ্গাব্দ, ১১ অগ্রহায়ণ) বুধবার। পিতা—হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, মাতা কাত্যায়নী দেবী।

১৯০৭ : প্রবেশিকা পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান (মোতীলাল শীলস্ ফ্রি কলেজ)।

১৯০৯ : ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ (স্কটিশ চার্চ কলেজ)।

১৯১১ : ইংরেজি অনার্সে ১ম শ্রেণীতে ১ম (প্রেসিডেন্সি কলেজ)।

১৯১৩ : ইংরেজি এম. এ. পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম।

১৯১৪ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির সহকারী অধ্যাপক। বিবাহ—কমলা দেবী (১৯০০-১৯৬৪); এক পুত্র, পাঁচ কন্যা।

১৯১৮ : সরকার-পরিচালিত বৈদিক-সংস্কৃত পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ।

১৯১৯ : ভাষাতত্ত্বচর্চায় সরকারি বৃত্তি লাভ ও য়ুরোপে অবস্থান।

১৯২০ : ধ্বনিতত্ত্বে ডিপ্লোমা লাভ।

১৯২১-২২ : 'Indo Aryan Linguistics—Origin and Development of the Bengali Language' বিষয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট্ উপাধি লাভ।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ ও য়ুরোপের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ। নভেম্বরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের অধ্যাপক।

১৯২৬ : 'দি ওরিজিন অ্যাণ্ড ডেভেলপ্‌মেন্ট অব্ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯২৭ : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভ্রমণ (মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বলি, শ্যাম)।

১৯৩৫ : লণ্ডনে আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞান সম্মেলনে সভাপতি (ভারতীয় বিভাগ)।

১৯৩৬ : এশিয়াটিক সোসাইটি (কলিকাতা)র ফেলো নির্বাচিত।

১৯৩৬-৩৭ : রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত বর্মা বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি, বর্মা ভ্রমণ।

১৯৩৮ : ৩য় আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞান কন্‌গ্রেস (ঘেণ্ট)-এ, আন্তর্জাতিক নৃতাত্ত্বিক কন্‌গ্রেস (ব্রাসেলস্)-এ যোগদান ; Comité International Permanent de Linguistes (Paris)-এর সদস্যপদ এবং 'ওরিয়েন্ট্যাল ইন্সটিটিউট অব্ পোলাণ্ড'-এর সাম্মানিক সদস্যপদ লাভ।

১৯৪৬ : ৩৪তম নিখিল ভারত হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন (করাচি)র জাতীয় ভাষা শাখার সভাপতিত্ব ; Société Asiatique (Pairs)-এর সাম্মানিক সদস্যপদ।

১৯৪৭: 'আমেরিকান ওরিয়েণ্ট্যাল সোসাইটি' (নিউ হাভেন)-এর সাম্মানিক সদস্যপদ লাভ; আসাম সরকার-আয়োজিত 'প্রতিভা দেবী' বক্তৃতা দান।

১৯৪৮: 'ইণ্টারন্যাশন্যাল কন্‌গ্রেস অব লিঙ্গুইস্টস্' এবং 'ইণ্টারন্যাশন্যাল কন্‌গ্রেস অব্ ওরিয়েণ্ট্যালিস্টস্' (প্যারিস) ও 'ইণ্টারন্যাশন্যাল কন্‌গ্রেস অব্ অ্যানথ্রপলজিস্টস্ (ব্রাসেলস্)-এ যোগদান; হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন (এলাহাবাদ)-প্রদত্ত 'সাহিত্য-বাচস্পতি' উপাধি লাভ।

১৯৪৯: Ecole Francaise de l'Extreme-Orient-এর সাম্মানিক সদস্যপদ লাভ; ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে 'ইণ্টারন্যাশন্যাল কমিটি অন্ দি ব্রেইল অ্যালফাবেট'-এ যোগদান—প্যারিসে (১৯৫০ ও ১৯৫২) বেইরুটে (১৯৫১)।

১৯৫০: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি রূপে শিক্ষাসম্পর্কিত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য ইতালি, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও ইস্তাম্বুল গমন; Provincial Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenchappen (হল্যাণ্ডে)-এর সদস্যপদ।

১৯৫১-৫২: পেন্‌সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব্ সাউথ এশিয়া স্টাডিজ-এর ভিজিটিং প্রফেসর; কলম্বিয়া ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ওয়াশিংটনে বক্তৃতা; মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে বক্তৃতা। দক্ষিণ কলিকাতার স্নাতক নির্বাচকমণ্ডলী থেকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত ও সভাপতি পদে বৃত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস প্রফেসর।

১৯৫৩: কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি মনোনীত। ১৭তম 'অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্ট্যাল কনফারেন্স'-এর সভাপতিত্ব।

১৯৫৪: 'নরওয়েজিয়ান অ্যাকাডেমি অব্ সায়ান্সেস্'-এর সদস্যপদ। পশ্চিম আফ্রিকা ভ্রমণ। ২৩তম 'ইণ্টারন্যাশন্যাল কন্‌গ্রেস অব্ ওরিয়েণ্ট্যালিস্টস্' (কেম্ব্রিজ)-এ এবং কন্‌গ্রেস অব ইন্দোনেশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ (মেডান)-এ যোগদান। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উইলসন ফিললজিক্যাল লেকচারার' মনোনীত। 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ। সরকারি ব্যবস্থাপনায় চীন ভ্রমণ।

১৯৫৫-৫৬: ভারত সরকার-নিয়োজিত 'অফিসিয়্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশন'-এর সদস্য। পশ্চিমবঙ্গ বিধান-পরিষদে পুনঃ নির্বাচিত।

১৯৫৬-৫৭: ভারতীয় 'সংস্কৃত কমিশন'-এর সভাপতি; ব্যাঙ্ককের 'সিয়াম সোসাইটি'-র সাম্মানিক সদস্য।

১৯৫৮ : রাশিয়া ভ্রমণ ; তাসখন্দে এশিয়া ও আফ্রিকার লেখক সম্মেলনে যোগদান ; চীন ভ্রমণ ; নিউইয়র্কের 'লিঙ্গুইষ্টিক সোসাইটি'র সাম্মানিক সদস্য।

১৯৬০ : সস্ত্রীক য়ুরোপ ভ্রমণ ; মস্কোর ২৫তম 'ইণ্টারন্যাশন্যাল কন্‌গ্রেস অব ওরিয়েণ্ট্যালিস্টস্'-এ ভারতীয় দলের প্রধান ; বহিঃমঙ্গোলিয়া ভ্রমণ।

১৯৬১ : রোম গমন ; রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট অব্ লেটার্স' উপাধি লাভ। 'ইতালিয়ান ইন্সটিটিউট ফর দি নিয়ার অ্যাণ্ড ফার ঈস্ট'-এর সাম্মানিক সদস্য ; 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ'-এর সভাপতি ; হেলসিঙ্কির 'পার্মানেণ্ট ইণ্টারন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব্ ফোনেটিক সায়ান্সেস্'-এর সাম্মানিক সদস্য।

১৯৬২ : ডাবলিন, আমেরিকা, হাওয়াই, জাপান, ফিলিপাইন ভ্রমণ ; ৯ম ইণ্টারন্যাশন্যাল 'কন্‌গ্রেস ফর লিঙ্গুইষ্টিকস্'-এ যোগদান।

১৯৬৩ : 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি ; সিলোন য়্যুনিভার্সিটি লিঙ্গুইষ্টিক সোসাইটির সাম্মানিক সদস্য ; 'ইন্সটিটিউট অব্ তামিল স্টাডিজ্'-এর সভাপতি।

১৯৬৪ : রাশিয়া ভ্রমণকালে ভারতের 'জাতীয় অধ্যাপক' (মানবিকী বিদ্যা) ; জ্যামাইকার 'কমনওয়েলথ অ্যাসোসিয়েশন'-এ যোগদান। আফ্রিকার ভূদ্-ধর্ম গবেষণার্থে হাইতি গমন। ৮ ডিসেম্বর পত্নীর মৃত্যু।

১৯৬৫ : 'জাতীয় অধ্যাপক' কার্যভার গ্রহণ ও বিধান-পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. উপাধি লাভ। দিল্লীর 'ইন্সটিটিউট অব্ রাশিয়ান স্টাডিজ্'-এর সভাপতি। প্রস্তাবিত জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত।

১৯৬৬ : সুদূর প্রাচ্য ও য়ুরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও নানা স্থানে বক্তৃতা দান। তেহরাণের 'ওয়ার্ল্ড কন্‌গ্রেস অব্ ইরানোলজিস্টস্'-এ যোগদান। 'বিশ্বভারতী'র 'দেশিকোত্তম' উপাধি লাভ।

১৯৬৭ : 'চেকোশ্লোভাকিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর ফ্রেণ্ডশীপ'-প্রদত্ত স্বর্ণপদক লাভ। মিচিগানের আন্-আর্বোরতে 'ইণ্টারন্যাশন্যাল কন্‌গ্রেস অব্ লিঙ্গুইষ্টিকস্'-এ এবং বুখারেস্টের ১০ম 'ইণ্টারন্যাশন্যাল কন্‌গ্রেস অব্ লিঙ্গুইষ্টিকস্'-এ যোগদান।

১৯৬৮ : 'রবীন্দ্রভারতী'র ডি. লিট. উপাধি লাভ। 'সাহিত্য আকাডেমী'র সহসভাপতি। হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. উপাধি লাভ।

১৯৬৯ : লণ্ডনের 'ইণ্টারন্যাশন্যাল ফোনেটিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি। এশিয়াটিক সোসাইটির 'রবীন্দ্র-প্লেক' ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. উপাধি। সাহিত্য আকাডেমীর সভাপতি।

১৯৭০ : কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি। পুণে-তে 'অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্সে অব্ লিঙ্গুইস্টস্'-এর সভাপতিত্ব।

১৯৭১ : 'Institute Menezes Bragenza of Goa'-র সাম্মানিক সদস্য। ত্রিবান্দমে 'ফার্স্ট কনফারেন্স অব্ দ্রাবিড়িয়ান লিঙ্গুইস্টস্'-এর উদ্বোধন। মন্ট্রিলের 'সেভেন্থ ইণ্টারন্যাশন্যাল কন্‌গ্রেস অব্ ফোনেটিক সায়েন্স'-এ যোগদান। ইরানের আকামেনীয় রাজবংশের ২৫০০ বর্ষ পূর্তি-উৎসবে এবং সিরাজের 'থার্ড ওয়ার্ল্ড কন্‌গ্রেস অব্ ইরানোলজিস্টস্'-এ যোগদান।

১৯৭২ : মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন; দিল্লীতে সংস্কৃত সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব ও নিবন্ধ পাঠ; লণ্ডনের 'স্কুল অব্ ওরিয়েণ্ট্যাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ্'-এর করেস্‌পণ্ডিং মেম্বার; অধ্যাপক মাইলস্ ডিলনের অসমাপ্ত গ্রন্থ 'কেলট্‌স্ অ্যাণ্ড দি এরিয়ানস্'-এর প্রকাশন তদারকি। লণ্ডনে 'টেম্পলটন ফাউণ্ডেশন অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি'র পুরস্কার-প্রাপক নির্বাচনার্থে গঠিত বিচারকমণ্ডলীতে যোগদান। মণিপুরে রাজ্য কলা আকাডেমীর ফেলো নির্বাচিত। ঢাকায় বাংলা দেশের আমন্ত্রণ ও বাংলা দেশ এশিয়াটিক সোসাইটির স্বর্ণপদক উপহার প্রাপ্তি।

১৯৭৫ : নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ ও 'বিদ্যাবারিধি' উপাধি প্রাপ্তি। ইতালির তুরিনে 'সেকেণ্ড ইণ্টারন্যাশন্যাল কন্‌গ্রেস ফর স্যাংস্কৃট ইন এশিয়া'তে 'সংস্কৃত-দিগ্বিজয়' প্রবন্ধ পাঠ। দিল্লীর ২য় আন্তর্জাতিক রামায়ণ আলোচনাচক্রের উদ্বোধন ও বক্তৃতা।

১৯৭৬ : ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে সাহিত্য আকাডেমীর রামায়ণ-বিষয়ক আলোচনাচক্রে যোগদান। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৮৪তম প্রতিষ্ঠা-দিবসে সভাপতিত্ব।

১৯৭৭ : সাহিত্য আকাদেমীর উদ্যোগে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'উৎকলমণি সত্যবাদী গোপবন্ধু' আলোচনাচক্রের জন্য প্রবন্ধ রচনা। কলিকাতা পুস্তকমেলার উদ্বোধন। চোখে ছানি কাটার জন্য ১৭ মে নার্সিং হোমে ভর্তি ও ২৪ মে গৃহে প্রত্যাবর্তন। ২৯ মে হৃদ্‌রোগ-আক্রান্ত হয়ে অপরাহ্ণে (নার্সিং হোমে) শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সুনীতিকুমারের বিস্তৃত জীবনী-পঞ্জি (1970 পর্যন্ত) SUNITIKUMAR CHATTERJI : THE SCHOLAR AND THE MAN (Jijnasa) গ্রন্থে লভ্য। —অরবিন্দ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে সুনীতিকুমারকে 'বাংলার বিখ্যাত ধ্বনিতত্ত্ববিৎ', 'ভাষাচার্য' বলে অভিহিত করেছেন। এমন কি 'শেষের কবিতা'-র অমিত রায় ছুটির দিনে পড়তে শুরু করে "সুনীতি চাটুজ্জের 'বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব'"!

কিন্তু সুনীতিকুমারের গদ্যরচনার সন্ধান পেয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হন; যাঁকে তিনি 'নিছক পণ্ডিত' বলেই জেনে এসেছেন তাঁর চিত্রসম্পদময়ী ভাষায় গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, '...বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত, এ কথা বলা চলে যে শব্দতত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে শব্দচিত্র তাদের এলেকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারেনি, এই বড়ো অপূর্ব।'

'জীবন-কথা'-য় গদ্যশিল্পী সুনীতিকুমারের সার্থকতর রূপটি যেমন লাভ করা যায় তেমনি পাওয়া যায় পুরোনো দিনের কলকাতার বিচিত্র পরিচয়॥

মূল্য : পঁচিশ টাকা